1869—D. 1948. গান্ধীজী

October. 31 January

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে
সাত মাস

(অসহযোগ আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী-সম্বলিত)

শ্রীকৃষ্ণদাস প্রণীত

প্রথম খণ্ড

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ
১৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা
১৯২৮

মূল্য ২॥০ টাকা

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্ এস্-সি.
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কুন্তলীন প্রেস
৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীচন্দ্রমাধব বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
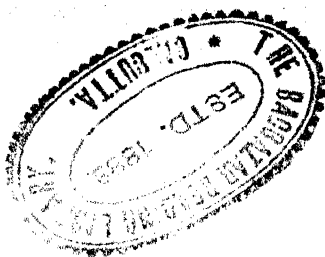
উৎসর্গ

যাঁহার আগ্রহে এই গ্রন্থ-
রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম,
তাঁহারই করকমলে ইহা
সমর্পণ করিলাম

শ্রীকৃষ্ণদাস
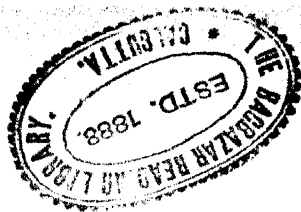
নিবেদন

১৯২২ সনের ১০ই মার্চ্চ তারিখে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সাবরমতি আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীজীর গ্রেপ্তার হয়। তাহার পর ১৮ই মার্চ্চ আমেদাবাদের দায়রার আদালতে ছয় বৎসর কালের জন্য তাঁহার কারাবাস দণ্ড হয়। এই পুস্তকে যে সমস্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহা মহাত্মাজীর কারাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সাত মাসের ঘটনা। এই সাত মাস কাল অবিচ্ছেদে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আমি তাঁহার তৎকালীন জীবন ও অসহযোগ আন্দোলনের অনেক বিশিষ্ট ঘটনার সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করি। সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই আমি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছিলাম।

আমার মনে হয় এই পুস্তকের অন্তর্ভূত বিষয়সমূহ স্থূলতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম,—'উদ্দীপনা' বা 'নবজাগরণ'; দ্বিতীয়,—'আয়োজন' বা 'যুদ্ধসজ্জা'; তৃতীয়,—'অভিযান' বা 'যুদ্ধযাত্রা'; চতুর্থ,—'সংবরণ' বা 'যুদ্ধের সাময়িক বিরাম'।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে সমগ্র ভারতে জনসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত জীবনী-শক্তির সঞ্চার এবং রাজনৈতিক

আলোড়ন সংঘটিত হয়, উহাই এই আন্দোলনের প্রথমাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতঃপর, শান্তিময় উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অসহযোগ সংগ্রাম পরিচালনের জন্য যে ভারতব্যাপী সমষ্টীভূত জনসংগঠনের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, উহা আন্দোলনের দ্বিতীয়াবস্থা। সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে ভারতীয় জনশক্তির সহিত ব্রিটিশ্ রাজশক্তির যে তুমুল সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, তাহাই উহার তৃতীয় পরিচ্ছেদ। অতঃপর সমষ্টীভূত শান্তিময় বিদ্রোহের পূর্ণ সাফল্য-কল্পে নূতন বিধানে জনসংগঠনের ব্যবস্থা এবং যুদ্ধের সাময়িক বিরাম যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান গ্রন্থের অন্তর্গত ঘটনাবলীর চতুর্থ বিভাগ।

এস্থলে বলা বাহুল্য যে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ সংগ্রাম মূলতঃ ধর্ম্মযুদ্ধ। সেই কারণ যতকাল অধর্ম্মের পরাজয় ও ধর্ম্মে বিজয় না হইবে, ততকাল সাময়িকভাবে বিরাম হইলেও ঐ যুদ্ধের অবসান হইবে না। ধর্ম্মযুদ্ধ পরিচালন করিতে হইলে যে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের সোপান হইতে সত্যাগ্রহীর পদস্খলন হইবে, বা পদস্খলনের সম্ভাবনা হইবে, সেই মুহূর্ত্তে সেনানায়ক সেই সময়ের জন্য যুদ্ধ-সংবরণ করিতে বাধ্য। একদিকে যেমন অধর্ম্মের পরাজয় ব্যতীত ধর্ম্মযুদ্ধের সমাপ্তি নাই, অপরদিকে সেইরূপ সেই সংগ্রামের ধর্ম্মভাব অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে আবশ্যকমত প্রতীকারের ব্যবস্থাও অনিবার্য্য। সেই জন্য মহাত্মাজী-প্রবর্ত্তিত স্বরাজযুদ্ধের মূল প্রকৃতি যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই এই অসহযোগরূপী ধর্ম্মযুদ্ধের বিলোপ বা পরাজয়

স্বীকার করেন না। যুদ্ধের প্রকৃতি রক্ষার জন্য নূতন আয়োজনের প্রয়োজন হইলেই অবসর আবশ্যক, এবং সেই আয়োজন পূর্ণ হইলেই সত্যাগ্রহের অবতারণা অবশ্যম্ভাবী। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান অবসরে মহাত্মাজী অহিংস অসহযোগ সংগ্রামের পুনঃ প্রবর্ত্তনকল্পে অতীব সতর্কতা সহকারেই দেশবাসীকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপর রাজনৈতিক-দল সমূহের কার্য্যপদ্ধতির প্রতি বাধা প্রদান না করিয়া উহার ব্যর্থতার প্রমাণের জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন।

গ্রন্থের বর্ত্তমান খণ্ডে (volume) সাতমাসের ঘটনাবলীর প্রথম দুই বিভাগের ছবি পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ঘটনাবলীর পরবর্ত্তী দুই বিভাগের বিষয় বর্ণিত ও আলোচিত হইবে। যে সকল প্রধান কর্ম্মী ও জননায়কের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে এই আন্দোলনের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতিলাভ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের চরিত্র ও কার্য্য-কলাপ পরিস্ফুট করিবার জন্য তৎসম্পর্কিত বহুবিধ ক্ষুদ্র ঘটনা এই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষভাবে এই গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধীজীর তদানীন্তন দৈনন্দিন জীবনীর বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ বর্ণনার দ্বারা অসহযোগ সংক্রান্ত কোন কোন অনুষ্ঠানের সার্থকতা বা আন্তরিকতা সুস্পষ্ট হইয়াছে। এই বিরাট অসহযোগ সংগ্রামের সেনানায়ক ও প্রমুখরূপে মহাত্মাজীর চরিত্র যে ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। তথাপি অবিচ্ছেদে সাত মাস কাল তাঁহার সান্নিধ্য

বশতঃ আমি যে সমস্ত আভ্যন্তরীণ তথ্য অবগত ছিলাম, তাহার সাহায্যে বর্ত্তমান গ্রন্থে মহাত্মাজীর তদানীন্তন রাজনৈতিক জীবন আরও পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। অসহযোগ আন্দোলনের নানা সঙ্কটকালে মহাত্মাজীর মনোবৃত্তি ও বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে যাঁহারা সুপরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে লাভবান্ হইবেন, ইহাই আমার ধারণা।

মহাত্মা গান্ধীজীর মতে ভারতের পক্ষে অহিংস অসহযোগই স্বরাজলাভের একমাত্র সুগম পন্থা। অবশ্য প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহের পন্থাও আবহমানকাল প্রচলিত আছে এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ পন্থার পক্ষপাতী। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঐ পন্থার অকিঞ্চিৎকরত্ব ও ব্যর্থতা এবং উহার বিষময় ফলও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্র উপলব্ধি করিবেন। যদ্যপি পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী জগৎ এখনও সময় থাকিতে উহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহাকে রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে অগ্রসর না হয়, তবে পাশ্চাত্য সমাজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা অবিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে স্বরাজ-লাভের জন্য অহিংস সংগ্রাম ও হিংসাত্মক সংগ্রাম, এই দুই পন্থার মধ্যবর্ত্তী অপর এক পন্থাও আছে। যদি এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত তৃতীয় পন্থী রাজনীতিজ্ঞেরা ঐ পথ অবলম্বনে স্বরাজযুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলেও হইতে পারেন বটে। কিন্তু মহাত্মা

গান্ধীজীর স্থির সিদ্ধান্তও ইহাই, যে ভারতীয় স্বরাজ লাভের উপযোগী ঐরূপ কোন তৃতীয় পন্থা নাই। অতএব মহাত্মাজী-নির্দ্দিষ্ট পন্থা যদ্যপি স্থির সত্য হয়, তাহা হইলে স্বরাজকামী ভারতবাসী কর্ত্তৃক উহা যথাসময়ে সমাদরে গৃহীত হইবে। ইত্যবসরে তৃতীয় পন্থী রাজনীতিজ্ঞেরা ঐ পন্থার ব্যবহার ও পরীক্ষা দ্বারা উহার অসত্যতা এবং ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন, ইহাই মহাত্মাজীর বিশ্বাস। পরিশেষে যখন স্বরাজযুদ্ধে অহিংস অসহযোগের উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নেতৃবর্গের ধারণা অনুকূল ও বদ্ধমূল হইবে, তখন সমগ্র ভারত নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া মহাত্মাজী-প্রবর্ত্তিত পন্থা অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প ও বদ্ধ-পরিকর হইবেন।

গান্ধী-কুটীর,
পোঃ দিঘ্‌ওয়ারা
(বিহার);
অগাষ্ট, ১৯২৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস

পুনশ্চ:—যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংস সন্নিকট, এই মত ক্রমশঃই পাশ্চাত্য জগতে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে। যাহারা পাশ্চাত্য জগতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহাদিগের অবগতির জন্য সাক্ষ্যরূপে বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী মনীষী রমাঁ

রোলাঁ (Romain Rolland) মহোদয়ের দুইটী উক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

রমাঁ রোলাঁ মহোদয়ের প্রথম উক্তি 'Le Semeur' নামক ফরাসী পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরাজী অনুবাদ 'The War Resister' নামক এক সাময়িক বিলাতী পত্রের মার্চ্চ ১৯২৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত অনুবাদের অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"My knowledge of Europe and the world as it actually is at present—for during the past thirty years I have been in intellectual relations with all countries—gives me the certainty that a European war would mean the complete destruction of European civilisation. It is vain to ask who would be the victors and who the vanquished in the struggle. Victors and vanquished alike could not rise again from the ruins caused by chemical warfare which is criminally being prepared in all European countries. I therefore think it my duty, not only as a 'citizen of the world', but also as a citizen of France, to struggle with all my powers against war which would fatally destroy our country. And if we unfortunately have not the means to influence the policy of Government, we should at least give the example of an absolute refusal to take part in

something which we believe to be the assassination of the Fatherland as well as of Humanity."

"Romain Rolland"

(২)

রমঁা রোলঁা মহোদয়ের দ্বিতীয় উক্তি 'Foreign Affairs' নামক বিলাতী মাসিক পত্রের জুন, ১৯২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে :—

"To The Editor of "Foreign Affairs"

"Sir,

The next war for which all nations *without exception* are, with monstrous cynicism, preparing, promise to be without doubt such a fearful destruction, not only of the armies, but of the peoples of Europe,—of millions of innocents, of women and children, of towns and of whole countries—that those who are taking part in the organisation of this heinous slaughter should be condemned by public opinion as barbarous assassins. They have no excuse, for they know what they are doing. By the use of poison gases, the next war will put an end to European civilisation, and those who let it loose on the world will see their own country annihilated like the enemy's."

Villeneuve
Switzerland

Yours etc
"Romain Rolland"
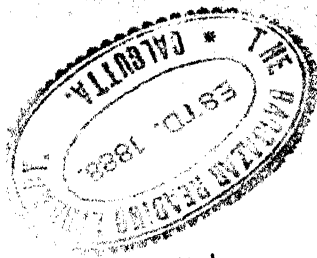
সূচনা

মহাত্মা গান্ধীজীর নিকট অবস্থানকালে তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ পুস্তক লেখার কল্পনা স্বপ্নেও আমার মনে উদয় হয় নাই। ১৯২১ সনের শেষভাগে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইলে একে একে তাঁহার সহকর্ম্মী ও সেবক-দিগের মধ্যে কেহ বা জেলে, কেহ বা আন্দোলনের কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলে তাঁহার চিঠিপত্র ও "ইয়াং ইণ্ডিয়া" লেখার কার্য্যে সহায়তা করিবার ভার ক্রমে ক্রমে আমার উপর ন্যস্ত হইতে লাগিল। আমি তখন তাঁহার আবশ্যকীয় কাগজপত্র সমস্তই দেখিতে পাইতাম এবং যে সকল ঘটনা অবলম্বনে এবং যে প্রণালীর বিচার দ্বারা তিনি সেই প্রবল আন্দোলন পরিচালন করিতেছিলেন, ঘনিষ্ঠভাবে তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ লাভও আমার হইয়াছিল। মহাত্মাজী তাঁহার আবশ্যকীয় কাগজ-পত্রের অধিকাংশই কাজ হইয়া গেলে নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। আমিও কিছুকাল পরে এইরূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা দেখিয়া কোন বন্ধু প্রয়োজনীয় ও রক্ষণোপযোগী পত্রগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমি রহস্য করিয়া উত্তর দিয়াছিলাম—"I am an iconoclast"—অর্থাৎ, আমি ধ্বংসবাদী, মূর্ত্তিপূজক নহি।

ইহা পরিহাসচ্ছলেই আমি বলিয়াছিলাম, কারণ আমি মনে করি যে যখন মানুষ কোনপ্রকার আদর্শ বা ভাবের পূজা করিতে থাকে, তখন কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তির ভিতর সেই ভাব বা আদর্শের বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখিলে স্বভাবতঃই সে তাঁহার প্রতি আত্মিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই বীরপূজার উদ্ভব। জগতে চিরকাল এই পূজা হইয়া আসিতেছে এবং পরেও হইবে, এবং ইহার দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া আদর্শেরই পূজা হইয়া থাকে।

কিন্তু সেই সময় প্রতিদিনের ঘটনা ও কাগজপত্রের চাপে আমি এরূপ অভিভূত হইয়া থাকিতাম যে তখন কোন্ জিনিষ রক্ষা করা প্রয়োজনীয়, তাহার বিচার আমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। তদ্‌ভিন্ন, সেই প্রবল আন্দোলন সম্বন্ধে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহা যে আমার লেখনী দ্বারা উপযুক্তরূপে বর্ণিত হইতে পারে, এরূপ ধারণাও আমার ছিল না।

মহাত্মাজীর কারাগমনের কয়েকমাস পরে আমি বাঙ্গালা প্রদেশে ফিরিয়া আসিলে আমার পরিচিত সকলেই আমার মুখে মহাত্মাজীর বিষয় শুনিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেন, এবং কেহ কেহ সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যে সাত মাস কাল আমি মহাত্মাজীর নিকট অবস্থানের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, সেই সাতমাসের প্রায় প্রতিদিনই আমার শিক্ষাগুরু,

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিতাম। তিনি আমার সম্পর্কিত সকল কথাই নিয়মিতরূপে ও বিস্তৃতভাবে জানিবার জন্য উৎসুক ছিলেন বলিয়া আমি যথাসম্ভব বিস্তৃতাকারে তাঁহাকে সকল কথা লিখিতাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার সমস্ত পত্র তিনি যত্নসহকারে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই আগ্রহ ও উৎসাহের ফলে এবং মুখ্যতঃ সেই পত্রগুলি অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইল।

যাঁহারা মহাত্মাজীর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত বা কার্য্যসূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা অনেকস্থলে এই গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রীতিকর বোধ করিতে পারেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়া মহাত্মাজী ভারতের ভাবরাজ্যে যে বন্যা প্রবাহিত এবং সাধারণের জাগরণ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও কিছুদিনের মধ্যেই কালের স্বাভাবিক নিয়মে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে পারে। তখন সেই আন্দোলন ও জাগরণের প্রভাব ও ব্যাপকতার বিষয় ভালরূপ জানিবার ও বুঝিবার জন্য লোকের কৌতূহল ও আগ্রহাতিশয় হইলেও তাহার কোন উজ্জল ছবি পাওয়া যাইবে না। এই আন্দোলনের মূলতত্ত্বের অনুশীলন অনেক গ্রন্থে হইয়াছে, এবং মহাত্মাজীর স্বরচিত গ্রন্থাদি এই বিষয়ে প্রামাণিক বলিয়া সর্ব্বদাই আদৃত হইবে। কিন্তু এই আন্দোলনের দ্বারা তিনি ভারতের জনসমুদ্রমধ্যে কিরূপ আলোড়ন সংঘটিত করিয়াছিলেন, তাহা কিম্বদন্তীরূপে কীর্ত্তিত

হইলেও উহার অবিকল বর্ণনা পাওয়া দুর্ঘট হইবে। আমার মনে হয় কোন প্রকার বর্ণনা দ্বারাই উহার ছবি ও স্মৃতি রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ, ঐ আন্দোলন এখনও সমাপ্ত হয় নাই এবং আরও কত ঘটনা ঘটিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে নির্ণয় করা যায় না। তথাপি সেই নবজাগরণের মুহূর্ত্তে আসমুদ্রহিমাচল জনমণ্ডলীর মধ্যে কিরূপ আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, এবং মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত চরিত্রের বিরাট্‌ শক্তি ও অনুপম মাধুর্য্য কি ভাবে জনসমাজের চিত্ত অভিভূত করিয়াছিল, মহাত্মাজীর সহিত ঘনিষ্ঠ সংসর্গজনিত এই কয়েক-মাসের অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহার কথঞ্চিৎ স্মৃতি রক্ষা করিতে আমি প্রয়াস পাইয়াছি।

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়া মহাত্মাজী যে ভাবে ভারতীয় রাজনীতি পরিশুদ্ধ করিয়া উহাকে ধর্ম্মের সোপানে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তদ্দ্বারা যুগ পরিবর্ত্তনের কার্য্য হইতেছে বলিয়া আমি মনে করি। স্বরাজ ও স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা জগতে চিরকাল সকল দেশে হইয়াছে এবং হইবে। কিন্তু তিনি যে প্রণালী অনুসরণে ভারতে স্বরাজ স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাতে সাফল্যলাভ হইলে জগতের চিন্তাস্রোতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে এবং পশুবলের পরিবর্ত্তে সত্য, ন্যায় ও জনমতের প্রাধান্য প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসামন্ত্রের প্রয়োগ ও সত্যাগ্রহ বা সত্যনিষ্ঠা; সমষ্টীভূত শান্তি-ময় বিদ্রোহ বা সবিনয় আইন-ভঙ্গের কল্পনা; চরকা ও খদ্দরের

প্রচার; হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা সাধন; অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতি সংগঠনমূলক পবিত্র অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি একমাত্র ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণের বলে এবং তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক ব্যাধি নির্ণয় দ্বারা রোগমুক্তির যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, উহাতে কেবল যে ভারতের অগণিত প্রজাবর্গের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ভারতে উহার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যলাভ হইলে উহার দৃষ্টান্তে সমগ্র জগতের দুঃস্থ ও নির্য্যাতিত জনমণ্ডলীও স্ব স্ব উদ্ধারের সন্ধান পাইতে পারিবে। মহাত্মাজী চরকা প্রচারের শিক্ষা দ্বারা যেরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির প্রচার করিতেছেন, তাহার মূলে যে সত্য নিহিত আছে, একমাত্র তাহা দ্বারাই জগতের প্রজাবর্গের অশান্তি দূর হইতে পারে। কল্‌-কব্জার যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ এবং শোষণ-মূলক ব্যবসায়ের ক্ষেত্র স্বাভাবিক নিয়মে অতিমাত্র বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, এবং উহার ফলে জগতে বিষের সঞ্চার হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই বিষ একমাত্র চরকার সাহায্যেই বিদূরিত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত, মহাত্মাজীর শিক্ষার অভ্যন্তরে যে প্রকার আত্মবিশ্লেষণ, আত্মশুদ্ধি এবং চরিত্র পরিবর্ত্তনের আহ্বান আছে—তাহাতে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতির পন্থার উন্মোচন দ্বারা যুগপৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের সমন্বয়সাধনও

হইয়াছে। সেইজন্য ঐ শিক্ষা চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সেইজন্য উহার মূল নীতি বিশ্বমানবের জীবনগঠন ও পরিচালনে প্রযুক্ত হইলে জগতের চিন্তা ও ভাবস্রোতের উর্দ্ধগতি হইতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে শোষণমূলক ব্যবসায় পদ্ধতির প্রভাব ও প্রাধান্য লাভের ফলে জগতের সমতা নষ্ট হইয়া যে প্রকার ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিল তাহাও বিদূরিত হইবে।

সমাজদেহে সমষ্টিভাবে এক এক যুগে এক এক প্রকার ব্যাধির উদ্ভব হইয়া থাকে। দেখিতে পাওয়া যায়, যখন শক্তিশালী লোকেরা স্বীয় শক্তি জনসেবায় নিয়োগ না করিয়া কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিতে থাকে, তখন প্রজার ক্লেশ ও পীড়ার অবধি থাকে না। সেই ক্লেশের সূত্র হইতেই যুগ-পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। পাশ্চাত্য ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে কোন যুগে পোপ্ (Pope) ও ধর্ম্ম-যাজকদিগের হস্তে, কোন যুগে বা শাসকবর্গের হস্তে লোকের ভাল-মন্দ করিবার শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন হেতু জড়ের উপর মানুষের যে অসামান্য আধিপত্য লাভ হইয়াছে, তাহা হইতেই সেই শক্তি অর্থশালী ব্যবসায়ীদিগের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, এবং তাহাদের স্বার্থসাধনের ও প্রজাশোষণের ক্ষমতা কল্পনাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে জগতের সর্ব্বত্রই অশান্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই অশান্তি ও অসন্তোষের প্রভাবে চতুর্দ্দিকে পুরাতন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গঠন সমুদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে

এবং তাহার স্থলে সর্ব্বত্র নূতন কল্পনা ও নূতন গঠনের উদ্ভব পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা কল্পে যে সমস্ত নূতন পন্থা কল্পিত বা অবলম্বিত হইতেছে, তাহা জড়বাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। কল্‌-কব্জামূলক আধুনিক সভ্যতার চাপে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির যে অবনতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কোন মৌলিক প্রতিকারের উপায় চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র সমাজযন্ত্রের বাহ্য পরিবর্ত্তন দ্বারা সামাজিক ব্যাধির নিরাকরণের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু মানুষের আত্মা যদি বিশুদ্ধিলাভ না করে, মানুষের প্রকৃতি যদ্যপি স্বার্থপ্রবণ ও জড়পরায়ণ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সামাজিক ব্যবস্থার সহস্র বাহ্য পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সে সমাজে স্বাস্থ্য ও শান্তির পুনঃ-প্রবর্ত্তন দুষ্কর। বলা বাহুল্য, এ সত্য পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের মূলভিত্তি কিন্তু এই সত্যেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সমাজব্যাধির মূলগত প্রতিকারের পক্ষপাতী বলিয়াই তাঁহার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, সকল প্রকার আন্দোলনের মূলে আত্মশুদ্ধির প্রাধান্য। মহাত্মাজীর চেষ্টা ফলবতী হইলে জগতের সেই পুরাতন সত্য ও পবিত্রতা নূতনভাবে পুনরায় জগতে অধিষ্ঠিত হইবে।

মহাত্মাজীর কার্য্য সমূহ সফল হইলে সর্ব্বত্রই মহাত্মাজীর চিন্তাপদ্ধতি ও শিক্ষার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিন্তু কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তি-

বিশেষের চিন্তা ও শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, প্রথমে সেই ব্যক্তির আচরিত ক্ষুদ্র-মহৎ ঘটনার সহিত ভালরূপ পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কারণ, সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে মানুষের কার্য্যাবলী তাহার অন্তরের ভাবের দ্বারা নিয়মিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তির চিন্তা এবং শিক্ষার অন্তরালে কৃত্রিমতা না থাকে, তাহা হইলে তাহার জীবনের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর মধ্যে তাহার চিন্তাপ্রণালীর গূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য, এবং চরিত্রের কোন্ স্তর হইতে উহা উদ্ভূত হইতেছে তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণে আমি মহাত্মাজীর দৈনন্দিন জীবনের অনেক ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বর্ণনা করিয়াছি। তদ্দ্বারা তাঁহার বিশিষ্টতা ও ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে কি না, জানি না। বলা বাহুল্য, আমি যে ভাবে ও যতটুকু তাঁহাকে বুঝিয়াছি সেই ভাবে ও ততটুকুই লিখিবার আমার অধিকার। লিখিতে যদি বিশেষ কোন ভ্রম বা ত্রুটী হইয়া থাকে, তাহা আমার বুঝিবার দোষে, অনিচ্ছাকৃত-রূপে হইয়াছে মনে করিয়া পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন।

সেস্থন্ হাসপাতাল,
পুণা,
৮ই মার্চ্চ, ১৯২৪

শ্রীকৃষ্ণদাস

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম দর্শন

১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে সুপ্রসিদ্ধ আলিগড় কলেজে ছাত্রদিগের ধর্ম্মঘট লইয়া সমগ্র ভারতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। আলিগড়ের উত্তেজনার ঢেউ ক্রমশঃ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া লাগিল। বেনারসের ছাত্রদিগকে অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রথমতঃ এলাহাবাদের ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট "Independent" কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জর্জ্জ জোসেফ, তাহার পর মৌলানা মহম্মদ আলি এবং মৌলানা সাহেবের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু মহাশয় আসিয়া বক্তৃতা দিয়া গিয়াছেন; এবং তাঁহাদের সকলের শেষে, নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে মহাত্মা গান্ধী

বেনারসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে সহরে অপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হইল, এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় টল্‌মল্ করিতে লাগিল। আমি সেই সময় বেনারসে আমার শিক্ষাগুরু কলিকাতা ন্যাশন্যাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবস্থান করিতেছিলাম।

মহাত্মাজীর বেনারসে আগমনের পর এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে, ২৬শে নভেম্বর প্রাতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সভায় তিনি এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহাতে পাঞ্জাবের অত্যাচার এবং খিলাফৎ লইয়া মুসলমান ধর্ম্মের উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতিবিধান কল্পে তিনি ছাত্র-দিগকে অসহযোগ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন; কিন্তু হুজুগের বশে, সাময়িক উত্তেজনার দ্বারা চালিত হইয়া কিছু করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে অন্তরাত্মার "আওয়াজ" বা বাণী অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পরামর্শ দিলেন। ইহাতে একজন ছাত্র উঠিয়া প্রশ্ন করিল—"অন্তরাত্মার আওয়াজ কি? আমরা ত কখনও তাহা শুনি নাই!" তাহাতে মহাত্মাজী উত্তর দিলেন যে, ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিলে অন্তরাত্মার বাণী বা ভিতরের "আওয়াজ" শুনা যায়, এবং সেই বাণীর নির্দ্দেশ মত কর্ত্তব্য স্থির করিলে সত্যপথ নির্দ্ধারণে কাহারও ভ্রম হয় না।

ইহার পর অপর এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে, মহাত্মাজী বেলা ১টার সময় ছাত্রদিগকে তাঁহার আবাসস্থানে যাইয়া কথাবার্ত্তা

কহিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া ১টার সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি বহু ছাত্র পরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন।

আমি তাঁহাকে এই প্রথম দেখিলাম। তিনি এত আস্তে আস্তে অস্পষ্টভাবে কথা কহিতেছিলেন যে, লোকজনের যাতায়াতের শব্দে তাঁহার কথা চাপা পড়িয়া যাইতেছিল। সেই জন্য আমি ঘুরিয়া তাঁহার পিছনে একটু নিকটে গিয়া বসিলাম এবং শুনিতে পাইলাম তিনি আচম্বিত বলিয়া উঠিলেন—"হিন্দুস্থানমে ত শক্তি আ গিয়া—আ গিয়া নেই"? কথা বলিবার সময় দেখিলাম, যখন তিনি কোন বিশেষ কথা বা ভাব শ্রোতার চিত্তে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে চাহেন, তখন সেই বাক্যোচ্চারণের তালে তালে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে থাকেন। একজন ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে কিরূপ প্রণালীতে আশ্রম স্থাপন করিয়া বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা বলিতে লাগিলেন। এই সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জীর কনিষ্ঠ পুত্র আসিয়া তাঁহাকে কাণে কাণে কি বলিয়া গেল। তিনি তাহাতে কথা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাহিরে আসিয়া একখানা মোটরে বসিলেন। শুনিলাম তিনি মালবীয়জীর সহিত অসহযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে পণ্ডিত মতিলালজী গেলেন। মহাত্মাজীকে এতক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছিল তাঁহার ভিতরে কি একটা চিন্তার আলোড়ন চলিয়াছে, সেইজন্য তাঁহার চেহারা কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ

ও নিষ্প্রভ। কিন্তু মতিলালজীকে নিজের পাশে বসিবার জন্য আহ্বান করিয়া যখন "আ-যাইয়ে" বলিয়া গা-ঝাড়া দিয়া মতি-লালজীর বসিবার স্থান করিবার জন্য একটু সরিয়া গেলেন, তখন দেখিলাম তাঁহার চক্ষুতে এক তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ এবং মুখের ছটা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

সেই দিন বৈকালে বেনারসের টাউন হলের মাঠে জন-সাধারণের সভায় তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দেখিলাম। কিন্তু এখানকার মূর্ত্তি আবার স্বতন্ত্র। সভাস্থলের গোলমাল নিবারিত হইতেছিল না দেখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত নাড়িয়া সকলকে শান্ত হইয়া বসিতে বলিতেছেন। তাঁহার সেই সময়কার সহাস্য বদন, চঞ্চল দৃষ্টি এবং ত্বরিত পদক্ষেপ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন তাঁহার অন্তরের আনন্দ সকলকে বিতরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সভাস্থলে অসংখ্য লোক,—এত বড় সভা বেনারসে আমি আর দেখি নাই। সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া আমি জনতার কার্য্য-কলাপ ও ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। এমন সময় শ্রীযুক্ত বাবু শিব প্রসাদ গুপ্ত সভায় উঠিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া কি বলিলেন তাহা দূর হইতে কিছুই শুনিতে পাইলাম না। তখন ভাবিলাম, এতদূর হইতে মহাত্মাজীর বক্তৃতা কিছুই শুনা যাইবে না। কিন্তু তিনি যখন একখানা চেয়ারে বসিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন তখন প্রত্যেকটী কথা দূর হইতেও স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল, অথচ তিনি যে বিশেষ প্রয়াস করিয়া চীৎকার

করিয়া কথা কহিতেছিলেন, তাহা মনে হইল না। তাঁহার সেই বক্তৃতায় অহিংসা পদ্ধতির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তরবার খিঁচোগে তব্ আপনা গর্দ্দান্ কাটা যায়েগা" —সেই বাক্যের ঝঙ্কার আজও আমার কাণে লাগিয়া রহিয়াছে।

এই সভার পর মহাত্মাজী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণ্ডলীর সহিত এক সান্ধ্যমিলনে যোগ দিয়াছিলেন। তখন একজন অধ্যাপক তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, তিনি সকলকে বিবেক (Conscience) মানিয়া চলিতে উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যত কিছু যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তারক্তি তাহা বিবেকের নাম দিয়া লোকে করিয়াছে। তাহার উত্তরে শুনিলাম, মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন, বিবেকের এইরূপ অপব্যবহার অনেক হইয়াছে তাহা সত্য ; কিন্তু তথাপি বিবেক অনুসরণ করিতে গিয়া জগতের যে মঙ্গল ও অমঙ্গল হইয়াছে, তাহা যদি খতাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গল অনেক অধিক মাত্রায় হইয়াছে, ইহা প্রতীয়মান হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে, বিবেকের অপব্যবহার রোধ করিবার জন্য মানুষের জীবনে সংযম ও নিষ্ঠা এবং ত্যাগের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আনয়ন করিবার চেষ্টা করা দরকার ; তাহার উপর বর্ত্তমান আন্দোলনে তিনি বিবেকের প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অহিংসা (Non-violence) প্রচার করিয়া রক্তারক্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের পথ একেবারে রোধ করিতে চাহিয়াছেন।

এদিকে বিশ্ববিত্মালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ ও উত্তেজনা পূর্ণরূপে বিত্মমান থাকিলেও ছাত্রেরা কি করিবে বুঝিয়া উঠিতেছে না। মহাত্মাজী যদি তাহাদিগকে কলেজ ছাড়িয়া দিতে বলেন, তাহা হইলে অধিকাংশ ছাত্র তাহা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু মহাত্মাজী সেইরূপ কিছু না বলিয়া তাহাদিগকেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন।

পরদিন (২৭শে নভেম্বর) কলেজের 'হলে' ছাত্রদের দ্বিতীয় এক সভা হইল এবং মহাত্মাজী পুনরায় এখানে বক্তৃতা করিলেন। বিশ্ববিত্মালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলার স্বয়ং মালবীয়জী এই সভায় সভাপতি ছিলেন। আমি পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। মহাত্মাজী বলিলেন, তিনি মালবীয়জীকে নিজ অগ্রজতুল্য সম্মান করেন। তাঁহার আশা ছিল, তাঁহারা দুই ভাই এক সঙ্গে সর্ব্বদা দেশের কাজে নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, অসহযোগ লইয়া আজ তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। বেনারসের ন্যায় তিনি যখন আলিগড় কলেজের ছাত্রদিগকে অসহযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন কলেজের সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা সমূহ দেখিয়া এবং স্যার সৈয়দ আহমেদের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহার অন্তর হইতে ক্রন্দন আসিতে লাগিল, এবং মনে হইতে লাগিল, তিনি এ কি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন? কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা বলিয়া দিল যে, তিনি ঠিক কাজ করিতেছেন। এখানেও মালবীয়জীর প্রতি শ্রদ্ধা ও হিন্দু বিশ্ববিত্মালয়ের প্রতি

আকর্ষণ সত্ত্বেও তিনি অন্তরাত্মার বাণী এবং কর্ত্তব্যের আহ্বান অনুসরণ করিয়া ছাত্রদিগকে বলিতে পারেন যে, যদি সত্য সত্যই কেহ পাঞ্জাবের ও খিলাফতের অত্যাচারের দরুণ বুঝিয়া থাকে যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট অন্যায় ও অধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বপ্রকারে এই গভর্ণমেণ্টের সংশ্রব ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ভাবষ্যতের কথা চিন্তা করিলে চলিবে না। কেহ যদি জানিতে পারে তাহার শিক্ষক দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন, তাহা হইলে সে কি ভবিষ্যত শিক্ষার কথা চিন্তা করিবে,—না তৎক্ষণাৎ সেই শিক্ষকের সংস্রব ত্যাগ করিবে? এইরূপ ভাবে কেহ যদি প্রাণে প্রাণে বর্ত্তমান গভর্ণ-মেণ্টের অসত্য ও অন্যায় ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে, তবে তিনি তাহাকে ইহার সম্পর্ক ছাড়িতে পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন যে, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারার ক্ষমতা হইলেই চরিত্রগঠন হইবে, এবং যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইবে। আর যদি অন্যায় ও পাপাচরণ দেখিয়াও হৃদয়ের দুর্ব্বলতাহেতু কঠোর ভাবে কর্ত্তব্য করিবার ক্ষমতা না হয়, তাহা হইলে বিদ্যার জাহাজ হইয়াও মানুষ চিরকাল পঙ্গু হইয়া থাকিবে, এবং পরের দাসত্ব করা ব্যতীত তাহার দ্বারা স্বাধীন কার্য্য কিছু হইতে পারে না। সেই জন্য তিনি ছাত্রদিগকে বলিলেন যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের প্রকৃতি তিনি যে প্রকার বুঝিয়াছেন ও বর্ণনা করিলেন, সেই রূপ কেহ যদি বুঝিয়া থাকে, এবং ইহাকে অসৎ বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অসহযোগ অবলম্বন করা তাহার কর্ত্তব্য ও

তাহার ধর্ম্ম। কিন্তু হঠতা করিয়া নহে, ঔদ্ধত্য করিয়া নহে। শান্তিময় অসহযোগে হঠতা ও ঔদ্ধত্যের স্থান নাই। এই আন্দোলন আত্মশুদ্ধির আন্দোলন। কলেজ ছাড়িতে হইলে তাহাদিগকে পিতামাতার পায়ে ধরিয়া তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ছাড়িতে হইবে, এবং যাইবার সময় ভক্তিভাবে মালবীয়জীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া যাইতে হইবে।

এই বক্তৃতার পরে রাত্রিকালে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট গিয়া প্রস্তাব করিল যে, তিনি যদি একটা জাতীয় কলেজ স্থাপন করেন, তাহা হইলে একসঙ্গে পাঁচশত ছাত্র তাহাতে যোগ দিবে। কিন্তু মহাত্মাজী তাহাতে উত্তর দিলেন কেহ যদি তাঁহাকে একলক্ষ মেকি টাকা দেয় তাহা লইয়া তিনি কি করিবেন? বরং সেই টাকা কোথায় রাখিবেন ইহা এক মস্ত চিন্তার কারণ হইবে। কিন্তু একটী আসল টাকা পাইলে তাহার দ্বারা তিনি অনেক কাজ করিতে পারিবেন। তিনি আরও বলিলেন কেহ যদি জানিতে পারে তাহার ঘরে সাপের বাসা হইয়াছে, তাহা হইলে সে কি কোথায় যাইবে, কি করিবে ইহা চিন্তা করিতে বসে, না, তৎক্ষণাৎ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে?

তাঁহার উত্তর শুনিয়া ছাত্রেরা বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, তাড়াতাড়ি একটি জাতীয় কলেজ স্থাপন করিয়া কি হইবে? তাহারা যে পদ্ধতিতে সরকারী কলেজে লেখাপড়া করিতেছিল, জাতীয় কলেজে আসিয়াও সেই পদ্ধতিতেই লেখাপড়া করিতে চাহিবে; ফলে

তাহাদের জীবন পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, পরেও তাহাই থাকিবে। কিন্তু তিনি তাহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন, এবং তাহাদের সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা এবং ত্যাগের ক্ষমতা পরীক্ষা করিতে চাহেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার কৃপালানীজী মহাত্মাজীর আগমনে অসহযোগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছেন। যে সমুদয় ছাত্র হুজুগে না পড়িয়া শান্তভাবে বিচার করিয়া প্রকৃতভাবে অসহযোগ অবলম্বন করিতে পারিবে, তাহাদিগকে প্রথমে স্বাবলম্বন ও স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দিবার জন্য একটী আশ্রম স্থাপন করিতে প্রফেসারজীকে মহাত্মাজী বলিয়া দিলেন। সেই আশ্রমে কিরূপে অভিভাবকের অর্থসাহায্যের অধীন না হইয়া ছাত্রেরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্য নিজ নিজ হস্তে সম্পাদন করিতে পারে তাহা অভ্যাস করাইতে বলিলেন। মহাত্মাজীর সেই উপদেশ মত কৃপালানীজীর নেতৃত্বে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহী ও উদ্যোগী যুবকেরা শ্রীগান্ধীআশ্রম নামে বেনারসে এক আশ্রম স্থাপন করিয়া নিজেদের শিক্ষা, চরিত্রগঠন এবং দেশের সেবায় ব্রতী হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

একদিনের ইতিহাস

ইহার পর অগাষ্ট মাসের প্রারম্ভে (১৯২১) মহাত্মাজী স্বয়ং পুরোহিত হইয়া বোম্বাই সহরে লক্ষাধিক লোকের সম্মুখে বিলাতী কাপড়ের স্তূপে অগ্নি প্রদান করিয়া মহা ঘটা করিয়া উৎসব করিয়াছেন। সে ঘটনায় সোরগোল দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় একদিন বন্ধুবর প্রফেসার কৃপালানীজী আমার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে মহাত্মাজী ৯ই অগাষ্ট রাত্রিতে এলাহাবাদ আসিতেছেন, এবং প্রফেসারজী তাঁহার আশ্রমের আয়-ব্যয়ের বজেট মহাত্মাজীকে দেখাইবার জন্য এলাহাবাদ যাইবেন। আমার শরীর তখন বিশেষ রুগ্ন; বহুকাল ধরিয়া রোগে ভুগিতেছিলাম; সম্প্রতি অসুস্থতার আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে স্থির করিলেন যে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমাকে পাটনাতে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া প্রফেসারজী প্রস্তাব করিলেন আজ পাটনা না গিয়া আমি তাঁহার সহিত এলাহাবাদ হইতে বেড়াইয়া আসিতে পারি।

এলাহাবাদে তখন "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট"(Independent) কাগজের

সহযোগী সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই কার্য্য করিতে-ছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের পূর্ব্ব হইতেই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। প্রফেসরজীর প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ইচ্ছা হইল আমি অন্ততঃ সাত দিন দেশাই মহাশয়ের সহিত এক সঙ্গে থাকিয়া আসি। আমার যদি সেখানে ভাল না লাগে তাহা হইলে আমি পাটনা চলিয়া যাইতে পারি, ইহাও তিনি বলিয়া দিলেন।

পরদিন (১০ই অগাষ্ট) সকালে কৃপালানীজীর সহিত B. N. W. R. লাইনের এক ট্রেণ ধরিয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় এলাহাবাদে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলালজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পণ্ডিতজীর বাড়ী সুপ্রসিদ্ধ আনন্দ ভবনের নাম অনেকদিন ধরিয়া শুনিতেছি। পণ্ডিতজীর এই আন্দোলনে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই বাসভবন কংগ্রেসের কাজের এক প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছে। সুবিস্তৃত বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড এই রাজভবন। বাগান ভেদ করিয়া বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি মহাদেব দেশাই মহাশয় যেন আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কৃপালানীজীকে দেখিয়াই তিনি একগাল হাসিয়া দৌড়িয়া আসিয়া প্রেমভরে তাঁহার পিঠে এক চড় বসাইয়া দিলেন,' এবং আমাদের দুইজনকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর শেষ অংশের একটী ঘরে উপস্থিত হইলেন। সেই ঘরে দেখিলাম সম্মুখে কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া মহাত্মা গান্ধী এক খানা তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন। তাঁহার মন ঐ

কাগজ পত্রের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দুই জন যুবক চেয়ারে বসিয়া তাঁহার কার্য্যের সাহায্য করিতেছিলেন। কৃপালানীজী যাইয়া মহাত্মাজীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে তিনি মুখ তুলিয়া একগাল হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন "আগিয়া ?" আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল না, মনে হইল উহাতে বেয়াদবি হইবে। প্রফেসরজীকে দেখিয়া তিনি যেমন করিয়া হাসিলেন এরূপ হাসি আমি বড় দেখি নাই। সমস্ত বদন মণ্ডল যেন জবাফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়া অসামান্য শোভার সৃষ্টি করিল। কথাবার্ত্তার ভিতর যখনই হাসিয়া উঠেন তখনই ঐপ্রকার অপূর্ব্ব প্রফুল্লতা চ'খে মুখে খেলিতে থাকে। প্রফেসরজী একখানা খদ্দর ধুতি তাঁহার আশ্রমে বুনাইয়া মহাত্মাজীকে উপহার দিতে লইয়া গিয়াছিলেন। উহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতেই মহাত্মাজী উহার সূতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং হাসিয়া হিন্দিতে বলিলেন— "আমার যাট কোটী টাকার কাপড় দরকার, একখানা ধুতিতে কি হইবে, যতক্ষণ ঐ কাপড় না হয় আমি এত বড় কাপড় কি করিয়া পড়ি ? আমাকে ইহা "ফাড়িয়া" নেংটি করিয়া পরিতে হইবে"। প্রফেসরজী বলিলেন "মূলধন পেলে যাটকোটি টাকার কাপড় করা আর বিশেষ কি ?" তাহাতে তিনি জবাব দিলেন—"কেন, এককোটি টাকা মূলধন তোমাদের আছে ; আর যত টাকা চাই দিব।" এই কথাবার্ত্তার পর প্রফেসরজী

আমাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইতে উদ্যত হইলেন। ইতিমধ্যে অন্য আরও ৫।৭ জন লোক সেই ঘরে আসিয়া পড়িলে আমি তখন একটু সময় পাইয়া প্রফেসরজীকে বলিলাম—"আমি তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই সুখী। আমাকে আর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবেন না।" আমি ভাবিলাম, তাঁহার এই অমূল্য সময় আমি কেন নষ্ট করিব? আমার এইরূপ অনিচ্ছা দেখিয়া প্রফেসরজী বিরত হইলেন। ইহার পরে স্নানাহার করিয়া আরও দুই এক বার তাঁহার ঘরে গিয়াছি। সর্ব্বদাই দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে নিমগ্ন।

পণ্ডিত মতিলালজী সহাস্য বদনে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। মহাত্মাজীর ঘরে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বলিলেন, এখন মহম্মদ আলি সাহেবের দরবারে যাই। এই বলিয়া বাড়ীর মধ্যভাগের একটী 'হল' ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি তখন প্রথম শুনিলাম যে মৌলানা মহম্মদ আলি সাহেবও সেখানে আছেন। বহুকাল তাঁহার নাম শুনিয়াছি সেই জন্য তাঁহাকে দেখিতে কৌতূহল হইল; এবং আমিও পণ্ডিতজীর পিছনে পিছনে সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি মহম্মদ আলি সাহেব এক ঘর লোক পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। তাঁহারা নানারূপ প্রশ্ন করিতেছিলেন, আর মৌলানা সাহেব ভাঙ্গা গলায় উত্তর দিতেছিলেন। তাঁহার গলার স্বাভাবিক স্বরই ঐ প্রকার ভাঙ্গা, বোধ হইল যেন পেটের ভিতর হইতে শব্দ

উত্থিত হয়, আর মনে হয় যেন এক একটা কথা ভিতর হইতে ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিতেছেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা, রকম সকম, সমস্তই খুব তেজোব্যঞ্জক।

কিছুক্ষণ লোকজনের প্রশ্নের জবাব দিয়া মৌলানা সাহেব উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখন প্রফেসরজীকে খুঁজিতে লাগিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে যাইয়া দেখি তিনি এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন এবং আশ্রমের রিপোর্ট ইত্যাদি দেখাইতেছেন। তাঁহাদের পরস্পরের কথা হইতে আমি বুঝিয়া লইলাম ইনিই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র জহরলাল। ত্যাগ ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি পণ্ডিত জহরলালকে আমি এই প্রথম দেখিলাম। তাঁহার গুণের কথা নানামুখে শুনিয়াছি। আমি তাঁহাদের কথায় কোন ব্যাঘাত না জন্মাইয়া পিছনে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। জহরলালজী খুব ক্ষীণস্বরে কথা কহিতেছিলেন; অথচ কথাগুলি তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতেছিলেন। আমি একটু কাণ পাতিয়া শুনিলাম যে তাঁহার এই ক্ষীণ শব্দগুলির মধ্যেই মাঝে মাঝে এক একটী কথার উপর হঠাৎ জোর দিয়া তিনি কথা কহেন। তাঁহার চেহারা, কথা ও ব্যবহার হইতে মনে হয় যেন তাঁহার মন ও মুখের মধ্যে কিছুই পার্থক্য নাই—তিনি যেন অন্তরের ভাবের এক জমাট বাঁধা প্রতিমূর্ত্তি। এলাহাবাদের আরও অনেক নেতা, যাঁহাদের নাম সর্ব্বদা কাগজে পড়ি, দেখিলাম মহাত্মাজীর উপস্থিতিতে সকলে এখানে সমবেত হইয়াছেন। বাড়ীর বাহিরে

বাগানে গাছের ছায়ায় ছায়ায় অনেক গ্রামের লোক আসিয়া বসিয়া আছে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সব দেখিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বারান্দায় একটী চেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বসিয়া পড়িলাম। সেখানে আরও অনেক লোক বসিয়াছিল। এমন সময় একখানা মোটর গাড়ি দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিলাম মহাত্মাজী তখন স্ত্রীলোকদিগের সভায় যাইবেন এবং সেখান হইতে স্বরাজ-সভার মাঠে সাধারণের সভায় যাইবেন। মহাত্মাজী আসিবেন শুনিয়াই আমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, হঠাৎ দেখি জহরলাল-জীর হাত ধরিয়া তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চলন খুব দ্রুত। কাহারও প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া তিনি তর তর করিয়া যাইয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। এদিকে মোটার দেখিয়াই যত গ্রামবাসী গাছের ছায়ায় ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল—দৌড়াইয়া আসিয়া দর্শনের জন্য মোটরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে ভেদ করিয়া গাড়িতে উঠিবার উপায় নাই দেখিয়া যেন মহাত্মাজী সেই দ্রুত চলন বন্ধ করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন। জহরলালজী তখন লোকদিগকে দুই সারি হইয়া দাঁড়াইয়া রাস্তা করিয়া দিতে বলিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা মান্য করিয়া তাহারা দুই সারি হইয়া দাঁড়াইল এবং মধ্য দিয়া মোটারে যাইয়া উঠিবার রাস্তা হইল। কিন্তু তথাপি মহাত্মাজী দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি যেন ত্বরিত পদে সেই ক্ষুদ্র জনতা কিরূপে ভেদ করিবেন তাহারই সুযোগ খুঁজিতে

ছিলেন। এদিকে জহরলালজী পুনঃ পুনঃ লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন কেহ যেন নিজের স্থান ছাড়িয়া মহাত্মাজীর দিকে অগ্রসর না হয়। কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনিবে? মহাত্মাজীকে দেখিয়া লোকগুলি যেন কি প্রকার হইয়া গিয়াছে। এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহারা যেন স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। জহরলালজীর প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি, সেই জন্য তাঁহার কথামত তাহারা দুই সারি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু তিনি যখন তাহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিতে লাগিলেন সে কথা যেন কাহারও কাণে গেল না। মহাত্মাজী তাহাদিগকে ভেদ করিবার জন্য যেমন সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহারাও সেইরূপ তাক্ পাতিয়া তাঁহাকে ছুঁইবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেরা ছুটোছুটি খেলাতে যেমন একে অপরকে ছুঁইবার জন্য দাঁড়ায় ইহাও অনেকটা সেইরূপ। লোকদিগের জয়ধ্বনিতে আমার দৃষ্টি তাহাদের দিকে একবার গেল, ইতিমধ্যে দেখি মহাত্মাজী টপ্ করিয়া মোটারে যাইয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। মানুষগুলি তখন যেন পাগল হইয়া গেল। মোটারখানাকে চারিদিকে ঘিরিয়া এধার ওধার হইতে সকলে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। মনে হইল মোটারখানা বুঝি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। এই গোলমালের মধ্যেই উপায়ান্তর না দেখিয়া গাড়ি চালাইয়া দেওয়া হইল। একদিকে লোকের সেই জয়ধ্বনি ও চীৎকার, তাহার উপর এই হুড়াহুড়ি—

মনে হইল কেহ বুঝি চাপা পড়িয়া মারা যায়। মোটার চালাইয়া দিলেও বহু লোক গাড়ীর দুইধার ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। তাহার পর গাড়ীর বেগ বাড়াইলে একে একে সকলে টপ্ টপ্ করিয়া নামিয়া পড়িল; এবং সকল লোকই গাড়ীর পিছনে পিছনে জয়ধ্বনি করিতে করিতে দৌড়াইতে লাগিল। এইরূপ দৃশ্য আমি নূতন দেখিলাম। মহাত্মাজীর প্রতি লোকের কিরূপ ভালবাসা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে পাইলাম; এবং ভালবাসার অত্যাচার কিরূপ হইতে পারে তাহাও প্রথম এই দেখিলাম। তিনি চলিয়া গেলে বাড়ী যেন ক্রমশঃ নিঝুম হইয়া পড়িল। এত লোক চারিদিকে আনাগোনা করিতেছিল, সকলেই ক্রমশঃ কোথায় চলিয়া গেল।

প্রফেসরজী তখন আসিয়া বলিলেন মহাত্মাজী সাধারণ সভায় পৌছিবার পূর্ব্বে আমাদের সেখানে পৌছান দরকার, নতুবা আমরা সভায় ঢুকিতে পারিব না। আমার এই সমস্ত হট্টগোলের কিছুই অভিজ্ঞতা নাই, চিরকাল নির্জ্জনে একা থাকিয়া আসিয়াছি —প্রফেসরজী যেদিকে চালান সে দিকেই আমি চলিতে রাজী। তিনি বলিলেন আমরা প্রথমে "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" Independent আপিসে যাইব, সেখান হইতে মহাদেব দেশাইকে সঙ্গে করিয়া সভাস্থলে যাইব। সেই সময় একজন মোটা সোটা হাসিখুসী লোক প্রফেসরজীকে বলিলেন তিনি আমাদিগকে "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" আপিসে পৌছাইয়া দিবেন। তাঁহার পুত্র শীঘ্রই মোটার গাড়ী লইয়া আসিবে, তাহাকে তিনি আমাদিগকে লইয়া যাইতে বলিয়া

দিবেন। প্রফেসরজীর নিকট পরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এই ভদ্র লোকের নাম শ্যামলাল নেহেরু। তখন ইনি "Democrat "ডেমোক্রাট কাগজ চালাইতেছেন। ইনি খুব রহস্যপ্রিয়, এবং সর্ব্বদাই প্রফুল্লবদন। দ্বিপ্রহরে অনেকক্ষণ মহাত্মাজীর ঘরে বসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার গল্প শুনাইয়া প্রীত করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রকে প্রফেসরজী চিনিয়া লইতে পারিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় প্রফেসরজী তাঁহার বিশাল দেহ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন পিতাকে যেমন ভুল করিবার জো নাই পুত্রকেও সেইরূপ; পিতার চেহারা হইতেই তিনি পুত্রকে চিনিয়া লইবেন। নেহেরু মহাশয় এই কথায় খুব উচ্চহাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমরা Independent আফিসে উপস্থিত হইয়া দেখি সম্পাদক জর্জ্জ জোসেফ্ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই উভয়ে কাজে খুব ব্যস্ত। জোসেফ্ মহাশয় মিঃ চিন্তা-মণিকে সমালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত মহাদেব তাহার প্রুফ দেখিতেছেন। শ্রীযুক্ত মহাদেব মাঝে একবার বলিয়া উঠিলেন যে, এই প্রবন্ধ বাহির হইলেই জোসেফের জেল হওয়া অনিবার্য্য।* মিঃ চিন্তামণির সম্বন্ধে তাঁহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতে মনে হইল যে তাঁহাদের ধারণা তিনি প্রকাশ্য সমালোচনা মোটেই সহ্য করিতে পারেন না। ঐ প্রবন্ধের প্রুফ দেখা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত মহাদেব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের জন্য মৌলানা মহম্মদ আলির দ্বারা দুইটী প্রবন্ধ Undelivered Letters (অপ্রেরিত পত্র) নাম দিয়া লিখাইয়া

আনিয়াছেন তাহা পড়িয়া শুনাইলেন; একখানা পত্র মিঃ সেরওয়ানীর নামে, দ্বিতীয়খানা রঙ্গ আয়ারের নামে। পত্র দুইখানি পড়িয়া সকলের হাসি আর থামে না, এতই তাহা রহস্যপূর্ণ। এইরূপে সভার সময় হইয়া আসিলে আমরা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আফিস হইতে স্বরাজ সভার মাঠে সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম।

সেখানে দেখি সমস্ত মাঠ এক জনসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সকল লোক মহাত্মাজীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। সভার পশ্চাদ্ভাগ দিয়া নেতাদিগের বসিবার মঞ্চে যাইবার রাস্তা। স্বেচ্ছাসেবকেরা সেখানে কড়া পাহারা দিতেছেন। শ্রীযুক্ত মহাদেব আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই পথ দিয়া মঞ্চের নিকট লইয়া গেলেন এবং মঞ্চে উঠিবার একটি সিঁড়িতে নিজেও বসিলেন, আমাকেও বসাইলেন। সভার এক কোণে দেখি মহাত্মাজীর হস্তে অগ্নিসংকার করিবার জন্য বিদেশী কাপড়ের এক স্তূপ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত মতিলালজী যে সমস্ত কাপড় দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিলাতী গলবন্ধ (necktie) দড়িতে বাঁধিয়া মালার ন্যায় সাজান হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম। কেবল গলবন্ধের সেই মালাটি দৈর্ঘ্যে এক শত হাতের কম নহে বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও কিছু বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী পোষাক তিনি পাঠাইয়াছেন। অনেক বহুমূল্য বস্ত্রও সেই বস্ত্রস্তূপের মধ্যে দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। এত বড়

জনতা, কিন্তু গোলমাল বিশেষ নাই; সকলেই ধৈর্য্য ধরিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে মহাত্মাজী, মহম্মদ আলি সাহেব ও পণ্ডিত মতিলালজী, জহরলালজী প্রভৃতি আসিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। মহাত্মাজীর দৃষ্টি কোন দিকে নাই; তিনি দ্রুতগতিতে মঞ্চে আসিয়া উঠিয়া বসিলেন। সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত মতিলালজী, মহাত্মাজী এবং মহম্মদ আলি সাহেব প্রমুখ সমাগত নেতৃবৃন্দের সম্বর্দ্ধনা করিলে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। মহাত্মাজীর বক্তৃতার পর মহম্মদ আলি সাহেব বক্তৃতা দিতে উঠিলে সভার এক কোণে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল যে মৌলানা সাহেবের মাথায় তুকি টুপি বিলাতী। এই বলিয়া সে মৌলানা সাহেবের নিন্দাবাদ স্থরু করিল। স্থানীয় নেতারা মৌলানা সাহেবের এই অপমানে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মৌলানা সাহেব হাতের ইঙ্গিতে সকলকে শান্ত করিয়া টুপিটি হাতে করিয়া সমস্ত জনতাকে বলিয়া দিলেন যে টুপিটির আকার তুর্কি টুপির ন্যায় হইলেও ইহা খদ্দরের প্রস্তুত। তখন ঐ ব্যক্তি নীরব হইয়া বসিয়া পড়িল। এই ঘটনা হইতে মৌলানা সাহেবের বক্তৃতাটি, তাঁহার বিরুদ্ধে অপর পক্ষ, বিশেষতঃ এলাহাবাদের 'লীডার' কাগজ যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ রটাইতেছে তাহার জবাবের মত হইয়া পড়িল। মৌলানা সাহেবের পর ষ্টোকস্ সাহেবের হিন্দী বক্তৃতা হইল। সাহেবকে সহজভাবে উত্তম হিন্দীতে বক্তৃতা দিতে শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। ষ্টোকস্ সাহেবের

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে মহাত্মাজী আবার একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়া বিলাতী কাপড় জ্বালাইবার স্বপক্ষের যুক্তিগুলি বুঝাইয়া দিলেন এবং তিনি এই কাপড়ের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করিবার সময় যাহাতে সকলে যথাস্থানে বসিয়া থাকে এবং ভিড় না করে তাহা বলিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে, সকল লোকেই উঠিয়া দাঁড়াইল। মঞ্চে উঠিবার সময় তিনি তাঁহার পায়ের চম্পল জোড়া (মান্দ্রাজি চটি) মঞ্চের একটি ধাপে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। গোলমালের মধ্যে উহা অযত্নে পড়িয়াছিল। তিনি উঠিয়া আসিতেছেন দেখিয়া আমি চম্পল জোড়া ঠিক করিয়া রাখিলাম। উহা পায়ে দিয়া তাড়াতাড়ি তিনি কাপড়গুলি জ্বালাইতে গেলেন এবং উহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সভাভঙ্গের পর সেই জনতার মধ্যে আর শৃঙ্খলা রহিল না। আমরা কেহই পথ চিনি না; তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে; কি করিয়া বাড়ী ফিরিব ইহা এক সমস্যা হইল। আমরা সেই জনতার মধ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরিতেছিলাম, এমন সময় শ্রীযুক্ত মহাদেবের এক বন্ধুর সহিত দেখা হইলে তিনি আমাদের বাড়ী ফিরিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

"আনন্দ ভবনে" ফিরিয়া দেখি, মহাত্মাজী ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকদিগের মালপত্র বোঝাই হইয়া দুইখানি গাড়ী ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। মহাত্মাজীর যাইবার উদ্যোগ দেখিয়া কৃপালানীজী আমাকে বলিলেন তিনিও তাঁহার সঙ্গে

পাটনাতে যাইবেন, কারণ তিনি যে কাজের জন্য আসিয়াছেন তাহার কিছুই হয় নাই। কৃপালানীজী চলিয়া যাইবেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। আমি কৃপালানীজীকে বলিলাম তিনি চলিয়া গেলে আমিও বেনারস ফিরিয়া যাইব। এই কথায় তিনি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস কিছুদিন বেনারসের বাহিরে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিলেই আমি সুস্থ হইয়া যাইব। তখন তিনি প্রস্তাব করিলেন যে বেনারসে না ফিরিয়া পূর্ব্ব প্রস্তাব মত আমার পাটনাতে যাওয়া ভাল। আমার কিন্তু তখন বেনারস ফিরিবার দিকেই ইচ্ছা। কারণ বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন যে মহাত্মাজীর সহিত এক সঙ্গে চলাফেরা করিলে শরীরের উপর যে ঝুঁকি পড়িবে তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। সেই জন্য তিনি মহাত্মাজীর সহিত কোথায়ও যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কৃপালানীজী কিন্তু পাটনাতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় ষ্টেশনে আসিয়া মহাত্মাজীর গাড়ী হইতে অনেক দূরে এক গাড়ীতে স্থান লইলাম। কৃপালানীজী আমার সকলপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়া মহাত্মাজীর গাড়ীতে চলিয়া গেলেন। গাড়ীতে উঠিয়া চিন্তা করিলাম পাটনা পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সমস্ত অবস্থা খুলিয়া লিখিলেই তিনি আমার দোষ লইবেন না। বেনারস ফিরিতে হইলে রাত্রি প্রায় একটার সময় মোগলসরাই নামিয়া

যাওয়া দরকার। কিন্তু আমি এইরূপ মনে মনে পাটনা যাওয়া স্থির করিয়া, এবং ট্রেণ ঠিক ভোর বেলা বাঁকীপুর পৌছিবে জানিয়া নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিচয়ের সূত্রপাত

রাত্রি তিনটার সময় প্রফেসরজী আসিয়া বক্সার ষ্টেশনে আমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিলেন। তখন দেখি মহাত্মাজী এবং অপর সকলে এই ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মোটারে চড়িয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিবেন, এবং পাঁচ স্থানে সভা করিয়া সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ সাসারাম পৌছিবেন, এই 'প্রগ্রাম' ঠিক হইয়াছে। মোটারে স্থান কম বলিয়া প্রফেস[illegible] তাঁহাদের সঙ্গে যান নাই। তিনি আরা ষ্টেশনে নামিয়া সে[illegible] হইতে লাইট রেলওয়ে দিয়া প্রথমতঃ বিক্রমজিৎ নামক গ্রা[illegible] যাইবেন। ঐ গ্রামে মহাত্মাজী এবং অপর সকলের বেলা ১২টা নাগাদ আসিয়া পৌছিবার কথা। তাহার পর দেড়টার সময় অপর এক ট্রেণে প্রফেসরজী সাসারাম যাইয়া মহাত্মাজীর সহিত মিলিত হইবেন। প্রফেসরজীকে যত্ন করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত দুই জন স্বেচ্ছাসেবক তাঁহার সহিত চলিয়াছেন।

ভোর হয় হয়, এমন সময় আমরা আরা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। প্রফেসরজী একা সাসারাম যাইতেছেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা আমি তাঁহার সঙ্গেই থাকি, এবং এক সঙ্গে দুই জনে পাটনা যাই। অনেকটা সেই কারণেই তিনি আরা হইয়া ঘুরিয়া যাইতেছেন, নতুবা কষ্ট করিয়াও মহাত্মাজীর দলবলের সহিত মোটারে চলিয়া যাইতেন। এই অবস্থায় আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কি করিয়া যাই? সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে আমাকেও আরা ষ্টেশনে নামিতে হইল। প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে ছোট লাইনের গাড়ী ছাড়িল। তাহাতে চড়িয়া বেলা দশটা নাগাদ আমরা বিক্রমজিৎ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম।

গাড়ী হইতে বিক্রমজিতের ৮।১০ মাইল দূর হইতেই দেখি কাতারে কাতারে লোক গ্রাম ভাঙ্গিয়া সভাস্থলে যাইতেছে। ষ্টেশন হইতে সভার স্থান প্রায় দেড় মাইল দূর। এক সুবিস্তৃত ...রের মধ্যখানে তাঁবু ও সামিয়ানা গাড়িয়া সভার স্থান করা ...িছে। শুনিলাম গত বৎসর সাহাবাদ জেলায় বকরি-ইদের ভীষণ দাঙ্গা হয় তাহা এই স্থান হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। ...ই জন্য মহাত্মাজীকে এখানে আনা হইতেছে, যাহাতে এবার আবার হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি ভঙ্গ না হয়। আমাদের সঙ্গে যে স্বেচ্ছাসেবক দুইজন আসিয়াছেন তাঁহারা বলিয়াছিলেন এখানে ১২ টার সময় পৌঁছিয়া মহাত্মাজীর সঙ্গীয় সকলে আহারাদি করিবেন এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু সে প্রকার কিছু যোগাড় দেখিলাম না। বন্দোবস্তের বড়ই অভাব মনে হইতে লাগিল।

স্বেচ্ছাসেবক দুইটী আমাদের জন্য আহার প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে নিষেধ করিলাম। সভাস্থলে বসিয়া থাকিলে আমাদিগকে নূতন লোক দেখিয়া পাছে লোকের ভিড় আমাদের পিছনে লাগে এই ভয়ে একটু দূরে একটা বড় গাছের নীচে আমরা যাইয়া বসিলাম। চারিদিকে খোলা মাঠ, আর নূতন এই বৃক্ষ তলে ব'সে, আমার বড়ই ভাল লাগিতে লাগিল। এদিকে বারটার সময় মহাত্মাজীর আসিবার কথা; কিন্তু ১২ টা বাজিয়া ১টা, ২টা, ৩টা বাজিয়া গেল তথাপি তাঁহার দেখা নাই। লোকজন ইহাতে অধীর হইয়া পড়িতে লাগিল। এবং কোনও স্থানে ঘোড়ার খেলা, কোনও স্থানে বক্তৃতা এই প্রকারে সকলে সময় কাটাইতে লাগিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিয়া আমরাও শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। তাহার উপর সম দিনের অনাহার। দেড়টার সময় সাসারাম যাইবার যে ট্রেণ ছিল তাহাও চলিয়া গিয়াছে। আজ আর কোন দিকে যাইবার ট্রেণ নাই। যে সমস্ত লোক বহুদূর হইতে পায়ে হাঁটিয়া অথবা ঘোড়ায় চড়িয়া সভায় আসিয়াছে তাহারা ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া যাইতে লাগিল এবং সভাস্থলের ভিড় কমিতে লাগিল। এইরূপ অনেক সময় কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ দেখি—যে সমস্ত লোক মাঠের রাস্তা দিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার সভার দিকে মুখ ফিরাইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে এখানকার লোকেরা হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে দেখা গেল বহুদূরে দুই খানা মোটার ধূলি উড়াইয়া সভার দিকে

খুব জোরে ছুটিয়া আসিতেছে। মোটার দেখা যাইবার অল্প সময়ের মধ্যেই মহাত্মাজী সদলবলে আসিয়া পৌছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে সুহৃদ্বর রামবিনোদ বাবু আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া আমাদের সহিত গাছ তলায় দেখা করিলেন। আমরা যে সব অসুবিধা ভোগ করিয়াছি তাহার জন্য প্রফেসরজী কিছুক্ষণ রামবিনোদ বাবুর সহিত স্নেহ-কোন্দল করিলেন। তৎপর কি করিয়া সাসারাম যাওয়া যাইবে তাহাই বিচার্য্য বিষয় হইল। আমার দুর্ব্বল শরীর, সমস্ত দিন আহার হয় নাই, আমার জন্যই তাঁহাদের দুই জনের চিন্তা। স্থির হইল তাঁহারা তখনই আমাকে এক মোটারে লইয়া বসাইয়া দিবেন, তাহার পর নিজেদের ব্যবস্থা কোন প্রকারে করিবেন। ইহাতে যদি অপর লোকের স্থান না হয় তাহা বিবেচনা করা হইবে না। এইরূপ ঠিক হইবার পর সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই আমি যাইয়া তাঁহাদের সাহায্যে এক মোটারে মহাত্মাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত যমুনাদাস গান্ধীর পার্শ্বে স্থান অধিকার করিয়া বসিলাম।

সভায় তখন মহম্মদ আলি সাহেব বক্তৃতা করিতেছিলেন কিন্তু গ্রাম্যলোক কে কাহার কথা শুনে? চারিদিকে গোলমাল। লোকের ভিড়ে স্থান অত্যন্ত গরম হইয়া গিয়াছে। বহুলোকে দুই খানা মোটারকে চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদিগকে বলিলেও কথা শুনিবে না, বরং ক্রমশঃই যেন সেই জনতা চাপিয়া আসিতে লাগিল। রামবিনোদ বাবু এবং

প্রফেসরজী লোকের ভিড় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। যতই সভাভঙ্গের সময় হইল আমাদের চারিদিকের জনতা ততই বাড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ সভার সহস্র সহস্র লোক আমরা যে মোটারে বসিয়া আছি মহাত্মাজী তাহাতে উঠিবে ভাবিয়া এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

সকল লোককেই এদিকে আসিতে দেখিয়া তিনি পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া সভামঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িলেন, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র বহুলোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং সকলেই তাঁহাকে প্রণাম বা স্পর্শ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। সহস্র সহস্র লোক এইরূপে একসঙ্গে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সেই স্থানে যে প্রকার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল তাহা বর্ণনাতীত। যে কয়জন স্বেচ্ছাসেবক তাঁহার সঙ্গে ছিল তাহারা সেই জনতা ঠেলিতে ঠেলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, এবং মহাত্মাজীকে চারিদিকে ঘিরিয়া এক আমগাছের নীচে গিয়া দাঁড়াইল। তখন ঢেউএর পর ঢেউ জনতার স্রোত সে দিকে যাইতে লাগিল, এবং তাহা রোধ করা মুষ্টিমেয় স্বেচ্ছাসেবকের দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। তাহাদের চীৎকারে এবং জনতার গোলমালে আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে গেলে রামবিনোদ বাবু এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া জনতার উপর দিয়াই মোটার চালাইয়া মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইতে ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন। মোটারের ভোঁ ভোঁ শব্দে গ্রাম্য লোকেরা চমকিয়া যাইতে লাগিল, এবং সরিয়া সরিয়া মোটারের রাস্তা ছাড়িয়া জনতা ভেদ করিয়া আমগাছ তলায় পৌছিয়াই

রামবিনোদ বাবু ও আমি মহাত্মাজীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলাম এবং তিনি আমাদের হাতে ভর দিয়া লাফাইয়া গাড়ীর ভিতর চড়িয়া বসিলেন। তখনই মোটারের মুখ ফিরাইয়া দ্রুত সাসারামের দিকে তাহা চালাইয়া দেওয়া হইল। বহুদূর অবধি জনতার স্রোত আমাদের পিছে পিছে দৌড়াইতে লাগিল। দেখিলাম মহাত্মাজীর পায়ে দুই তিন স্থানে চোট লাগিয়া রক্ত নির্গত হইয়াছে। বোধ হয় ভিড়ের ভিতর কোন কোন লোক লাঠি দিয়া তাঁহাকে ছুঁইতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতেই এইরূপ ক্ষত হইয়াছে। গাড়ীতে উঠিয়াও তাঁহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নাই, দুই তিন বার আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, তিনি নিজের চিন্তায় নিবিষ্ট। যাইতে যাইতে একস্থানে গাড়ির বাতিটা পড়িয়া গেলে, গাড়ী থামাইতে হইল। পিছনে মুখ ফিরাইয়া দেখি বহুলোক দৌড়াইয়া আসিতেছে। নিকটে মাঠে যে সমস্ত চাষারা কাজ করিতেছিল হাতের কাজ ফেলিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিতে লাগিল এবং "ধন্য হো গিয়া, ধন্য হো গিয়া" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া আত্মপ্রসাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

কোন গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলেই দেখি গ্রামবাসিরা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বারম্বার হাতের ইঙ্গিতে রাস্তা ছাড়িয়া দিতে বলিলেও তাহারা মোটার যাইবার রাস্তা দেয় না। অগত্যা সেখানে মোটারের বেগ কমাইতে হয়। তখন শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে ফুল, নারিকেল কুচি

ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য এবং পূজার উপকরণ আমাদের গায়ে পড়িতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি হইতে থাকে। এইরূপে কয়েকটী গ্রাম পার হইয়া গেলে এক স্থানে খোলা মাঠের উপর রাস্তা দিয়া খুব বেগে মোটার চালাইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু কিছুদূর যাইয়া হঠাৎ মোটারের একটি টায়ার ফাটিয়া গেল এবং টায়ার বদলাইবার জন্য আমাদের সকলকে নামিয়া দাঁড়াইতে হইল। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, আমি মহাত্মাজীর খুব নিকটে তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় ছাতা মাথায় লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে এক বৃদ্ধা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, মহাত্মা গান্ধী কে?" আমি মহাত্মাজীর এক হাত ব্যবধানে দাঁড়াইয়া—কি করে বলি ইনিই মহাত্মা গান্ধী? আমার পক্ষে এরূপ বলা ধৃষ্টতা হইবে মনে হইল, এবং লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। তাই আমি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বৃদ্ধা বার দুই প্রশ্ন করিলে, মহাত্মাজী নিজে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন তুমি তাঁহাকে খুঁজিতেছ?" তাহাতে বৃদ্ধা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"বাবা আমার বয়স ১০৪ বৎসর হইয়াছে, চোখে ভাল দেখিতে পাই না। আমি সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি, বদরিকাশ্রম গিয়াছি, বাড়ীতে দুই মন্দির স্থাপন করিয়া সেবা-পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমাদের যেমন রাম অবতার, কৃষ্ণ অবতার হইয়া গিয়াছেন শুনিতেছি সেই রূপ মহাত্মা গান্ধী অবতার হইয়াছেন। তাঁহাকে না দেখিলে আমার মৃত্যু হইবে না।" এই বলিতে বলিতে

বৃদ্ধার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। আমরা কেহ না বলিয়া দিলেও বৃদ্ধা এখন বুঝিতে পারিল যে সে মহাত্মাজীর সহিতই কথা কহিতেছে। তাই জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা তৃষ্ণা দূর হইবে কিসে?" মহাত্মাজী ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তৃষ্ণা?—তৃষ্ণা থাকিতে মুক্তি হইবে কি প্রকারে?" বৃদ্ধার এত বয়স শুনিয়া তাহার আহারাদির নিয়ম মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা বলিল যে, সে ১২ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে। তখন হইতে কিরূপ কঠোর নিয়মে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে তাহা সে বর্ণনা করিল। আজকাল বিশেষ কিছু খাওয়া নাই, কেবল দিনে একবার দুর্ব্বাঘাসের সরবৎ খাইয়া কাটায়। বৃদ্ধা এইরূপ মন খুলিয়া মহাত্মাজীর সহিত আলাপ করিতেছে দেখিয়া যে আট দশজন গ্রাম্যলোক ইতিমধ্যে জড় হইয়াছিল, তাহারা বলিল যে, বৃদ্ধা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাতা মাথায় দিয়া এই স্থানে মহাত্মাজীর দর্শনের জন্য এক মনে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার এত বয়স যে চলিবার শক্তি অধিক নাই। আমরা যেরূপ তীরবেগে তখন মোটার চালাইয়া যাইতেছিলাম, তাহাতে মোটারের টায়ার এই স্থানে আসিয়া ফাটিয়া না গেলে বৃদ্ধা কিছুই দেখিতে পাইত না। এখান হইতে একটু দূরেও যদি টায়ারটি ফাটিত, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে মহাত্মাজীর দর্শন অসম্ভব হইত। বৃদ্ধা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার ৮।১০ হাত দূরে টায়ারটী ফাটিয়া যায়। ঘটনার সমাবেশ বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল। আমাদের মোটার মেরামৎ

হইবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় মোটারখানা আসিয়া পড়িল। মহাত্মাজীকে বাহিরে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে দেখিয়া বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সেই গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া মহাত্মাজীর নিকট দাঁড়াইলেন এবং আমাকে নূতন লোক দেখিয়া 'তুম্ কোন্ হ্যায়, ভাই' বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এদিকে টায়ার বদলাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া মৌলানা মহম্মদ আলি সাহেব উচ্চৈঃস্বরে মহাত্মাজীকে দ্বিতীয় মোটারে বসিতে আহ্বান করিলে মহাত্মাজীও তথায় যাইয়া বসিলেন। কিন্তু সেখানে রাস্তার পরিসর এত কম যে, আমাদের মোটার না চলিলে পাশ দিয়া তাঁহাদের যাইবার স্থান ছিল না, সে জন্য যতক্ষণ না এই গাড়ী দোরস্ত হইল ততক্ষণ তাঁহাদিগকেও বসিয়া থাকিতে হইল।

এদিকে আমাদের মোটারখানা মেরামৎ হইয়া গেলে পিছনের গাড়ী হইতে প্রফেসর কৃপালানীজী ও আরও ২।৩ জন মুসলমান ভদ্রলোক ইহাতে আসিয়া উঠিলেন। মহাত্মাজী পিছনের গাড়ী-তেই মৌলানা মহম্মদ আলি সাহেবের নিকট রহিলেন। দুইখানা গাড়ীর মধ্যে আমাদের গাড়ীখানা বড়, এবং ইহার বেগ বেশী। সেই জন্য অল্পকালের মধ্যেই দ্বিতীয় গাড়ীখানা অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা চলিয়া গেলাম। যাইতে যাইতে পূর্ব্বের মত কোন গ্রামে প্রবেশ করিলেই গ্রামবাসীরা ফুলফল দিয়া মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে যে পূজা করিত, এখন আমরাই তাহা পাইতে লাগিলাম। লোকের বিশ্বাস—মহাত্মাজী প্রথম গাড়ীতেই থাকিবেন, তাই এই গাড়ীর দিকেই তাহাদের ঝোঁক্।

প্রফেসরজী, রামবিনোদ বাবু প্রভৃতি বলাবলি করিতে লাগিলেন, ইহা ভালই হইয়াছে; লোকের যাহা কিছু অত্যাচার আমাদের উপর দিয়াই চলিয়া যাইবে, তাহাতে মহাত্মাজী একটু সুখে আসিতে পারিবেন।

এইরূপে সাসারামের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, সহরের সমস্ত লোক সহরের বাহিরে আসিয়া ২।৩ মাইল ধরিয়া দুই কাতারে দাঁড়াইয়া আছে। তখন সূর্য্য অস্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সূর্য্যের রক্তিম আভা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার সঞ্চার করিয়াছে। আমরা নিকটবর্ত্তী হইলেই বহুলোক আনন্দে উল্লম্ফন করিতে লাগিল। দুই সারি লোক ভেদ করিয়া জয়ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ আমরা সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যতই অগ্রসর হই, ততই লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। অবশেষে এক স্থানে রেলওয়ে লাইনের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন রেল যাইবার সময় বলিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের গাড়ী থামাইতেই সমস্ত লোক তাহার উপর চারিদিক হইতে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং লোকের চাপে গাড়ীতে বসিয়াই আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমরা ৭।৮ জন গাড়ীতে আছি, ইহার মধ্যে কে মহাত্মা তাহা লইয়া সেই লোকেরা সমস্যায় পড়িয়া কেহ কৃপালানীজীর, কেহ রামবিনোদ বাবুর পা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল; আবার কেহ বা আমাকে স্পর্শ করিয়াই কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল। এক দল যায়, আর একদল

আসে, এইরূপে জনপ্রবাহ ক্রমাগত আমাদের দিকে আসিয়া ঐরূপ দর্শন স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

ইহাদের সরল বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু আমরা সমস্ত দিনের অনাহার ও পথশ্রমে ক্লান্ত, তাহার উপর লোকের এই প্রকার ভালবাসার দৌরাত্ম্য অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমাদের খুব ক্লেশ হইলেও ভাবিতে লাগিলাম, মহাত্মাজী আমাদের সঙ্গে থাকিলে তাঁহার যে কষ্ট হইত, আমরা তাহাই ভোগ করিতেছি। ইহাতে তিনি রক্ষা পাইয়া গেলেন তাহাই আমাদের কতক সন্তোষের কারণ হইল।

ট্রেণ চলিয়া গেলে রাস্তা খুলিয়া দেওয়া হইল। আমরা তখনই গাড়ী ছাড়িয়া সাসারামের গলিঘুঁজির মধ্য দিয়া আমাদের আবাসস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানেও খুব ভিড়; কিন্তু দরজায় খুব কড়া পাহারা বসান হইয়াছে। অল্পকাল পরেই দ্বিতীয় গাড়ীতে মহাত্মাজী মৌলানা মহম্মদ আলি সাহেব, রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবু প্রভৃতি আসিয়া পড়িলেন।
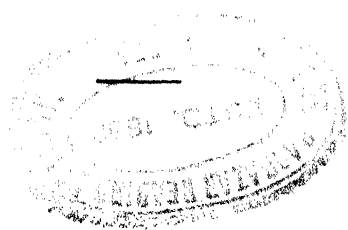
চতুর্থ অধ্যায়

সংযোগ ও পরিচয়

মহাত্মাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেই তাঁহার আহারের ব
ছাগলের দুধ চাহিয়া পাঠান হইল। শুনিলাম দুধের জন্য লে
পাঠান হইয়াছে। দুধ তৈয়ার নাই জানিয়া যমুনাদাস
একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে
আসিলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহা গরম করিয়া আনা হইল
কিন্তু মহাত্মাজী তাহা গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে
যমুনাদাসের মুখ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। শুনিলাম, আ
সারা দিন মহাত্মাজীর আহার হয় নাই। সাসারামে আসি
আহার করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু যখ
দুগ্ধের যোগাড় হইল, তখন সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছে। শুনিলা
সূর্য্যাস্তের পর তিনি কিছু খা'ন না।

তাঁহার আগমনের পরই স্থানীয় নেতারা আসিয়া কথাবার্ত
কহিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হই
পড়িয়াছেন, তাহার উপর সমস্ত দিনের উপবাস। এখন
সাসারামের সভায় বক্তৃতা দেওয়া বাকি আছে। তাঁহাকে একটু
বিশ্রামের সময় দিবার জন্য সভা ঘণ্টা দুই স্থগিত রাখা হইয়াছে

অপর সকল লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু বাহিরে ভয়ানক লোকের গোলমাল। যে ঘরে তিনি বসিয়াছেন, তাহার রাস্তার দিকে ৩।৪টী দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এত লোক সেখানে জড় হইয়া গোলমাল করিতেছে যে, মনে হয় বুঝি দরজাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আমাকে ঘরের এক কোণে দেখিয়া তিনি আঙ্গুল দিয়া একটা বাতি দেখাইয়া দিলেন। আমি ভাবিলাম তিনি বোধ হয় বিশ্রামের জন্য বাতিটা কমাইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু তাহা নহে বাতিটা তিনি চাহিয়াছিলেন। ইহা বুঝিবামাত্র উহা নিকটে লইয়া গেলাম। তিনি তখনই দপ্তরের কাগজ পত্র খুলিয়া কাজে বসিয়া গেলেন।

আমাকে তিনি এই প্রথম হুকুম করিলেন। ইহার পূর্ব্বে যখন মোটারের টায়ার কাটিয়া যায় তখন সেই বৃদ্ধার সহিত কথা বলিবার সময় আমাকে তিনি প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে এক জন নূতন লোক তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছে। আমাকে তখন সঙ্গে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই এখন হুকুম করিলেন এইরূপ মনে হইল। নতুবা তিনি সহজে নূতন বা অপরিচিত লোককে কিছু করিতে বলেন না, ইহা এই দুই দিন দেখিয়া বুঝিয়াছি।

তিনি কার্য্যে নিবিষ্ট হইলেন দেখিয়া আমি ঘরের বারান্দায় চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে ঘরে আসিয়া দেখি তিনি কৃপালানীজীর সহিত ধীরে ধীরে কি কথা কহিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই কৃপালানীজী বলিয়া উঠিলেন—"লোকের অভাব কি? এইত কৃষ্ণদাস আছেন, আপনি যদি ইহাকে রাজী করিতে পারেন

তবে ইহা দ্বারা আপনার কাজ খুব চলিতে পারে।” তিনি উত্তর করিলেন—“তোমার কাজের ক্ষতি করিয়া তোমার লোককে আমি কেমন করিয়া লইব?” কৃপালানীজী বলিলেন—“ইনি আমার লোক নহেন।” ইহার পর আমার সম্বন্ধে তিনি কৃপালানীজীকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দুই এক কথার পরেই আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজেই সাব্যস্থ করিয়া ফেলিলেন, আমাকে আমেদাবাদে “ইয়াং ইণ্ডিয়া” Young India কাগজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করিতে পাঠাইবেন। কৃপালানীজীকে বলিয়া দিলেন আমার যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেই জন্য এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত মহাদেবকে ২।৩ মাসের জন্য তিনি আমেদাবাদ পাঠাইয়া দিবেন। কৃপালানীজী উত্তর করিলেন—“কৃষ্ণদাস গেলে মহাদেবকে আর পাঠাইবার দরকার হইবে না।” এই কথার সময় মহাত্মাজী শৌচে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কথাটী শুনিয়াই “য়্যায় সা?” বলিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিলেন এবং আমার দিকে আঙ্গুল নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন “তব্ তুম্‌কো যানাই হোগা।”

এই ঘটনায় আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। যাহাতে মহাত্মাজীর সহিত যাইয়া কাজের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া না যাই, সেই জন্য শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সহিত দেশ ভ্রমণে যাইতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ আমার শরীর যে প্রকার অসুস্থ, তাহাতে কোন কাজের দায়িত্ব আমি লইতে পারি না। কিন্তু এ'কি হইল? প্র'ফেসরজীর খাতিরে পাটনা যাইবার পথে

সাসারাম আসিয়াছি। মহাত্মাজীর সহিত পূর্ব্বে আলাপ করিবার স্নযোগ হইলেও আমি তাহা ইচ্ছা করিয়াই প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এখন তিনি নিজেই আমার সহিত আলাপ করিলেন; আবার শুধু আলাপ নহে, কাজের ভার দিয়া আমাকে আমেদাবাদ পাঠাইয়া দিতে চাহেন। তিনি শৌচে চলিয়া গেলে এই সমস্ত চিন্তার তাড়নায় অস্থির হইয়া বাহিরে আসিয়া একটা আরাম কেদারায় শুইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। মধ্যে প্র'ফেসরজীকে একবার দেখিতে পাইয়া আমাকে এইরূপে অস্নবিধায় ফেলার জন্য একটু অনুযোগ করিয়া তাঁহার প্রস্তাব যে অত্যন্ত অসম্ভব তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বরং উল্টা আমাকে বলিতে লাগিলেন যে আমার ঐ কার্য্যে যাওয়া বিশেষ দরকার; আমি গিয়া যদি মহাত্মাজীর সামান্য একটু উদ্বেগও কমাইতে পারি তবে তাহাতেই দেশের যথেষ্ট কাজ করা হইবে। প্র'ফেসরজীর সহিত আর বিচার করিয়া লাভ নাই দেখিয়া আমি প্রস্তাব করিলাম নিজেই মহাত্মাজীর নিকট আমার অস্নবিধার কথা খোলাখুলি বলিব, এবং প্র'ফেসরজী যাহাতে সাক্ষাৎ করিবার স্নবিধা করিয়া দেন এই অনুরোধ তাঁহাকে করিলাম।

একটু পরেই আমার ডাক পড়িল। যাইয়া দেখি ঘরের অপর সমস্ত লোক সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি কি বলিব তাহা শুনিবার জন্য তিনি যেন ব্যগ্র হইয়া কাণ পাতিয়া আছেন। আমি যাইয়াই বলিলাম, আমি বেনারসে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের সেবাকার্য্যে ব্রতী আছি; তিনি এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার অন্যত্র যাওয়া সম্ভব নহে। আমার এই আপত্তিতে প্র'ফেসরজী বাধা দিয়া তাহা উড়াইয়া দিলেন এবং সেই কার্য্যের ভার তিনি নিজে গ্রহণ করিলেন এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ইহার পর ঐ কথার জোর আর থাটে না। মহাত্মাজী বলিলেন তিনি এই বিষয়ে পত্র লিখিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত জানিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহাদের এই সমস্ত প্রস্তাবের পর আমি অন্য আপত্তি তুলিলাম। বলিলাম প্র'ফেসরজীর আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ, সেই জন্য তিনি আমার ক্ষমতাকে বাড়াইয়া দেখেন। বাস্তবিক আমার শক্তি তিনি যতটা মনে করেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম। আর আমি মহাত্মাজীর সহিত কখনও থাকি নাই, কাজ করি নাই; তাঁহার ধরণ জানি না। সেই জন্য আমেদাবাদ যাইয়া স্বাধীন দায়িত্ব লইবার ইচ্ছাও আমার নাই, ভরসাও নাই। এই কথায় তিনি বলিলেন, "আমার উহা চিন্তা করা দরকার নাই, মহাদেব যাইয়া আমাকে সমস্ত শিখাইয়া দিবে।" এই বলিয়া তিনি মহাদেবের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন, তিনি দেশে যে ভাব আনিতে চাহেন, তাহা পুরাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নূতন ঢংএ চালাইতে চাহেন। সেই জিনিষটা বুঝিতে হইলে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁহার কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইভাবে তিনি অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। এইরূপে আমার প্রত্যেক আপত্তি খণ্ডন করা

হইল। আজ যাঁহার প্রতি সমগ্র ভারতের দৃষ্টি পড়িয়া আছে, যাঁহার সাত্ত্বিক তেজঃপ্রভাবে এত বড় শক্তিশালী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কম্পিত হইতেছে, আমি তাঁহার সহিত কি বাক্‌যুদ্ধ করিব? তাঁহার কথার উপর আপত্তি তুলিতেও প্রাণে লজ্জা বোধ হইতে-ছিল। সেই জন্য আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে সভায় যাইবার জন্য মহম্মদআলি সাহেব তাগাদা করিতে আসিলেন। মহাত্মাজী তখনই উঠিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় প্র'ফেসরজীকে বলিয়া গেলেন, আমি যেন সভায় যাই।

রাত্রি তখন দশটা। তখনও আমাদের আহার হয় নাই। এদিকে সমস্ত দিন এক প্রকার অনাহারে গিয়াছে। তাহার উপর লোকের ভিড়ে স্থানে স্থানে যে প্রকার কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তাহাতে শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি সভায় যাইতে আদেশ করিয়াছেন শুনিয়া আমার আর গত্যন্তর রহিল না। তাই কৃপালানীজী ও রামবিনোদ বাবুর সহিত সভা-স্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। যে দরজা দিয়া সভামঞ্চের নিকট যাওয়া যায়, তাহা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দরজার নিকট লোকের খুব ভিড়। সে ভিড়ের মধ্য দিয়া দরজার নিকট যাইতেই আমাদের জন্য তাহা খোলা হইল, এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক ঢুকিয়া পড়িল। তাহাতে একটা ধাক্কাধাক্কি লাগিয়া গেল। কৃপালানীজী ও রামবিনোদ বাবু মঞ্চের উপর উঠিয়া পড়িলেন। আমি কতক লজ্জায়, কতক লোকের চাপে উঠিতে বিলম্ব করিতেছিলাম। এদিকে স্বেচ্ছাসেবকেরা লোক

সামলাইতে না পারাতে মার্ধর্ আরম্ভ হইয়া গেল, এবং আমারও পিঠে কিছু কিছু আঘাত পড়িতে লাগিল। মহম্মদআলি সাহেব তাহা দেখিয়া—'don't be so slow, man'—'একটু চট্‌পট্ এস না, অত আস্তে কেন' এই বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া আমাকে মঞ্চের উপর তুলিয়া ফেলিলেন।

প্রকাণ্ড সভা। মঞ্চের সম্মুখে প্রায় বিশ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছে। মঞ্চের উপর মহাত্মাজী ও মৌলানা মহম্মদআলি সাহেব ব্যতীত বেহারের ২।১ জন প্রান্তীয় নেতা বসিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের মধ্যে বসিয়াছি। প্রথমে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সম্ভাষণের পর মহাত্মাজীর বক্তৃতা হইল। তাঁহার পর মহম্মদআলি সাহেব বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তখন রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি কোন বক্তৃতাই মন দিয়া শুনিতে পারি নাই। পেটে ক্ষুধার জ্বালা; চক্ষে ঘুম; শরীর যেন এলাইয়া পড়িতে চায়। এই সময় প্র'ফেসর কৃপালানীজী ও রামবিনোদ বাবু ইঙ্গিতে সভা ছাড়িয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন। আমি সম্মতি জানাইলে তিন জনে ধীরে ধীরে মঞ্চ হইতে নামিয়া আবাসস্থলে ফিরিয়া গেলাম।

আহারাদি করিয়া এক ঘুমের পর জাগিয়া দেখি, মহাত্মাজী সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার নিকটেই একটী খাটে বসিলেন, এবং সেখানে তাঁহার বিছানা করিয়া দেওয়া হইলে শুইয়া পড়িলেন। তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে "শ্রীরাম, শ্রীরাম" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

খুব ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া স্নান করিয়া তৈয়ার হইয়া আছি। এদিকে মহাত্মাজী উঠিয়া মুখ-হাত ধুইলে পর তাঁহার প্রাতরাশ দেওয়া হইল। আহার শেষ হইলে তাঁহার রেকাব, দুধের বাটি ও চামচ মলিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া আমাকে দিলেন। কত লোক তাঁহার ঐ টুকু সেবা করিবার জন্য লালায়িত। আমি মাত্র একদিন তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছি। ইহারই মধ্যে আমাকে তিনি এতটা আত্মীয় ভাবে দেখিয়াছেন যে, নিজের বাসন মলিতে দিলেন, ইহা ভাবিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলাম। বাসন মলা শেষ হইলে আমাকে আবার ডাকিয়া কাগজ ও পেন্সিল দিয়া তাঁহার গত রাত্রির হিন্দী বক্তৃতাটি ইংরাজীতে লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি ঘুমাইতে ঘুমাইতে সেই বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহার উপর সকাল হইতে বাটীর চতুর্দ্দিকে লোকের গোলমাল চলিতেছে; মাথাও ঠাণ্ডা নাই; সেই জন্য উহা লিখিতে পারিব কি না চিন্তা হইল। তাহার পর এদিকে ভাবিলাম যত শীঘ্র সম্ভব বেনারসে ফিরিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে গত রাত্রির প্রস্তাব আমার বলা দরকার। সকাল সাড়ে আটটার সময় একখানি ট্রেণ আছে। তাই, যাইয়া প্রস্তাব করিলাম যে, আমি ঐ ট্রেণেই চলিয়া যাই, যাইবার সময় ট্রেণে বসিয়া বক্তৃতাটি লিখিব এবং শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় যদি সম্মতি দেন, তাহা হইলে তিন দিন পরে ১৬ই অগাষ্ট তারিখে তাঁহার সহিত পাটনা যাইয়া মিলিত হইব। তিনি এই প্রস্তাব

অনুমোদন করিলেন, এবং আমাকে বলিয়া দিলেন, আমি যেন শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার হইয়া তিনটী কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রথম, প্রস্তাবিত কাজ করিবার যোগ্যতা তাঁহার মতে আমার আছে কি না; দ্বিতীয়, ঐ কাজে তাঁহার অনুমতি আছে কি না; এবং তৃতীয়, যদি থাকে, তাহা হইলে উহাতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ আছে কি না। আমার হাতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে কোন চিঠি দিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহার দরকার নাই বলিলাম। ইহার পর তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া ষ্টেশনে যাইবার পূর্ব্বে বিদায় লইবার জন্য আবার তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি নানা কার্য্যে ও কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত থাকিলেও খুব প্রসন্ন বদনে বিদায় দিলেন। তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্টটী লিখিতে যেন ভুলিয়া না যাই তাহা আবার বলিয়া দিলেন। একদিনের পরিচয় হইলেও এমন আত্মীয় ভাব দেখাইলেন যে, আসিবার সময় এই প্রথম আমি তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে সাহস পাইলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

পাটনাতে একদিন

সকাল ৮॥ টার ট্রেণে সাসারাম হইতে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ১টার সময় বেনারস পৌছিলাম। ট্রেণে বসিয়া মহাত্মাজীর সাসারামের বক্তৃতাটী লিখিয়া ফেলিলাম। আমাকে হঠাৎ বেনারসে ফিরিতে দেখিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এলাহাবাদ পৌছিয়া আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে, সেখানে সাত দিন থাকিব। কিন্তু ইতিমধ্যে এত-কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি তাহা তিনি জানেন না। আমাকে প্রথম দেখিয়াই তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন যে, এই তিন দিনেই আমার শরীর বেশ ভাল দেখাইতেছে। তাহার পর গত দিনের অসামান্য ক্লেশ ও অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বিবরণ বলিয়া যখন আমি তাঁহার নিকট মহাত্মাজীর প্রস্তাবটী উত্থাপন করিলাম অতি সহজে তিনি তাহাতে সম্মতি দিলেন। ইহাতে আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। মহাত্মাজীর সহিত যাইলে পাছে আমার শরীর আরও অসুস্থ হইয়া পড়ে এই ভয় তাঁহার পূর্ব্বে ছিল। কিন্তু এই দুই দিনের ক্লেশের ভিতরও যখন শরীর বেশ ভাল দেখিলেন, তখন তাহার সে ভয় কাটিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমস্ত বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, একেবারে আমেদাবাদ যাইয়া "ইয়াং ইণ্ডিয়ার" Young India দায়িত্ব লওয়া অপেক্ষা যদি আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাই তাহা হইলে আমার প্রকৃত মঙ্গল হইবে। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সাধু ব্যক্তির সেবাতে যেমন চিত্তের ময়লা দূর হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। যখন যেরূপ সঙ্গ করা যায় তাহারই একটা ছাপ চরিত্রের উপর আসিয়া যায়, ইহা সকলের সাধারণ অভিজ্ঞতা। সেই জন্য সাধু সঙ্গের এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। মহাত্মাজী পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি; অহিংসা ধর্ম্ম কেবল তিনি মুখে প্রচার করেন না, নিজের জীবনে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অহিংসার প্রতিষ্ঠানে কেবল জগতের অশান্তি নিবৃত্ত হইবে এরূপ নহে; ব্যক্তিগত ভাবে আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমেই অহিংসার পাঠ অভ্যাস করা প্রয়োজন। আমি যদি নিজের ক্ষুদ্র অহংভাব ত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য ঐরূপ মহাপুরুষের সেবা করিতে পারি তাহা হইলে আমার জীবন পবিত্র হইয়া যাইবে, ইহা তিনি বিশেষ করিয়া বারবার আমাকে বলিতে লাগিলেন।

আমাকে তিনি আরও বুঝাইলেন যে, আমাদের অন্তরের যাহা অবস্থা, সেই অবস্থানুরূপ আমরা জগতকে দেখিয়া থাকি। ভিতরটা যদি অসত্যের অন্ধকারে আবৃত থাকে তাহা হইলে বাহিরে ও আর সত্যের জ্যোতিঃ দেখা যায় না। ভিতরে যদি

হিংসা, দ্বেষ ও অভিমানের স্রোত বহিতে থাকে তাহা হইলে বাহিরেও কেবল হিংসা, দ্বেষ ও অভিমানের খেলাই দেখিতে পাই। সেই জন্য জগতকে সাচ্চা ও পবিত্র ভাবে দেখিতে ও বুঝিতে হইলে হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। সেই আত্মশুদ্ধি নাই বলিয়া আমরা এক একজন অশান্তির কেন্দ্র হইয়া জগতে বিচরণ করিয়া থাকি, এবং শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির আগুন ছড়াইতে থাকি। চরিত্রের এই সমস্ত দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, এবং অন্তরের 'শয়তান' নিবৃত্ত করিতে হইলে, মহৎব্যক্তির সঙ্গ ও সেবা দ্বারা যত সহজে তাহা হয়, কেবল নিজের সহিত নিজে লড়াই করিয়া সেরূপ হয় না।

এইরূপে তাঁহার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া ১৫ই অগাষ্ট বেনারস ত্যাগ করিয়া পর দিবস ভোরবেলা পাটনা আসিয়া পৌঁছিলাম। মহাত্মাজী সাসারাম হইতে আমার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যে তিনটী প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার জবাব তিনি প্র'ফেসর কৃপালানীজীর নামে এক পত্রে লিখিয়া দিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন যে, মহাত্মাজীর প্রস্তাবিত কার্য্যের জন্য যেরূপ উপযুক্ততা থাকা দরকার আমার তাহার অভাব হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না, এবং মহাত্মাজীর যে কোন কাজে তিনি আমাকে প্রসন্নচিত্তে পাঠাইতে পারেন; তবে আমার যাহা জীবনের প্রকৃত অভাব তাহা দুর করিতে হইলে আমাকে চরিত্রের অহিংসা বৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সেই জন্য তিনি মনে করেন যে আমাকে আমেদাবাদ

না পাঠাইয়া যদি মহাত্মাজী সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিয়া তাঁহার সেবক করিয়া ল'ন তাহা হইলেই আমার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

পাটনা ষ্টেশনে নামিয়া একজন কুলীকে মহাত্মাজী কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলে সে আমার মাল-পত্র মাথায় করিয়া ষ্টেশনের সন্নিকট জাতীয় বিদ্যামন্দিরে আমাকে পৌছাইয়া দিল। সেখানে রামবিনোদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম মহাত্মাজী সহরের চারি মাইল ব্যবধানে সদাকৎ আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। রামবিনোদবাবু বলিলেন তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া যাইবেন। সেই জন্য নিশ্চিন্ত মনে মুখ হাত ধুইয়া স্নানাদি সারিয়া বিদ্যামন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেখানকার কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি এমন সময় শুনিলাম আমাকে মহাত্মাজীর নিকট শীঘ্র লইয়া যাইবার জন্য আশ্রম হইতে একখানা মোটার আসিয়াছিল। কিন্তু আমাকে সেখানে কেহই চিনে না, সেজন্য আমি আসিয়া পৌছিয়াছি একথা কেহ বলিতে পারে নাই এবং আমাকে না পাইয়া মোটার চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদে যত শীঘ্র পারি সদাকৎ আশ্রমে পৌছিবার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। অথচ একা কোন বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিছুকাল পরে আশ্রম হইতে একজন লোক আসিয়া ব্যস্তভাবে আমার খোঁজ করিতে লাগিলেন এবং আমাকে পাইয়াই বলিলেন যে ৮ টার সময় ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসিবে তাহার

পূর্ব্বে আমাকে মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে হইবে এরূপ অভিপ্রায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তখনই একখানা গাড়ীতে আমাকে লইয়া সেই ব্যক্তি রওনা হইলেন। কিন্তু তখন প্রায় ৮টা; সেই জন্য সভার পূর্ব্বে আমাদের সেখানে পৌছিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না।

বেলা ৯টার কাছাকাছি সদাকৎ আশ্রমে পৌছিলাম। সহরের বাহিরে গঙ্গার তীরে এক বাগানের মধ্যে এই আশ্রম। এখন ভরা বর্ষা বলিয়া গঙ্গার একূল ওকূল দু'কূল ভাসিয়া গিয়াছে। আশ্রমের ভিতরে খুব কাজকর্ম্মের আয়োজন দেখিলাম। বড় বড় বাড়ী ঘর তৈয়ার হইতেছে; কোথাও চরকা, কোথাও তাঁতের কারখানা রহিয়াছে। একটী কুটীরের পিছন দিকের বারান্দায় মহাত্মাজী বসিয়া আছেন। সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিয়াছে। কুটীরের ভিতর বিশেষ পরিচিত লোক ব্যতীত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। আমি সেখানে পৌছিলেই প্র'ফেসর কৃপালানীজী আদর করিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া বসাইলেন। মহাত্মাজী এখানে আছেন বলিয়া এই বৃষ্টি-বাদলের মধ্যেও লোকের ভিড় লাগিয়া রহিয়াছে। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা দলে দলে আসিয়া কুটীরের পিছনদিকে ঘুরিয়া গিয়া দূর হইতে মহাত্মাজীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া যাইতেছে।

আমি যাইয়া বসিলেই কৃপালানীজী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কি ঠিক করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি

শুনিয়া বলিলেন মহাত্মাজী নিজ হইতেই স্থির করিয়াছেন আমাকে আমেদাবাদ না পাঠাইয়া এখন সঙ্গে সঙ্গে রাখিবেন। অতএব শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐ অনুরোধ তাঁহার পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মঞ্জুর হইয়া রহিয়াছে। একথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এখন কি কারণে তিনি তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্র'ফেসরজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বিশেষ কিছু জানেন না বলিলেন।

বেলা ১টা অবধি "ওয়ার্কিং কমিটি" চলিয়াছে। তখন পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই। আশ্রমেই আহারাদি হইল। ওয়ার্কিং কমিটিতে পণ্ডিত মতিলালজী ও মৌলানা মহম্মদ আলি সাহেবকে দেখিতে পাইলাম। আর দেখিলাম কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী নেতা, শেঠ যমুনালাল বাজাজ মহাশয়কে; লম্বা চেহারা; চীৎকার করিয়া কথা কহেন এবং নিজের বক্তব্য বেশ জোরের সহিত বলিয়া কমিটির মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন। সদাকৎ আশ্রমের প্রাণ ও প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মজরুল হক্ সাহেবকেও দেখিতে পাইলাম। তাঁহার চুল দাড়ি সমস্ত পাকিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে। তিনি যে কখনও বিলাত ফেরতা ব্যারিষ্টার ছিলেন তাহার চিহ্ন তাঁহার চেহারা বা পোষাকে এখন আর পাওয়া যায় না। লম্বা দাড়ি রাখিয়াছেন—ঠিক যেন সাবেকী মুসলমান মুরুব্বি গৃহস্থ।

গত রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এবং সমস্ত সকাল

মাঝে মাঝে থামিয়া থামিয়া টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইতেছে। তাহাতে আশ্রমের অনেক স্থানে জল জমিয়া গিয়াছে। চলাফেরার বড় কষ্ট। আমি ওয়ার্কিং কমিটির সভা এই প্রথম দেখিলাম। অগাষ্ট মাসে সকল লোকের বুক ভরা উৎসাহ, পূর্ণ উদ্যমে সকলে স্বরাজের জন্য খাটিতেছেন। স্বরাজ প্রাপ্তি সম্বন্ধে কাহারও সংশয় নাই। কংগ্রেসের এক একটা মন্তব্য তখন দেশবাসীর নিকট গভর্ণমেণ্টের আইনের অপেক্ষাও অধিক মর্য্যাদা লাভ করিতেছে। যদি স্বরাজ লাভ হয় তাহা হইলে এই ওয়ার্কিং কমিটি বর্ত্তমান ভারত-গভর্ণমেণ্টের স্থান অধিকার করিবে। সেই ওয়ার্কিং কমিটিকে আশ্রমের এই কুটীরে জাঁকজমক শূন্য হইয়া চারিদিকে জল কাদার মধ্যে সভা করিতে দেখিয়া স্বরাজের এক মনোরম চিত্র আমার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। এতদিন আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। দেশের পুরাতন নেতারা সমস্ত বিষয়ে সাহেবিয়ানার অনুকরণ করিয়া চলিতেন। তাঁহাদের পক্ষে এত অসুবিধা ভোগ করিয়া শরীরের আরাম ত্যাগ করিয়া, জলবৃষ্টির ভিতর ঐরূপ ভিজে সেঁত-সেঁতে স্থানে মিলিত হইয়া দেশের ভালমন্দের বিচার করিতে বসা নিতান্ত অসম্ভব হইত। আমাদের দরিদ্র দেশ; নিত্য দুই কোটী লোক এদেশে কখনও অনশনে কখনও বা অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিয়া থাকে। কিন্তু দিল্লী ও সিমলার ভোগৈশ্বর্য্য দেখিলে কি সেই দারিদ্র্যের লক্ষণ কিছু পাওয়া যায়? আমাদের পুরাতন নেতারা বিলাতি আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া

এতকাল কংগ্রেসকে চালাইয়াছেন। কিন্তু মহাত্মাজী কংগ্রেসের হাল ধরিয়া সমস্তই ঘুরাইয়া দিয়াছেন। তাই আজ দেশের মান্য গণ্য নেতারা নিজেদের রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্য ও ভোগ ত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরে বসিয়া দেশের বিষয় আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। স্বরাজলাভ হইলে আমাদের গভর্ণমেণ্ট যদি এইরূপ পর্ণকুটীর হইতে চালিত হয় তবে তাহা কি সুন্দর হইবে! আমরা যেমন গরীব আমাদের গভর্ণমেণ্টও ঠিক সেই অবস্থার অনুরূপ হইবে। বাহিরের জাঁকজমক ছাড়িয়া দিয়া তখন কেবল দেশের মঙ্গলের জন্য শুদ্ধ, সাত্ত্বিকভাবে গভর্ণমেণ্ট গঠিত ও রক্ষিত হইবে। এইরূপে "সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তা" (plain living ও high thinking) এর আদর্শ প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশে আবার সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে, এবং মহাত্মাজী যে "রামরাজ্য" স্থাপনের কথা বলেন তাহা আর অসম্ভব বা কল্পনার বিষয় বলিয়া মনে হইবে না।

বসিয়া বসিয়া এই সমস্ত চিন্তা করিতেছি, আর মহাত্মাজীকে দর্শনের জন্য লোকজনের ব্যগ্রতা দেখিতেছি। তাহাদিগকে আট্‌কাইয়া রাখা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা না দেখিলে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। ওয়ার্কিং কমিটির কাজ শেষ হইলে যখন অপর সকল নেতারা চলিয়া গেলেন, তখন প্র'ফেসরজী আমাকে সঙ্গে করিয়া মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি যাইয়া পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতেই তিনি বিশেষ প্রসন্নভাব দেখাইলেন। প্রথমে আমি তাঁহার সাসারামের বক্তৃতার যে

সারাংশ লিখিয়াছিলাম তাহা তাঁহার হাতে দিলাম। তাহাতে—“মেরা রিপোর্ট ভি আগিয়া, বহুৎ আচ্ছা হুয়া” এই বলিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ প্রসন্নতা ও আনন্দ দেখিয়া আমারও অন্তর হইতে সমস্ত সংকোচ চলিয়া গেল। তাই পূজনীয় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের কথা উত্থাপন করিয়া প্র’ফেসরজী যখন সেই পত্র পড়িতে গিয়া হস্তাক্ষরের অপরিস্ফুটতার জন্য মাঝে মাঝে আট্‌কাইয়া যাইতে-ছিলেন, আমি তখন তাঁহার হাত হইতে উহা লইয়া নিজেই মহাত্মাজীকে পড়িয়া শুনাইলাম। পত্র মধ্যে স্থানে স্থানে মহাত্মাজীর প্রশংসা ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যাপারে অহিংসা পদ্ধতির প্রচলন দ্বারা তিনি জগতের যুদ্ধ বিগ্রহ ও জাতিগত বিদ্বেষানল প্রশমনের পথ খুলিয়া দিয়াছেন; তাঁহার শান্তিপূর্ণ অসহযোগ ভারতে কৃতকার্য্য হইলে উহা জগতের উদ্ধারের কারণ হইবে; তিনি অহিংসা ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া যে অহিংসার স্রোত প্রবাহিত করিতেছিলেন, তাহার সংস্পর্শে আসিয়া আমি পবিত্র হইয়া যাইব;—এই সমস্ত প্রশংসার কথা ঐ পত্র মধ্যে ছিল, এবং মহাত্মাজী তাহা সলজ্জভাবে মাথা হেঁট করিয়া শুনিতেছিলেন।

পত্রপাঠ শেষ হইলে তিনি আবার ঈষৎ হাসিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দীতে বলিলেন—“আচ্ছা, এখন তুমি আমার সঙ্গেই থাকিবে। পরে কি করিতে হইবে দেখা যাইবে”। এইরূপে তিনি আমাকে নিজের সঙ্গী করিয়া লইলেন। তাঁহার

সহিত কথা সমাপ্ত হইলে আমরা উঠিয়া আবার ঘরের ভিতর আসিলাম। তখন প্র'ফেসরজী আনন্দ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, এখন আর আমাকে সলজ্জভাবে পিছনে পিছনে থাকিলে চলিবে না, এখন লোকজনের ভিতর সাহস করিয়া আগে আগে চলিতে হইবে। তাহা না করিলে জন-সমুদ্রের মধ্যে আমি একেবারে চাপা পড়িয়া যাইব। তিনি মহাত্মাজীর সহিত বহুকাল থাকিয়া এই বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহার অনুরূপ চেষ্টা অবশ্য করিতেই হইবে, কিন্তু অগ্রণী হইয়া লোকজনের ভিতর চলিতে হইলে যেরূপ তৎপরতা দরকার, আমার কি তাহা স্বাভাবিক হইবে?

কিছুক্ষণ পরে আমাদের যাত্রার আয়োজনের হুকুম আসিল। আশ্রম হইতে প্রথম জাতীয় বিদ্যামন্দিরে যাইতে হইবে, সে স্থান হইতে মহাত্মাজী জনসাধারণের এক সভায় যাইবেন। তাহার পর সন্ধ্যার সময় পাঞ্জাব মেল ধরিয়া কলিকাতা যাওয়া হইবে। কলিকাতায় একদিন থাকিয়া আসাম যাত্রা করিতে হইবে।

আমি প্র'ফেসরজীর সহিত মহাত্মাজীর অগ্রে জাতীয় বিদ্যা-মন্দিরে চলিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি সমস্ত বিদ্যালয় লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন মোটার আসিতে দেখিলেই লোকে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে। আমাদের মোটারে মহাত্মাজী না থাকিলেও ঐরূপ হর্ষধ্বনি হইতে লাগিল। এক জন ভস্মমাখা সাধু সাষ্টাঙ্গ দিবার জন্য মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িল এবং পুনঃ

পুনঃ বুক ডন্ করিয়া সাষ্টাঙ্গ দিতে লাগিল। ইহার পরে মহাত্মাজী যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন লোকের উৎসাহের আর অবধি রহিল না। তাঁহার উপস্থিতিতে মানুষগুলি যেন কেমন হইয়া যায়। তাঁহার কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি নাই; ধীর, স্থির ভাবে তিনি নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন। তিনি পৌঁছিয়াই দ্রুতগতিতে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরায় গালিচার উপর যাইয়া বসিলেন। সেখানে সমস্ত লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইলে অতি কষ্টে যাইতে হয়। ঐ ভিড়ের মধ্যেই ওয়ার্কিং কমিটির আবার এক বৈঠক বসিল। তিনি বাঁ হাতের কনুইয়ের উপর তাকিয়া ঠেশান দিয়া স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া আছেন। পণ্ডিত মতিলালজী এক একটী প্রস্তাব তুলিয়া তাঁহার মত চাহিতেছেন। তিনি যে সমস্ত উত্তর দেন তাহার ভিতর কোন বাহ্যিক আড়ম্বর বা বাক্‌চাতুর্য্য নাই। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত একটি কথাও তিনি কহেন না। এই-রূপে সভার কার্য্য চলিতে লাগিল, কিন্তু সেই সময়ও কোন কোন বাক্‌পটু লোক অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগেরও যথোপযুক্ত উত্তর দিতে লাগিলেন। এইরূপে কথায় কথায় এই সমস্ত লোকেরা তাঁহাকে দখল করিয়া বসিলে পণ্ডিত মতিলালজী তাহাতে বাধা দিয়া সভার কার্য্য করিয়া লইতেছেন। আমি অনেকক্ষণ তাঁহার পিছনে বসিয়া এই সমস্ত দেখিলাম, কিন্তু ভিড়ের ভিতর শরীর অস্থির বোধ হইতে লাগিল। তাই উঠিয়া অপর একটী কামরাতে গিয়া

বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এদিকে ওয়ার্কিং কমিটির কাজ শেষ হইলে তাঁহার প্রকাশ্য সভায় যাইবার সময় হইয়া আসিল। তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া আমার সঙ্গে কি কি জিনিষপত্র আছে, জামা, কাপড়, কোন জিনিষের দরকার আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার সবই আছে বলিলাম। তাহার পর আমাকে বিদ্যামন্দির হইতেই ষ্টেশনে যাইতে বলিয়া দিলেন। এদিকে তিনি উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু লোকজনের প্রশ্নের বিরাম নাই। সকলেরই তাঁহার সহিত কাজের অন্ত নাই। এই বিষম হট্টগোলের মধ্যেও তিনি আমাকে মনে করিয়া সময় মত ষ্টেশনে যাইবার কথা বলিয়া দিলেন। সদাকৎ আশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের পর আমি আর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারি নাই। তিনি যেরূপ ব্যস্ত, এক মুহূর্ত্ত সময় নাই, তাহাতে বিনা কাজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার দরকারও ছিল না। তিনি আমাকে কিছু বলিয়া না গেলেও আমি যথাসময়ে ষ্টেশনে যাইতাম। কিন্তু নূতন লোক, পাছে গোল করিয়া বসি, সেই জন্য ঐ টুকু মনে করিয়া রাখিয়াছেন।

মহাত্মাজী সভায় চলিয়া গেলে বিদ্যামন্দিরের জনতার হাটে ভাঙ্গন ধরিল। বাহিরের লোক সব চলিয়া গেলে মহাত্মাজীর এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গীয় লোকেরা ষ্টেশনে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় প্র'ফেসরজী, রামবিনোদ বাবু প্রভৃতি বন্ধুবর্গ ষ্টেশনে আসিয়া আমাকে ট্রেণে তুলিয়া দিলেন। ষ্টেশনে বিষম লোকের ভিড়; কে কোথায় উঠিবে ঠিক নাই।

গাড়ী ছাড়িতেছে দেখিয়া আমি এক স্থানে উঠিয়া বসিলাম। এ পর্য্যন্ত আমি প্র'ফেসরজীর আড়ালে থাকিয়া তাঁহার স্নেহ ও যত্নের দ্বারা পুষ্ট হইয়া কাটাইয়াছি। এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া একেবারে একা দাঁড়াইতে হইবে। নূতন সঙ্গীরা সকলেই অপরিচিত। আমি কখনও এভাবে পূর্ব্বে বাহির হই নাই। শ্রীভগবান্ কি সূত্রে কোন্‌দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, কিছুই জানি না। সেই জন্য মনে ভারী উদ্বেগ; কিন্তু মহাত্মাজীর ন্যায় মহাজনের সঙ্গে যাইতেছি ভাবিয়া হৃদয়ে আশা ও উৎসাহ রহিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আসাম যাত্রা

১৭ই অগাষ্ট সকালে আমরা কলিকাতা পৌঁছিলাম। লিলুয়া ষ্টেশনে শ্যামসুন্দর বাবু, জিতেন্দ্রবাবু প্রভৃতি বাঙ্গলার নেতারা মহাত্মাজীর সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতার সেই পুরাতন পরিচিত দৃশ্য চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু মহাত্মাজী বাঙ্গলার অতিথি; তাঁহার সঙ্গে আসিয়া আমিও যেন অতিথি হইয়াছি, এবং এক নূতন চক্ষুতে পূর্ব্বপরিচিত পুরাতন দৃশ্যগুলি দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। হাওড়া ষ্টেশনে মহাত্মাজীর গাড়ীর সম্মুখে লোকের খুব ভিড়। একবার ভাবিলাম, আমি যে তাঁহার সঙ্গে আছি তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাই। কিন্তু এত ভিড় যে, শক্তিতে তাহা কুলাইল না। শেষে প্ল্যাটফরমের এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ট্রেণ আসিয়া থামিলেই ট্রেণের সমস্ত যাত্রীরা যে যাহার গন্তব্যস্থলে যাইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমাকে কোথায় যাইতে হইবে কিছুই জানি না; কেহ আমাকে তাহা পূর্ব্বে বলিয়া রাখে নাই। এখন আর প্র'ফেসরজী সঙ্গে নাই যে, তিনি আমার হইয়া সব ঠিক করিয়া দিবেন। তাই চতুর্দ্দিকের লোকজনের চেষ্টা ও উদ্যোগের

মধ্যে আমিই কেবল নিশ্চেষ্ট। এদিকে মহাত্মাজী বহুলোক পরিবৃত হইয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখন কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় কলিকাতাবাসী এক গুজরাটী ভদ্রলোক আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। মহাত্মাজী তাহাকে আমার খবর লইতে বলিয়া দিয়াছেন। তাই দেখিলাম, আমি নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, তিনি আমাকে ভুলেন নাই।

কলিকাতায় তখন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় আমরা সেদিনের মত শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবীর অতিথি হইয়াছিলাম। সেখানে মহাত্মাজীর বসিবার স্থান উপরে করা হইয়াছিল। আমি প্রায় সকল সময় নীচে ছিলাম। ইহার মধ্যে তিনি আমাকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলেন; উপরে গিয়া দেখিলাম, বহু স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত কথা কহিবার জন্য চারিদিকে অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু চট্টগ্রামের রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের ব্যাপার লইয়া কয়েকজন স্থানীয় নেতা আলোচনা করিতেছিলেন বলিয়া স্ত্রীলোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইতেছিলেন না। ৫টার সময় দার্জ্জিলিং মেলে আমরা আসাম যাত্রা করিব। ইহার পূর্ব্বে তিনি মির্জ্জাপুর পার্কে সভা করিতে চলিয়া গেলেন। আমরা সভায় না গিয়া মালপত্র লইয়া একেবারে শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমরা এক সঙ্গে বহুলোক চলিয়াছি। নেতাদের মধ্যে মহাত্মাজী ব্যতীত মৌলানা মহম্মদ আলি, বেগম মহম্মদ আলি, মৌলানা আজাদ সোবানী ও শেঠ যমুনালাল বাজাজ চলিয়াছেন।

তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আবার ২।৩ জন করিয়া অন্য লোক রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে বহুলোক সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। মহাত্মাজীর নিজের দলে যমুনাদাসজী ও আমি ভিন্ন আর একটী যুবক আছেন, তাঁহার নাম প্রভুদাস। এলাহাবাদে ইঁহাকে মহাত্মাজীর নিকট বসিয়া কাজ করিতে প্রথম দেখিয়াছিলাম। মধ্যে সাসারাম ইত্যাদি স্থানে ইঁনি সঙ্গে ছিলেন না, পাটনায় আসিয়া আবার মিলিত হইয়াছেন। মহাত্মাজীর শারীরিক সেবা করিবার ভার ইঁহার উপর ছিল। দার্জ্জিলিং মেলে প্রভুদাস ও আমি এক কামরায় বসিয়াছিলাম, তখন তাঁহার নিকট শুনিলাম, তিনি মহাত্মাজীর এক ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র। অল্প পরিচয়েই বুঝিলাম প্রভুদাসের প্রাণটা খুব খোলা। তিনি রেলওয়ে সম্বন্ধে কথা তুলিয়া ইহার দ্বারা দেশের কি কি অনিষ্ট হইতেছে তাহার বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। তিনি অধিকাংশই মহাত্মাজীর ইণ্ডিয়ান্ হোম্ রুল্ (Indian Home Rule) গ্রন্থের যুক্তিগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ইহার পর সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি লইয়া আমাদের উভয়ের বহু আলাপ হইল। তাহার ফলে প্রভুদাসের সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। আমরা এত লোক একসঙ্গে চলিয়াছি, ইহার মধ্যে আমি একা বাঙ্গালী। আমার পরিচিত লোক কেহ নাই, আমিও কাহারও পরিচিত নহি। তাহাতে প্রভুদাসের সহিত সহজেই ঐরূপ ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় আমি একজন প্রকৃত বন্ধু ও সঙ্গী পাইলাম।

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় আমরা সান্তাহার পৌঁছিয়া গাড়ী বদল করিয়া আসাম মেলে যাইয়া বসিলাম। লোকের ভিড় সর্ব্বত্রই সমান; কিন্তু এখানে ভিড় হইলেও গোলমাল অধিক নাই। আমি ও প্রভুদাস মহাত্মাজীর কামরার ঠিক পাশে একটী সার্ভেণ্টস্ (ভৃত্যদের) কামরা পাইয়া সেখানে বসিবার স্থান করিয়া লইলাম। মহাত্মাজীর সঙ্গে এক কামরায় শেঠ যমুনালালজী ও মৌলানা আজাদ সোবানী চলিয়াছেন। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে আমিও অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়াছিলাম। মহাত্মাজী তখন শুইয়া পড়িয়াছেন; আমাকে দেখিয়াই নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তাহার পর আমি কাছে যাইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ঊর্ম্মিলা দেবীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে কি না। আমি তাহাতে 'না' বলিলে যেন একটু আশ্চর্য্য হইলেন। তাহার পর খুব নিজজনের মত আমাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার বয়স কত, জন্মস্থান কোথায়, পিতামাতা আছেন কিনা, কোন্ কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছি, কি কি পুস্তক পড়িয়াছি এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কোন কলেজে পড়ি নাই শুনিয়া খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং কি প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহা জানিতে কৌতূহল দেখাইলেন। তখন আমি অল্প কথায় শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষা-প্রণালী বলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই সময় অন্যলোক আসিয়া কথায় ব্যাঘাত দিল, সেই জন্য আর আমার সহিত তিনি কথা কহিতে পারিলেন না।

পরদিন সকালে আমরা আসামের সীমায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে আসামের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বারদলই মহাত্মাজীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। যে ষ্টেশনে মেল ট্রেণ থামিতেছে, সেখানেই বহুলোক জড় হইয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই ষ্টেশন-ঘরের সম্মুখে তক্তপোষ পাতিয়া মঞ্চ করিয়া রাখা হইয়াছে। যেখানে বারদলই মহাশয় মহাত্মাজীকে নামিবার অনুরোধ করিতেছেন, তিনি সেখানেই নামিয়া লোকজনের সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করিতেছেন। তিনি নামিলেই সমগ্র জনতার লোক তাঁহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া 'ঐ', 'ঐ', শব্দ উচ্চারণ করিয়া উঠিতেছে। তাঁহাকে কেবল দেখিতেই লোকেরা ব্যস্ত। সেই জন্য অনেক স্থলে জনতাকে শান্ত করিতে না পারায় তিনি বক্তৃতা না দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমি সকাল হইতেই তাঁহার নিকট আছি। সকল সময় দেখি, তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত। মুখে কোন বৃথা বাক্য নাই, বা অপর কাহারও কথায় যোগ দেওয়া নাই। কাজ করিতে করিতে যখন পরিশ্রান্ত বোধ করিতেন, চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িতেন। আবার হয়ত হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া লিখিতে আরম্ভ করিতেন। ট্রেণে বহুদূর পথ আসিয়া এবং লোকজনের গোলমালে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তিনি ব্যতীত আর সকলেই একথা ওকথা লইয়া, বা বাহিরের দৃশ্য দেখিয়া সময় কাটাইতেছেন। কেবল তাঁহারই মুখে কোন কথা নাই, বা নিজের কাজ ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা আমিনগাঁও পৌঁছিলাম। এখানে ট্রেণ ছাড়িয়া ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হইতে হইবে। অপর পারে পাণ্ডু ষ্টেশন হইতে মোটারে করিয়া গৌহাটী যাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ষ্টীমারে উঠিয়াই মহাত্মাজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং অনেকগুলি 'সার্ভেণ্ট' কাগজ দিয়া তাহা হইতে এণ্ড্রুজ সাহেবের Four Letters on Non-Co-operation (অর্থাৎ অসহযোগ সম্পর্কে চারখানি পত্র) প্রবন্ধ কাটিয়া তাঁহাকে দিতে বলেন। ষ্টীমারে অত্যন্ত ভিড়, ট্রেণের সমস্ত লোক উহাতে উঠিয়াছে, কোথায়ও দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি মনে করিলাম, মহাত্মাজী তখনই প্রবন্ধগুলি পড়িতে চাহেন, তাই কোন প্রকারে এক স্থানে বসিয়া এক বোঝা 'সারভেণ্ট' হইতে অনেক খুঁজিয়া প্রবন্ধ চারিটী কাটিয়া লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তিনি উহা তখন পড়িবার আগ্রহ দেখাইলেন না। আমি যাইয়া দেখি চট্টগ্রামের এক ইউরেসিয়ান্-দম্পতি মহাত্মাজী ঐ ষ্টীমারে আছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, এবং মহাত্মাজী খুব মন খুলিয়া তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন; তাঁহাদের বাড়ী ঘর এবং সুখ-দুঃখের খবর লইতেছেন। তাঁহার ঐরূপ সৌজন্য দেখিয়া ইউরেসিয়ান্-দম্পতি একেবারে মুগ্ধ হইয়া প্রতি কথায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। সকাল হইতেই মহাত্মাজীকে দেখিয়াছি ধীর, স্থির ও গম্ভীর; সর্ব্বদাই তাঁহার মন যেন ভিতরে কি একটা বস্তুতে সংলগ্ন আছে, তাঁহার সমস্ত দৃষ্টি অন্তর্মুখী,

সেই জন্য বাহিরের আকৃতির দীপ্তি কতক ম্লান। কিন্তু এখন একেবারে অন্যরূপ। ‘এখন তিনি আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছেন এবং নিজের কথাবার্ত্তা ও হাসি দ্বারা সেই আনন্দের ছটা বাহির করিয়া চতুষ্পার্শ্বের জনপ্রাণীকে মুগ্ধ করিতেছেন।’

এদিকে মৌলানা মহম্মদ আলি সাহেব একটী ইংরাজ বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার নিকট এক গল্প করিতে বসিয়া গিয়াছেন। গল্পের সার মর্ম্ম এই যে, আজ কাল ভারতবর্ষে প্রকাণ্ড দেহ এবং অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতি দুই ভ্রাতা আছে, তাহারা ‘জ্যান্ত মানুষ’ খাইয়া ফেলে এবং ঐ বালিকার মত বালিকা পাইলে টপ্ করিয়া গিলিয়া ফেলে। তিনি নিজে সেই দুষ্ট ভ্রাতাদের এক ভ্রাতা, এই বলিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার রহস্য বুঝিতে পারিয়া বালিকা মুচ্‌কি হাসিয়া তিনি যে সত্য কথা বলিতেছেন না, তাহা আভাসে বলিয়া দিল। তখন মহম্মদ আলি সাহেব মহাত্মাজীকে বলিলেন, তিনি ট্রেণে অনেক পথ এক ইংরাজ মহিলার সহিত এক সঙ্গে আসিয়াছেন। সেই মহিলা “ইংলিশ-ম্যান” ইত্যাদি খবরের কাগজ পড়িয়া আলিভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে এক উদ্ভট ধারণা পোষণ করিতেছিলেন। পরে গাড়ীতে আলাপ-পরিচয়ের পর যখন জানিতে পারিলেন, তিনিই দুই ভ্রাতার এক ভ্রাতা, তখন একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার যে কিরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল, তাহা স্বীকার করিলেন। তাহার ফলে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ঘোর শত্রু

হইতে তখন মিত্র হইয়া পড়িয়াছেন। আমি মৌলানা সৌকৎ আলিকে দেখি নাই, কিন্তু মহম্মদ আলিসাহেবকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহার সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার কথাবার্ত্তা, প্রাণ-খোলা উচ্চ হাসি এবং তেজস্বিতা এ সমস্ত তাঁহারই অনুরূপ।

ষ্টীমার যখন পাণ্ডু আসিয়া পৌঁছিল, তখন সেখানকার জনতা দেখিয়া আমি পাছে পিছনে পড়িয়া থাকি এই ভয় হইল। কারণ আমাদের সঙ্গের গুজরাটী, মারাঠা, মাড়োয়ারী বা মুসলমান সকলেরই পোষাক বা টুপি দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায়। আমি বাঙ্গালী, আমার আসামীদের মতই নগ্নশির, এবং পোষাকেরও অন্য কিছু বিশেষত্ব নাই। সেইজন্য আমি যে মহাত্মাজীর সঙ্গে চলিয়াছি ইহা লোকের পক্ষে ধারণা করা কঠিন হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া আমি প্রথমেই প্রভুদাসের সঙ্গে মহাত্মাজীর জন্য নির্দ্দিষ্ট মোটারে গিয়া চড়িয়া বসিলাম। গৌহাটী হইতে বহুলোক এইস্থানে মহাত্মাজীকে অভ্যর্থণা করিয়া লইতে আসিয়াছে। আসামের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন্ মহাত্মাজীর সহিত এই মোটারে চলিয়াছেন। কিন্তু কিছু দূর যাইয়াই হঠাৎ মোটারের কল বেমেরামৎ হইয়া পড়িল। তখন মহাত্মাজী ও ফুকন্ মহাশয় পিছনের যে মোটারে মহম্মদ আলি সাহেব আসিতেছিলেন, তাহাতে চলিয়া গেলেন। কেবল আমি ও প্রভুদাস পড়িয়া রহিলাম, এবং অতি কষ্টে সকলের পিছনে আমরা গৌহাটী যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

সপ্তম অধ্যায়

গৌহাটী

গৌহাটীতে মহাত্মাজী শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন্ মহাশয়ের আবাসে অবস্থান করিয়াছিলেন। বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড খোলা মাঠ, তাহাতে পঞ্চাশ হাজার লোকের সভা বসিতে পারে। মাঠের পর সরকারী রাস্তা; রাস্তার পরেই ব্রহ্মপুত্র নদ। মাঠের চারিদিক বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে, যেন লোকের জনতা আসিয়া মহাত্মাজীকে কষ্ট দিতে না পারে। বেড়ার মধ্যে মধ্যে তোরণ রাখা হইয়াছে, সেখানে স্বেচ্ছাসেবকদিগের পাহারা দিবারাত্রি চলিয়াছে। ইহাতে বাহিরের লোক আসিতে পারিতেছে না সত্য, কিন্তু আসামের চতুর্দ্দিক হইতে যে সমস্ত উদ্যোগী লোক মহাত্মাজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সহরে লইয়া যাইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারাই একটি ক্ষুদ্র জনতা সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্য এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম বা শান্তি নাই। সর্ব্বদা এত গোলমাল যে মাথা খারাপ হইয়া যাইবার কথা। একদিকে পথশ্রমের ক্লান্তি, তাহার উপর এইরূপ গোলমাল কতদিন সহ্য করিতে পারিব তাহাই ভাবিতেছি।

সন্ধ্যার সময় সম্মুখের ময়দানে জনসাধারণের এক সভা হইল।

মনে হইল প্রায় পঁচিশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। মহাত্মাজীর আবাস-গৃহের অল্প দক্ষিণ পার্শ্বে নেতাদিগের জন্য সভায় বসিবার মঞ্চ করা হইয়াছিল। আমি কেবল মহাত্মাজীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য কিছুক্ষণ সেখানে গিয়া বসিয়াছিলাম। তাহার পর আমি ঘরে বসিয়াই সভার কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। ফুকন্ সাহেব মহাত্মাজীর বক্তৃতা আসামী ভাষায় অনুবাদ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বক্ষণে রাত্রি ৯ টার সময় মহাত্মাজী দ্বিতীয়বার সমগ্র জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—নিমন্ত্রণ করিয়া এত দূরদেশে তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছেন কেন? তাঁহারা কি কেবল বক্তৃতা শুনিয়াই ঘরে ফিরিয়া যাইবেন? না পাঞ্জাবের অত্যাচার, খিলাফৎ এবং ভারতে স্বরাজ স্থাপনের জন্য তিনি অন্তরে যে জ্বালা ভোগ করিতেছেন, তন্নিবারণের জন্য কিছু সহায়তা করিবেন? যদি কেবল বক্তৃতা শুনিতে তাঁহারা আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি হাত জোড় করিয়া মিনতি করিলেন, আর কষ্ট না দিয়া, সকলেই যেন তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেন।—এই কথা যখন ফুকন্ সাহেব আসামী ভাষায় সকল লোককে বুঝাইয়া দিলেন, তখন এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল। প্রায় এক মিনিট কাল সভাস্থল একেবারে শান্ত ও নীরব হইয়া গেল; সকল লোকের চিত্ত যেন একটা বিষয়ে একাগ্র হইয়া মনোরাজ্যে এক অপরূপ সাম্যের সৃষ্টি করিল। নদীতে ভাটার উপর যখন প্রথম জোয়ার আসে তখন কিছুক্ষণ কোনদিকে স্রোতের গতি থাকে না; নদী

তখন একেবারে শান্ত হইয়া যায়। কিন্তু তাহার পরেই হুঙ্কার করিয়া জোয়ারের জল সমস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া ছুটিতে থাকে। সভাস্থলে ঐ দৃশ্যও অনেকটা সেইরূপ হইল। মহাত্মাজীর অনুরোধ যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তখন সমগ্র জনতা প্রথমে একটু স্তব্ধ হইয়া পরক্ষণেই একেবারে হুঙ্কার, গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠি-লেন—"না, না, আপনাকে কখনই আমরা এ ভাবে ফিরিয়া যাইতে দিব না।" তখন মহাত্মাজী বলিলেন,—তাঁহাদের উৎসাহ কতটা সাঁচ্চা তিনি পরীক্ষা করিয়া লইবেন। যদি সত্যই তাঁহারা স্বরাজ চাহেন, এবং তাঁহাকে আসামের অন্যান্য স্থানে লইয়া যাইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করিয়া তিনি যে অগ্নি জ্বালিতেছেন তাহাতে উহা সমস্ত নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি মঞ্চের সম্মুখে স্তূপীকৃত বিলাতী বস্ত্রে অগ্নি প্রদান করিলেন। তখন জনতার মধ্যে যেন একটা মাদকতা আসিয়া গেল, এবং চারিদিক হইতে সেই অগ্নিকুণ্ডে রাশি রাশি বস্ত্র-বৃষ্টি হইতে লাগিল। কোন কোন লোক চাদর বা গামছা পরিয়া পরিধানের বস্ত্র অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। সেই স্বর্গীয় উৎসাহের বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই। এত বস্ত্র এই যজ্ঞে আহুতি পড়িল যে, পরদিনের সকাল অবধিও যজ্ঞের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই।

রাত্রিতে মহাত্মাজীর নিকটেই একটী আরাম কেদারায় শুইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। মহাত্মাজী তাঁহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় শুইয়াছিলেন। একজন স্বেচ্ছাসেবক রাত্রি জাগিয়া

সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট পাহারা দিয়াছিলেন। আসামের স্বেচ্ছা-সেবকদিগকে বড় ভাল লাগিল। তাঁহাদিগের যেমন সেবার ভাব তদ্রূপ আনুগত্য এবং পরিশ্রমের ক্ষমতা। এখানে আসিয়া অবধি নিজেদের জন্য আমাদিগকে আদৌ চিন্তা করিতে হয় নাই। যাহাতে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয় সর্ব্বদা তাহাদের সেই দৃষ্টি। এই যুবকবৃন্দের সেবা-প্রবণতা, চরিত্রের মাধুর্য্য ও কর্ম্মপটুতা দেখিয়া আসামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের মনে খুব আশার সঞ্চার হইল।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া মহাত্মাজীকে একটু একেলা পাইয়া তিনি যে সারভেণ্টের কাগজগুলি হইতে এণ্ড্রুজ সাহেবের চারিটী প্রবন্ধ বাছিয়া দিতে বলিয়াছিলেন তাহা দিলাম এবং তৎসঙ্গে উহাতে কি কি কথা লেখা আছে তাহার সারাংশ বলিয়া দিলাম। আমার বলা শেষ হইলে তিনি কেবল একটু ঘাড় নাড়িলেন। তিনি সর্ব্বদা এত লোকজনে পরিবৃত থাকেন যে, ইহার মধ্যে সামান্য একটু সময় পাইলে নিজের লেখা পড়া লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। এত গোলমালের ভিতর তিনি যে কিরূপে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া যাইতেছেন তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। সাধারণ লোক এরূপ অবস্থায় পাগল হইয়া যায়। এরূপ পরিশ্রমের পর যখন একটু একেলা থাকেন, তখন পাছে তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে সেই ভয়ে আমি আর নিকটে যাই না। সেইজন্য কাল ঐ প্রবন্ধগুলি দেই নাই; তিনি নিজেও তাহা চাহেন নাই। আমার মনে হয় তিনি আদেশ প্রদানের পর তাহা

প্রতিপালিত হইল কি না, সে বিষয়ে আর পীড়াপীড়ি করেন না। তাহাতে কাজটা সহজেই হয় কি না তাহা লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় তিনি লোকের দায়িত্বজ্ঞান পরীক্ষা করেন। সকালে দুই-একবার দেখিয়াছি, আমি তাঁহার সাসারামের বক্তৃতার যে বিবরণ লিখিয়া দিয়াছিলাম তাহা পড়িতেছিলেন; কিন্তু বোধ হয় শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কারণ ২।৪ লাইন পড়া হইলেই এক একজন লোক আসিয়া ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। সকাল হইতে তিনি মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের সভা, আসামী স্ত্রীলোকদের সভা, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদেব সভা—এই সমস্ত সভায় উপস্থিত হইতে ৩।৪ বার বাহিরে গিয়াছিলেন। প্র'ফেসরজী বলিয়াছিলেন, আমি যেন তাঁহার সঙ্গে প্রত্যেক সভাতে উপস্থিত হই। কিন্তু দেখিলাম তাহা সম্ভব নহে। তিনি প্রয়োজন বোধ করিয়া আমাকে যদি ডাকিয়া ল'ন তাহা হইলে অন্য কথা।

গৌহাটি অবস্থানের দ্বিতীয় দিন বৈকালে আবার সম্মুখের ময়দানে এক বিরাট সভা হইল। সভায় বক্তৃতা দিয়াই মহাত্মাজী আহারের জন্য ঘরে আসিলেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তিনি আহার করেন। কিন্তু ঘরে তখন যমুনাদাস বা প্রভুদাস কেহই ছিলেন না, সেই জন্য তিনি আমাকে ডাকিয়া আহারের আয়োজন করিতে বলিলেন। আহারান্তে, রাত্রিতে স্নানের জন্য গরম জল ইত্যাদি ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়া তিনি বাহিরে কোথায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, আজ যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার যেন একটা রিপোর্ট লিখিয়া তাঁহাকে দেই। আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, রিপোর্ট কি খুব বিস্তৃত হইবে? তাহাতে উত্তর করিলেন—"অল্পেতেই লিখিতে পার, কিন্তু তাহাতে সমস্ত কথা ও ভাব আসিয়া যাওয়া চাই।"

তাঁহার "হিন্দ্ স্বরাজ" বা Indian Home Rule গ্রন্থে ভারতের ভীল, পিণ্ডারি, ঠগী ইত্যাদি অসভ্য জাতি ও দস্যু সম্প্রদায়ের সহিত আসামীদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আসামের শিক্ষিত লোকেরা পত্র লিখিয়া যে দুঃখ জানাইয়াছেন, এই বক্তৃতায় তিনি তাহার উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন,—ঐ পুস্তক ১৯০৮ সনে তাঁহার বিলাতে অবস্থান কালে লিখিত হইয়াছিল; তখন অবধি আসামের কোন অধিবাসীকে তিনি দেখেন নাই, বা আসামের বিষয় সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কিছুই তিনি জানিতেন না। দুই এক খানা ইংরাজি গ্রন্থে তিনি আসামের বিষয় যেরূপ পড়িয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, আসামে সভ্যতার বিকাশ হয় নাই। কিন্তু এখানে আসিয়া তাঁহার সে ধারণা নষ্ট হইয়াছে। আসামীদের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কিছুই লিখেন নাই। ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন যে, ভারতের অসভ্য জাতিসমূহকে তাঁহারাই সভ্য করিবেন; সে কথার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া, নিজের সাক্ষাৎ জ্ঞানের অভাবে, ইংরাজদিগেরই কথার প্রতিধ্বনি-স্বরূপ তিনি আসামীদের নাম ঐভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

তাঁহার এই জবাব-দিহির পর ঐ বিষয়ে আর কোন সমালোচনা হয় নাই। কিন্তু গৌহাটি ত্যাগের দিন সকালে

আসামীসভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ বহুবিধ পুরাতন জিনিষ প্রদর্শনের জন্য মহাত্মাজীর নিকট আনীত হইল। একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আসামী ভাষায় অনেক পুরাতন পুঁথি দেখাইলেন। তাহাতে হস্তিবিদ্যা-সম্বন্ধীয় একখানা অতি সুন্দর ও অদ্ভুত পুঁথি ছিল। হস্তীর বহুবিধ শ্রেণীবিভাগ করিয়া এক এক শ্রেণীর বর্ণনাস্থানে চিত্র অঙ্কিত করিয়া উহার বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এত সূক্ষ্মভাবে বিষয়টির বিশ্লেষণ ও বিচার করা হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আসামী ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদের পূর্ব্বে হইয়াছিল। সেই অনুবাদ-গ্রন্থও প্রদর্শিত হইল। তাহার পর বহু পুরাতন বস্ত্র আনিয়া আসামের পুরাতন বস্ত্রশিল্পের নৈপুণ্য দেখান হইল। শতাধিক বর্ষের পুরাতন বস্ত্রও এপর্য্যন্ত এমন সুন্দর ভাবে রক্ষিত রহিয়াছে যে, দেখিলে নূতন বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার পর আসামের প্রসিদ্ধ এণ্ডি-মুগা বস্ত্রের সূতা প্রস্তুত প্রণালী মহাত্মাজীকে দেখান হইল। আসামের ঘরে ঘরে বস্ত্র-বয়নের জন্য তাঁত আছে, স্ত্রীলোকেরা সকলেই তাঁতের কার্য্যে নিপুণা। বস্ত্র বুনিতে না জানিলে আসামে বালিকাদের বিবাহ হয় না। ব্যারিষ্টার ফুকন্ সাহেবের ঘরেও দুইটি তাঁত দেখিলাম, একটি ছোট বালিকা তাহাতে কাজ করিয়া মহাত্মাজীকে দেখাইল। এই সমস্ত দেখিয়া আসামের সভ্যতা যেমন ভাল বুঝা গেল, কেবল কথাদ্বারা এমন কিছুতেই হইত না। সেইজন্য আসামের নেতৃবর্গ নিজেদের সভ্যতার দাবি কথায় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস

না পাইয়া, এই সকল চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা অতি সহজেই আসামের প্রতি মহাত্মাজীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন।

আসামের সহিত পূর্ব্ব-বাঙ্গালার অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। আসামের জমি, ফসল, সুবিস্তৃত নদ-নদী এবং লোকের চাল-চলন ও ব্যবহার অনেকটা পূর্ব্ববঙ্গের মত বলিয়া আমার মনে হইল। আসামের ভাষা আজ কাল একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া গণ্য হইতেছে এবং এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায় সকল বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যাহা নিজের জিনিষ তাহার প্রতি মর্য্যাদা ও হৃদয়ের আন্তরিকতা প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কথিত ভাষার সহিত অনেক বিষয়ে আসামী ভাষার মিল আছে বলিয়া আমার মনে হইল। আসামী লিপি এবং বাঙ্গালা লিপির মধ্যে পার্থক্য নগণ্য। পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদিগের যাহা ভক্ষ্য বস্তু, এবং যে পদ্ধতিতে তাহা প্রস্তুত হয়, আসামেও অন্ততঃ গৌহাটির অভিজ্ঞতা হইতে সেইরূপ দেখিলাম।

অষ্টম অধ্যায়

তেজপুর

২০শে অগাষ্ট বেলা ২টার সময় ষ্টীমারে গৌহাটি ত্যাগ করিয়া ২১শে তারিখ সকালে মহাত্মাজী তেজপুর আসিয়া পৌঁছিলেন। ২০শে তারিখের রাত্রি তাঁহাকে ষ্টীমারেই যাপন করিতে হইয়াছিল। ষ্টীমার হইতে সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া সকলের হৃদয় মন মুগ্ধ হইতেছিল। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্যামল পর্ব্বতমালা, তাহার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রের জলপ্রবাহ যেন শ্বেত বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় এক অজ্ঞাত দেবতার দেহ পরিবেষ্টন করিয়া দূরে, বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। নদীর মধ্যে স্থানে স্থানে এক একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বীপের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। গৌহাটির নিকটে তাহার দুই একটি শৃঙ্গ দেখাইয়া এক আসামী বন্ধু আমাকে বলিলেন যে, বহু বিদেশী পর্য্যটক সুইট্‌জারলণ্ডের অনেক জগদ্বিখ্যাত দৃশ্য অপেক্ষা ঐ সমস্ত দৃশ্যের প্রাধান্য দিয়া থাকেন। যেই দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, সেই দিকের শ্যামল শোভাতে নয়ন স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ষ্টীমারে আমরা বহুলোক। আমরা যত জন কলিকাতা হইতে আসিয়াছি, তদপেক্ষা অধিক লোক গৌহাটি হইতে মহাত্মাজীর সঙ্গে চলিয়াছেন। আমি মহাত্মাজীর গৌহাটির বক্তৃতাটি লিখিয়া উঠিতে পারি নাই, সে জন্য ষ্টীমারের পশ্চাদ্ভাগে এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কিছু লিখিবার চেষ্টা

করিলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ নির্জ্জনে থাকিতে পারিলাম না। একে মহাত্মাজীর সঙ্গে চলিয়াছি, তাহার উপর ষ্টীমারে বসিয়া লেখাপড়ার উদ্যোগ করিতেছি, ইহাতেই সাধারণ লোকের কৌতূহল জন্মিতেছে, এবং যেখানে যাইয়া বসি, সেখানে আসিয়াই তাঁহারা আমাকে পরিবেষ্টন করিতেছেন। এরূপে কিছুই কাজ হয় না দেখিয়া বাধ্য হইয়া সমস্ত কাজ বন্ধ করিলাম। সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ মহাত্মাজীর নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহাকে একটু প্রফুল্লভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিলাম। দেখিলাম, তিনি আজ চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রভায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বদা কর্ম্মের প্রতি ঐকাগ্র্যজনিত কঠোর দৃষ্টি ও গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া সহজ ভাব ধারণ করিয়াছেন।

সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর দেখি, ঘন কুয়াসায় চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে কোন দিকের কোন জিনিষ দেখা যাইতেছিল না। ষ্টীমারের চালকগণ পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিল যে তেজপুর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেজন্য পাছে গন্তব্যস্থান লঙ্ঘন করিয়া অধিক দূরে চলিয়া যায়, সেই ভয়ে ষ্টীমারের গতিরোধ করিয়া দিল। এইরূপে অন্ধের মত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা তেজপুর ঘাটে পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইতেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই ঘনঘটা ও বৃষ্টির প্রকোপ বিলীন হইয়া গেল। ষ্টেশন হইতে যখন আমরা আবাসস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন মেঘ-বৃষ্টি সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

বাসায় পৌঁছিয়া কিছু বিশ্রামের পর মহাত্মাজী আমাকে তাঁহার লিখিত কয়েকখানা ইংরাজি চিঠি নকল করিতে দিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর বুঝিতে না পারিয়া দুই স্থানে দুইটা শব্দ লিখিতে ভুল করিয়াছিলাম; তাহা তিনি দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার হাতের লেখা পড়িতে কিছুদিনের অভ্যাস দরকার। গৌহাটির বক্তৃতাটি এখনও শেষ করিয়া তাঁহাকে দিতে পারি নাই। লেখা যেন মোটেই স্বাভাবিকভাবে বাহির হইতেছে না। চারিদিকে যেরূপ গোলমাল, তাহার মধ্যে মনঃসংযম করিয়া চিন্তার কাজ করা আমার পক্ষে বড়ই মুস্কিল বোধ হইতে লাগিল। অনবরত লোকজনের যাতায়াতে ও কথাবার্ত্তায় চিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইতে-ছিল। গৌহাটির বক্তৃতাটি লিখিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া আজ তেজপুরের সভাতে উপস্থিত হই নাই; কারণ ভয় হইল, এখানে যাহা শুনিব তাহা পূর্ব্বের কথার সহিত মিশিয়া গিয়া খিচুড়ি পাকাইয়া যাইবে। সভায় যাইবার পূর্ব্বে মহাত্মাজী আসামের চা-বাগান দেখিবার জন্য সহর হইতে কিছু দূরে একটি বাগানে মোটারে চলিয়া গিয়াছিলেন। তেজপুরের সভা খুব জম্‌কাল হইয়াছিল বলিয়া শুনিলাম। মহাত্মাজীর বক্তৃতা বিশেষ গম্ভীর ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। ফুকন্ সাহেব যেরূপ কৃতিত্বের সহিত ঐ বক্তৃতার অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার তারিফ লোকের মুখে শুনিতে লাগিলাম। বাস্তবিক ফুকন্ সাহেবের অদ্ভুত ক্ষমতা। মহাত্মাজীর বক্তৃতা শেষ হইলেই তিনি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহা আসামী ভাষায় হুবহু মূলের

অনুরূপ অনুবাদ করিয়া দেন। তিনি যেন ইহাতে তন্ময় হইয়া যান। তাহাতেই মহাত্মাজীর যুক্তি ঠিক একটির পর একটি রক্ষা করিয়া বলিয়া যাইতে পারেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আসল বক্তৃতার একটি কথাও অনুবাদে বাদ পড়ে না। এমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যেখানে যেমন জোর দেওয়া দরকার তাহা দিয়া, ফুকন্ সাহেব ঐ অনুবাদ করিয়া যান যে, উহা অনুবাদ মনে না হইয়া তাঁহার স্বাধীন বক্তৃতা বলিয়াই তখন মনে হয়। অথচ ইহার মধ্যে একটিও তাঁহার নিজের কথা থাকে না।

সাধারণ সভার পর আরও দুই একটি ছোট ছোট সাম্প্রদায়িক সভার কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রি হইতে মহাত্মাজী মৌন অবলম্বন করিলেন। আগামী কল্য সোমবার তাঁহার মৌনবার। রবিবার রাত্রি হইতে মৌন আরম্ভ হয়, এবং সোমবার রাত্রিতে তাহা ভঙ্গ করিয়া ঠিক ২৪ ঘণ্টা তিনি মৌন রক্ষা করেন। ঐ দিন তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন না, বা বাহিরের কোন কাজকর্ম্ম করেন না এবং যথাসম্ভব কোথায়ও যাতায়াতও করেন না। কাজের মধ্যে দেখিয়াছি, কখনও 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'র বা 'নবজীবনে'র জন্য প্রবন্ধাদি লেখেন, কখনও বা পত্রাদির জবাব দিয়া থাকেন। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, বা কিছু বলিতে হইলে, তাহা লিখিয়া জানান। কাহাকেও ডাকিতে হইলে হাতের পেন্সিল দিয়া পিক্‌দানিতে আঘাত করেন, সেই শব্দ শুনিয়া আমরা দৌড়িয়া নিকটে যাই। অনেক সময় দেখিয়াছি, কোন কিছু না করিয়া চুপ্ করিয়া শুইয়া থাকিতেন।

তাঁহাকে প্রচলিতভাবে প্রার্থনা করিতে কখনও দেখি নাই; তথাপি আমার মনে হয়, সোমবার দিন যথাসম্ভব তিনি হৃদয়ে প্রার্থনার ভাব ধারণ করিয়াই কাটাইয়া থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত এ দিন বাহিরের কোন লোককে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয় না, এবং সঙ্গে যাঁহারা চলেন, তাঁহারাও ঐদিন যথাসম্ভব সংযত থাকিয়া মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহার মৌনের মর্য্যাদা দিয়া থাকেন। তাহাতেই প্রত্যেক সোমবারে গোলমালের অভাবে শান্তিতে থাকা যায়।

সোমবারে এইরূপ কিঞ্চিৎ সুবিধা পাইয়া গৌহাটির বক্তৃতা লেখা শেষ করিয়া ফেলিলাম। আমি সাময়িক পত্রিকার রিপোর্টের মত ছোট রিপোর্ট লিখিতে পারি না; বক্তৃতার সমস্ত কথা রাখিতে গিয়া লেখা খুব বড় হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় মৌন-ভঙ্গ হইলে মহাত্মাজীকে রিপোর্টটি দিলাম। তিনি তাহা পাইয়া একটু প্রসন্ন হইলেন এবং বলিয়া দিলেন, "ইয়াং ইণ্ডিয়া"র জন্য যে সমস্ত প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া পাঠান, তাহা যেন আমি ডাকে দিবার পূর্ব্বে পড়িয়া লই। আজ জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে দুই 'কলাম' এক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন বলিলেন। ছাপার অক্ষরে পড়া অপেক্ষা, হাতের লেখা হইতে পড়িলে প্রবন্ধের ভাব অধিক আয়ত্ত হইবে, ইহা তিনি বলিয়া দিলেন। তদ্‌ভিন্ন, এইরূপে আমি তাঁহার হস্তাক্ষরের সহিত সুপরিচিত হইতে পারিব। গৌহাটির বক্তৃতা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া আমি তেজপুরের সভায় উপস্থিত হই নাই বলিলাম; তাহাতে

তিনি উত্তর দিলেন যে, ঐরূপ করা ঠিক হইবে না। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাগুলিই আমার শুনা দরকার, কারণ তিনি স্বতন্ত্র-ভাবে কাহাকেও শিক্ষা দিবার সময় পান না। তাঁহার যাহা হৃদয়ের ভাব তাহা বক্তৃতাতেই তিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহা শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ আমি তাঁহার চিন্তা-প্রণালীর সহিত পরিচিত হইব, এবং তাঁহার ভাবগুলি অধিগত হইয়া যাইবে। বক্তৃতাগুলি শুনিয়া তাহা লিখিবার চেষ্টাও দরকার বলিলেন, তাহাতে দ্রুত রচনাশক্তিও লাভ হইবে।

নবম অধ্যায়

নওগাঁও

২২শে অগাষ্ট রাত্রি প্রায় ১০টার সময় তেজপুর ঘাটে আসিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। তেজপুর হইতে ষ্টীমারে কিছুদূর যাইতে হইবে; তাহার পর ট্রেণে চড়িয়া ২৩শে তারিখ সকালে নওগাঁও পৌঁছিব। মহাত্মাজীর জন্য তেজপুর হইতে যাইবার স্পেশ্যাল ষ্টীমার করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও দুই তিন জন পুলিশের গোয়েন্দা আসিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। মহম্মদ আলী সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং তাহাদিগকে অপমান করিয়া নামাইয়া দিতে বলিলেন। বেচারা গোয়েন্দারা ভয়ে জড়সড় হইয়া ষ্টীমারের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারে লুকাইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে কি করা হইবে ভলান্টিয়ারেরা আসিয়া ফুকন্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল। ফুকন্ সাহেবের খোলা প্রাণ, তিনি বেচারাদের অবস্থা শুনিয়া, একটু আশ্বাসের হাসি হাসিয়া তাহাদিগকে ষ্টীমারে থাকিতে অনুমতি দিলেন। মহাত্মাজীর জন্য বিছানা উপরের 'ডেকে' করা হইয়াছে। আমি একবার সেখানে যাইয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া নীচের 'ডেকে' আসিয়া একটি বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলাম। একটু পরে প্রভুদাসও সেখানে আসিয়া বসিল। প্রভুদাসের মুখে শুনিলাম, মহাত্মাজী আমার বিষয় আলাপ করিতেছিলেন। আমি তখন

উপরে ছিলাম, গুজরাতীতে কথা হইতেছিল বলিয়া কিছু বুঝিতে পারি নাই। তিনি আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন প্রভুদাস তাহা ব্যক্ত করিল না। কেবল ইহাই বলিল যে, আমার আহার সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে প্রভুদাসকে তিনি বলিয়া দিয়াছেন।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর ব্রহ্মপুত্রের সুশীতল বাতাস উপভোগ করিতে করিতে অল্পক্ষণেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। ইহার ভিতর কখন ষ্টীমার ছাড়িয়াছে, আবার কখন আসিয়া কূলে লাগিয়াছে, কিছুই আমার জ্ঞান নাই। শেঠ যমুনালালজীর সেক্রেটারী বন্ধুবর হিরোয়ে এই সময় আমাকে জাগাইয়া তীরে লইয়া আসিলেন। তখন দেখি, তেজপুর ছাড়িয়া কোথায় এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। রাত্রি তখন ৩টা। গভীর নিশার নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে। নিকটে কোথায়ও লোকের বসতি আছে বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু এই বিজন অরণ্যেও মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার ক্রটী নাই। নদীর চড়াতে বহুদূর পর্য্যন্ত কদলীবৃক্ষের সারি দিয়া প্রত্যেক বৃক্ষে ৩।৪টি করিয়া প্রদীপ একটির পর একটি বসাইয়া অতি সুন্দর দীপাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে। শুনিলাম, সন্ধ্যারাত্রিতে বহুলোক এখানে জড় হইয়াছিল। একটু দূরে দুই তিন সারি বহুদূরব্যাপী বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় কি পড়িয়া রহিয়াছে, জ্যোৎস্নালোকে দেখা যাইতে লাগিল। হিরোয়ে বলিলেন, দূরস্থিত গ্রাম হইতে যে সমস্ত লোক এই অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, তাহারাই একত্রিতভাবে ঐরূপে নিদ্রা যাই-তেছে। ধন্য তাহাদের আগ্রহ, ধন্য তাহাদের সহিষ্ণুতা! আমরা

যদি রাত্রির প্রথমভাগে এখানে আসিতাম, তাহা হইলে লোকের সংঘট্ট ও জয়ধ্বনির দ্বারা মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা হইত। সেরূপ অভ্যর্থনা সকল স্থানেই দেখিয়াছি। কিন্তু সেই দীপাবলীমণ্ডিত গভীর রজনীর নিস্তব্ধ জনশূন্য অভ্যর্থনার গাম্ভীর্য্য কখনও বিস্মৃত হইবার নহে। ষ্টীমারঘাট হইতে ট্রেণে চড়িতে হইলে কিছু দূর চলিয়া যাইতে হয়। আমরা ৪।৫ জন প্রথমেই ট্রেণে যাইয়া কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইব স্থির করিয়া এক বিজন পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। বন্ধুবর হিরোয়ে উজ্জয়িনীবাসী মারাঠী এবং স্বভাবতঃই সাহসী; তিনি সুদূর আসাম-প্রান্তের সেই গভীর নিশার নীরবতায় কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া প্রাণ ভরিয়া তাহা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রাতে নওগাঁও আসিয়া এতদিন আমরা আসাম ভ্রমণে যাহা দেখি নাই, সেই আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। এখানকার ডেপুটি কমিশনার সাহেব শান্তির বিগ্রহ মহাত্মাজীর আগমনে দাঙ্গা ফেসাদের স্বপ্ন দেখিয়া তাহার প্রতিকারকল্পে বিস্তর আয়োজন করিয়াছেন। ষ্টেশনে নামিয়াই বহু পুলিশ সিপাহি দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম, রাস্তায় যাহাতে অধিক লোক একসঙ্গে যাইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে বাঁশ পুঁতিয়া বেড়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে গাড়ী ঘোড়ার কোন বন্দোবস্ত নাই; কেবল মহাত্মাজী ও মহম্মদ আলী সাহেবকে সহরের মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি টঙ্গার যোগাড় হইয়াছে। আমরা বাকি সকলে ‘প্র’সেশনের’ সঙ্গে না

গিয়া সোজা পথে পায় হাঁটিয়া প্রায় দেড় মাইল দূরে আমাদের নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গত রাত্রিতে দুই ঘণ্টার অধিক কাহারও নিদ্রা হয় নাই, সেজন্য সকলেই আমরা অল্পবিস্তর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। স্নানাহারের পর মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদিগের সভা মহাত্মাজীর আবাসস্থলেই হইল। তাহার পর স্ত্রীলোকদিগের সভায় মহাত্মাজী চলিয়া গিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি সাধারণ সভায় যাইবেন। এই সভার জন্য যে স্থান পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়া সভার মঞ্চ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল, সর্ব্ব-সাধারণের স্থান বলিয়া তাহা ডেপুটি কমিশনার সাহেব গত রাত্রিতে দখল করিয়া লইয়াছেন। সেজন্য রাত্রিতেই এক নূতন স্থান নির্ব্বাচন এবং তাহা পরিষ্কার করিয়া নূতন মঞ্চ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বহস্তে ঐ স্থানের আবর্জ্জনা পরিষ্কার এবং মঞ্চ তৈয়ার করিয়া তাঁহাদের উৎসাহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সভাতে প্রথম মহম্মদ আলী সাহেবের বক্তৃতা হয়। তিনি তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় ভারতের সকল প্রকার দুরবস্থা বর্ণনা এবং তাহা দূর করিবার জন্য স্বরাজের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া স্বরাজ লাভ এবং রক্ষা করিতে হইলে হিন্দু-মুসলমানের একতার প্রয়োজনীয়তা ভালরূপ বুঝাইয়া দিলেন। মৌলানা সাহেবের সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর মহাত্মাজী বলিলেন,—তিনি অল্প কথায় তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিবেন, তাহার পর নওগাঁওএর অধিবাসীরা যে সমস্ত বিলাতী বস্ত্র জড় পুঞ্জ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে অগ্নি-

সংযোগ করিবেন। ভারতের যে যে সহর হইয়া তিনি আসিয়াছেন, প্রত্যেক সহরে তিনি এই যজ্ঞ করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এই যজ্ঞদ্বারা ভারতশক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে। তিনি ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, কেবল আত্মশক্তি বা মনোবলের অভাবে ভারত আজ পরাধীন এবং সেই শক্তির বিকাশ হইলে একদিকে যেরূপ স্বরাজ লাভ হইবে, সেইরূপ পাঞ্জাব ও খিলাফত অত্যাচারেরও প্রতিকার হইবে। অদ্যকার 'ইংলিশ-ম্যান' সংবাদপত্রে ডাক্তার পোলেন মহাত্মাজীর নামে এক প্রকাশ্য চিঠিতে একটা খুব খাঁটি কথা লিখিয়াছেন, এই কথা মহাত্মাজী বলিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, গান্ধীজী বৃটিশ্ গবর্ণমেণ্টকে "শয়তানী গবর্ণমেণ্ট" বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু তাঁহার বুঝা উচিত, শয়তান কেবল শয়তানীভাবাপন্ন লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। অতএব বৃটিশ্ গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়া গান্ধীজী তাঁহার দেশবাসীরই নিন্দা করিয়াছেন। এই সমালোচনা খুব সত্য, মহাত্মাজী স্বীকার করিলেন, এবং সেজন্যই তিনি আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এত করিয়া দেশবাসীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই আত্মশুদ্ধির জন্য হিন্দুমুসলমানের একতা, স্বদেশী ও অহিংসা, এই তিন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। মহাত্মাজী আরও বলিলেন, ত্যাগের ন্যায় হৃদয়-মনের সংশোধক আর কিছুই নাই। স্বদেশী ধর্ম্মের প্রতিপালন করিতে যাইয়া বিদেশী বস্ত্র ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে খুব আত্মশুদ্ধি হইবে। তাহার পর বস্ত্রের জন্য অপরের মুখাপেক্ষা না করিয়া সকলকে চরকা ও

তাঁতের ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। যদি ৩০শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে অক্টোবর মাসে স্বরাজলাভ অসম্ভব নহে। আর যদি ইহাতে ভারতবর্ষ অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবেন যে, এখনও স্বরাজের জন্য ভারতবর্ষ উপযুক্ত হয় নাই।

সভাভঙ্গের পর বাটী ফিরিবার পথে দেখি লম্বা লম্বা লাঠি হাতে পুলিশ ফৌজ রাস্তা অবরোধ করিয়া রহিয়াছে এবং একসঙ্গে বহুলোক যাইতে বাধা দিতেছে। কোনরূপে সভা বন্ধ করিতে না পারিয়া ডেপুটি কমিশনার সাহেব অবশেষে দুইজন স্থানীয় নেতার নামে শান্তি রক্ষা এবং 'প্র'সেশন' বন্ধ রাখিবার জন্য নোটিশ জারি করিয়াছেন। কিন্তু সাহেবের যুদ্ধের আহ্বান সর্ব্বপ্রকারে উপেক্ষা করিয়া নেতারা সকলকে দলশূন্য হইয়া শান্তিতে ঘরে যাইতে উপদেশ দিলেন। সভা হইতে ফিরিয়া আমরা তখনই ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম। কমিশনার সাহেবের নোটিশের ফলে ষ্টেশনে অধিক লোক উপস্থিত হইতে পারিল না। তাহাতে আমরা শান্তিতে নওগাঁও ত্যাগ করিতে পারিলাম। ইহাতে আমাদের মধ্যে কোন কোন রহস্যপ্রিয় লোক কমিশনার সাহেবের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়

জোড়হাট

ট্রেণে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া ২৪শে অগাষ্ট তিতাবর ষ্টেশন হইতে অপর এক ছোট ট্রেণ ধরিয়া সেই দিনই আমরা সকলে জোড়হাট আসিয়া পৌঁছিলাম। এখন কেবল পূর্ব্বমুখী হইয়া এক-টানা চলিয়াছি। সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, মনে হয় যেন এ যাত্রা আর শেষ হইবে না। মহাত্মাজীর নামের ঢেউ কত দূর-দূরান্ত অবধি পৌঁছিয়া গিয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আসামের এই পূর্ব্বাঞ্চল দিয়া গভীর নিশীথে চলিয়া যাইতেছি, তথাপি যেখানে গাড়ী থামে, সেখানেই "মহাত্মা গান্ধীজীর জয়", এই ধ্বনি শুনা যাইতেছে। বহুলোকের মুখে ঐ ধ্বনির গর্জ্জন শুনা আমাদের এত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগের প্রতি আর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। বরং এখন যেখানে অল্পলোকের সমাবেশ হয়, সেখানেই কৌতূহলী হইয়া দেখিবার জন্য বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। অনেক ছোট ছোট ষ্টেশনে দেখিলাম, রাত্রিতে মশাল জ্বালিয়া দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে লোকজন দর্শনের জন্য আসিয়াছে। গ্রাম্য অশিক্ষিত ও দুস্থ লোকদিগের সেই মশালের বাতি, অর্দ্ধনগ্ন দেহ এবং গ্রাম্য কথা ও ব্যবহার দেখিয়া যাঁহারা সহরে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছেন, এবং গ্যাসের বাতি ও ইলেক্‌ট্রিক বাতির আলোতে চক্ষু অভ্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের হয় ত হাসি

বা উপেক্ষার ভাব আসিতে পারে। কিন্তু ঐরূপ অভ্যর্থনা দেখিয়া, এই আন্দোলনের শক্তি, বা সমাজের স্তরে স্তরে মহাত্মাজীর নাম জনসাধারণের মধ্যে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা যেরূপ বুঝা গিয়াছে, এমন আর কিছুতে নহে।

বেলা ৮।৯টার সময় আমরা জোড়হাট পৌঁছিলাম। এখানে দিনের মধ্যে ২।৩টা সভা করিয়া, আবার সন্ধ্যার সময় মালপত্র বাঁধিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। পূর্ব্ব রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়া সাধারণ সভার স্থানে জল দাঁড়াইয়াছিল এবং সেই জল-কাদার মধ্যেই সভা হইল। সভার সময় হঠাৎ সূর্য্যের উত্তাপ এত প্রখর হইয়াছিল যে সভাস্থলে দুইজন লোক মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া গেল। সভার মধ্যাবস্থায় দুইজন বলিষ্ঠ গুর্খা সিপাহী ধাক্কাধাক্কি করিয়া জনতা ভেদ করিল এবং মহাত্মাজী ও মহম্মদ আলী সাহেবের সম্মুখে মঞ্চের ঠিক নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মূর্ত্তি অতি উগ্র, দৃষ্টি অত্যন্ত রুক্ষ। তাহারা আসিয়াই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তখন মহম্মদ আলী সাহেব বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি গুর্খাদিগকে লক্ষ্য করিয়াও দুই এক কথা বলিলেন। বক্তৃতা শেষ করিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলে সমগ্র জনতা যখন "জয়, মহাত্মা গান্ধীজীর জয়" বলিয়া উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন সেই ধ্বনি গুর্খাদিগেরও হৃদয় বিহ্বল করিল। তাহারা তখন আর নিজেদের সেই দম্ভপূর্ণ রুক্ষ চাহনি রক্ষা করিতে পারিল না। তাহাদের মূর্ত্তির উগ্রতা যেন সহসা বিলুপ্ত হইল, দৃষ্টি কোমল হইয়া পড়িল,

এবং সেই জনতার সহিত একযোগে উচ্চকণ্ঠে তাহারাও বারম্বার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সভাভঙ্গের পর কিছু দূর অবধি আমি উহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া দেখিলাম, আনন্দে বিভোর হইয়া টলিতে টলিতে তাহারা ফিরিয়া যাইতেছিল। আমার তখন মনে হইল, বহু লোকের সমষ্টিভাবের উদ্দীপনাতে একটা উন্মাদনা শক্তি আছে, তাহা বড়ই সংক্রামক, এবং তাহার প্রভাব অতি সহজেই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। গুর্খা দুইটীর ভাব, ভাষা ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হইলেও তাহাদের উগ্র তেজ ও বীরত্ব ঐ শক্তির নিকট যেন খর্ব্বীকৃত ও দমিত হইয়া গিয়াছিল।

রাত্রিতে আবার জোড়হাট ষ্টেশনে আসিয়া ছোট লাইনের ট্রেণে উঠিয়া বসিলাম। এই ট্রেণে মরিয়ানী অবধি গিয়া ডিব্রুগড় যাইবার পথে আসাম-বেঙ্গল লাইনের বড় ট্রেণ ধরিব। এই ছোট লাইন এত ছোট যে, এরূপ আর দেখি নাই। গাড়িগুলি এবং এঞ্জিন্ যেন এক একটী খেলার পুতুল বলিয়া মনে হয়। অনেক সময় দৌড়াইয়া এই ট্রেণ পশ্চাৎ ফেলিয়া উহার আগে চলিয়া যাওয়া যায়। গাড়িগুলির এমন বে-মেরামত অবস্থা যে ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে ভয় হয় পাছে সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুর্‌মার্ হইয়া যায়। দরজাগুলি একবার খুলিলে পুনরায় বন্ধ করা মুস্কিল। রাত্রিতে কোন গাড়িতেই বাতি নাই। এই শ্রেণীর লাইন; তাহারই স্পেশ্যাল ট্রেণ করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। কিন্তু সেই রাত্রির স্পেশ্যাল ট্রেণের অভিজ্ঞতা কখনও ভুলিবার নহে। সমস্ত দিন মধ্যে একটুও বিশ্রাম পাই নাই, সেই জন্য ট্রেণে উঠিয়া

একটি বেঞ্চে শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি দশটায় ট্রেণ ছাড়িবে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়া সেরূপ কোন বন্দোবস্ত দেখিলাম না। এই লাইনে বোধ হয় সময়ের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; 'লাইন ক্লিয়ার' ইত্যাদি দিবার হাঙ্গামাও নাই; যখন হউক্ চলিলেই হইল। ঘুমের ভিতর কখন গাড়ি ছাড়িল জানি না। অনেক রাত্রিতে হঠাৎ খুব জোরে একটা ধাক্কা খাইয়া আমরা গাড়ির সমস্ত লোক উঠিয়া বসিলাম, এবং অন্ধকারে মহা হৈ চৈ করিতে লাগিলাম। দেখি ট্রেণ তখন স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য কেহ কেহ বাহিরে গিয়া দেখিলেন, আমাদের পূর্ব্বে যে ট্রেণখানি এই লাইন দিয়া গিয়াছে, তাহার পিছনের দুইখানি গাড়ি ছুটিয়া পথ রোধ করিয়া রহিয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে আমাদের 'কলিশান্' হই-য়াছে। 'কলিশানে'র ফলে কেহই তেমন আঘাত পায় নাই; কিন্তু এদিকে পথ রোধ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া কিরূপে আমরা অগ্রসর হইব ইহা এক সমস্যা হইল। অগত্যা আমাদের এঞ্জিন্ বেচারা সম্মুখের গাড়ি দুইখানিকে ধাক্কা দিতে দিতে চলিতে লাগিল। ছোট এঞ্জিন্; কতই বা ইহার ক্ষমতা; বেচারা অনেক ধুম্‌ধাম্, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া এক এক ধাক্কা দিয়া যেন হয়রান্ হইয়া থামিয়া যাইতেছিল। এইরূপে প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া যাইলে, ট্রেণের 'গার্ড' মহাশয় এক ডিজের লণ্ঠন হাতে করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া ড্রাইভারকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, ঐরূপ ধাক্কাধাক্কির

ফলে পিছন হইতে মহাত্মাজীর গাড়ি ছুটিয়া গিয়া বহু পশ্চাৎ পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমরা সকলেই বাহিরে আসিয়া দেখি, বাস্তবিক মহাত্মাজীর গাড়িখানি আমাদের সঙ্গে নাই। আমরা তখন আতঙ্কে ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। ভারতের মুকুট-মণি আমরা সঙ্গে করিয়া চলিয়াছি। সমগ্র ভারতের প্রাণ মন উঁহাতেই আবিষ্ট রহিয়াছে। আমরা সঙ্গে থাকিয়া সেই রত্নের রক্ষণাবেক্ষণ ও মঙ্গলামঙ্গলের ভার কিছু না কিছু সকলেই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সেই অমূল্য রত্ন আসামের এক জনশূন্য প্রান্তরে গভীর রাত্রিতে ফেলিয়া আসিয়াছি। ড্রাইভারকে তখন পিছন দিকে গাড়ি চালাইতে বলিলাম এবং গাড়ির পাদানিতে দাঁড়াইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া এক দৃষ্টিতে আমরা সকলে ফিরিয়া চলিলাম। এইরূপে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া যখন জ্যোৎস্না-লোকে মহাত্মাজীর গাড়ি দেখিতে পাইলাম, তখন সকলে দৌড়িয়া তাহা ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে চিন্তা বা উদ্বেগের চিহ্ন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিতে লাগিলেন,—আমরা যে পুনরায় ফিরিয়া আসিব এরূপ তিনি মনে করেন নাই; বরং ভাবিতে-ছিলেন, হয়ত পিছন হইতে আর একখানা ট্রেণ আসিয়া তাঁহার গাড়ি ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে। ঐরূপ বিপদের সম্ভাবনাতেও তাঁহার কোনরূপ চিন্তা, বা রাত্রিতে বিশ্রামের অভাব ও ট্রেণের এইরূপ অদ্ভুত বে-বন্দোবস্তেও কোনরূপ বিরক্তি দেখিলাম না।

একাদশ অধ্যায়

ডিব্রুগড়

এইরূপ উত্তেজনার মধ্যে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া আমাদের মরিয়ানী ষ্টেশনে পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। সেখানে আসিয়া দেখি, আসাম বেঙ্গল রেলের ট্রেণখানি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। আমাদের বিলম্ব দেখিয়া মরিয়ানী ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা ট্রেণখানিকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন; আমরা পৌছিয়াই দৌড়াদৌড়ি করিয়া সেই ট্রেণে যাইয়া বসিলাম। ষ্টেশনের লোকজন সকলে ধরাধরি করিয়া আমাদের মালপত্র ট্রেণে তুলিয়া দিলেন। মহাত্মাজীকে আসামের লোকেরা সর্ব্বত্র রাজার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। ট্রেণের যে কামরায় তিনি বসিয়াছেন তাহার দুই দিকে স্বেচ্ছাসেবকেরা দুইটী প্রকাণ্ড তিন বর্ণের নিশান (জাতীয় পতাকা) বাঁধিয়া দিয়াছে। এরূপ রাজসিক ভাবে গমনাগমন মহাত্মাজীর মনোমত নহে, সেজন্য তিনি নিশান দুইটী সরাইয়া লইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা লওয়া হয় নাই। ডিব্রুগড় চা-বাগিচার একটী প্রধান কেন্দ্র। বহু ইংরাজ সর্ব্বদা সেখানে গমনাগমন করেন। আমাদের সঙ্গেও এই ট্রেণে কয়েকজন ইংরাজ চলিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের ঐরূপ নিশান উড়াইয়া ধুম্‌ধাম্‌ করিয়া যাওয়া পছন্দ করিতেছিলেন না। এদিকে বাম-

পার্শ্বের নিশানটী একটী প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠিতে সংলগ্ন ছিল, সেই লাঠি হঠাৎ একটী থামে ধাক্কা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ট্রেণ তখন তীরবেগে ছুটিতেছিল; বাঁশটী ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে নিশানও উড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া ৩।৪ জন ইংরাজপুরুষ মুখ বাড়াইয়া উল্লাসধ্বনি করিয়া আনন্দে করতালি দিতে লাগিলেন। কিন্তু আসামের ভীমকর্ম্মা স্বেচ্ছাসেবকগণ এক একজন কিছু দূর অন্তর ট্রেণের এক একটী দরজা খুলিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া পাহারা দিতেছিলেন। নিশানটী উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া একজন স্বেচ্ছাসেবক প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া নিরতিশয় তৎপরতা সহকারে তাহা ধরিয়া ফেলিলেন, এবং দুই হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ইংরাজদিগের অভিমুখ হইয়া তাহা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাহেবেরা তাঁহার ঐরূপ অসামান্য সাহস ও তৎপরতা দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া গাড়ীর ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আজ এই ক্ষুদ্র ঘটনা স্মরণ করিয়া আসামের প্রতি স্বতঃই আমার হৃদয়ের আবেগ উচ্ছলিত হইতেছে; এবং তৎসঙ্গে মনে হইতেছে, মহাত্মাজীকে কারাবাসে রাখিয়া এখন যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ অসহযোগ আন্দোলনের খোঁটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া আনন্দ করিতেছেন, তাঁহারা যখন দেখিবেন, খোঁটা ভাঙ্গিলেও ভারতের প্রত্যেক প্রান্ত এই আন্দোলনের নিশান ধরিয়া ফেলিয়াছে, এবং তাহা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন চা-বাগিচার সাহেবদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হইবে।

মধ্যে এক ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে প্রভুদাস আমাকে মহাত্মাজীর

কামরাতে আনিয়া কিছু ফল খাইতে দিল। আসিয়া দেখি, তিনি তাঁহার সাসারামের বক্তৃতার যে রিপোর্টটী আমি লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহা পড়িয়া মধ্যে মধ্যে সংশোধন করিতেছেন। বহুক্ষণ এক একটী শব্দ ধরিয়া ধরিয়া অতিশয় যত্ন সহকারে রিপোর্টটী দেখিলেন, এবং দেখা শেষ হইলে উহা আমার হাতে দিয়া কোথায় কোন্ শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা বুঝিয়া লইতে বলিলেন। তাহার পর রিপোর্টটী ছাপিবার জন্য "ইয়াং ইণ্ডিয়া"তে পাঠাইলেন। মহাত্মাজীকে সর্ব্বদা কেমন গম্ভীর দেখিতে পাই, সেজন্য তিনি ডাকিয়া না পাঠাইলে আমি নিকটে বড় যাই না। বোধ হয় শারীরিক পরিশ্রমের জন্য তিনি এইরূপ গম্ভীর হইয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে ২।১ বার মাথায় ও কপালে বরফ ডলিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিতে দেখিয়াছি। অথচ প্রত্যহই দেখি, ঘরে অথবা ট্রেণে যখন যেখানে থাকেন, লোকজন বসিয়া গোলমাল করিতেছে, কিম্বা বাহিরে শত শত লোক চীৎকার করিতেছে, তাহার মধ্যে তিনি ধীর, স্থির ভাবে "নব-জীবন" বা "ইয়াং ইণ্ডিয়া"র প্রবন্ধ লিখিতেছেন। মনের উপর এইরূপ আধিপত্য অসামান্য বলিয়া আমার মনে হইল। সাসারামের রিপোর্ট সংশোধন করিয়াই গৌহাটীর বক্তৃতার যে রিপোর্ট দিয়াছিলাম, তাহা তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু একটু পরেই উহা রাখিয়া দিলেন।

২৫শে অগাষ্ট বেলা ১২টার সময় আমরা আসামের প্রায় শেষ প্রান্ত, ডিব্রুগড় আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানের কার্য্য শেষ

হইলেই আমাদের ফিরৃতি স্থুরু হইবে। আজ দিন রাত্রি এবং কাল ২টা অবধি এখানে আমাদিগের অবস্থান, তাহার পর শিলচরের দিকে যাত্রা করিব। শিলচরের পর সিলেট, সিলেটের পর চট্টগ্রাম যাইব। চট্টগ্রাম হইতে চাঁদপুর হইয়া বরিশাল যাইতে হইবে। বরিশালে এক দিন অবস্থিতির পর ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখ কলিকাতায় যাইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। এদিকে কুমিল্লা, খুলনা প্রভৃতি স্থান হইতে নিমন্ত্রণের উপর নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল। মহাত্মাজী সকল নিমন্ত্রণই প্রত্যাখ্যান করিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতাতে "ওয়ার্কিং কমিটি"র বৈঠক বসিবে, সেজন্য ঐ তারিখের পূর্ব্বে সেখানে তাঁহাকে পৌছিতেই হইবে।

দ্বিপ্রহরে ডিব্রুগড় পৌছিয়া স্নানাহারের পর একটু বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় তিনি আমাকে ডাকিয়া কতকগুলি টেলিগ্রাম পাঠাইতে দিলেন, এবং আসামের চা-বাগান ও চা-বাগানের কুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য গেজেটিয়ার প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে বলিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত নবীন বারদলই মহাশয় সেখানে আসিলেন। দেখিলাম আসামের সমস্ত সংবাদ তাঁহার নখাগ্রে রহিয়াছে। মহাত্মাজীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তিনি চটপট্ দিয়া দিলেন। আমাকে আর কোন পুস্তক খুঁজিয়া তাহা বাহির করিতে হইল না। বারদলই মহাশয় যে ভাবে আসাম-সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্যবিষয় আয়ত্ত করিয়াছেন, এরূপ প্রায় দেখা যায় না।

ডিব্রুগড়ে আসিয়াই মহাত্মাজী চা-বাগানের কুলিদিগের

বিষয়ে বিশেষ করিয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। আজ রাত্রিতে যে সভা হইবে আসামে ইহাই তাঁহার শেষ সভা। দুঃস্থ ও নির্য্যাতিত কুলিদিগের প্রতি কিছু আশ্বাসবাণী প্রদানের জন্য তিনি সমুৎসুক। চাঁদপুরে কুলিবিভ্রাটের সময় কুলিরা তাঁহারই নাম মুখে লইয়া চা-বাগিচা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তিনি তখন তাহাদিগের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই। এদিকে তাঁহার আগমনে পাছে কুলিদিগের মধ্যে পুনরায় ঐরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেজন্য চা-কর মহলে বড়ই ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ফলে চক্ষু রাঙ্গাইয়া কুলিদিগের প্রাণে এমনই ভীতি জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কুলিরা সাহস পূর্ব্বক মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে আসিতে পারে নাই। রাত্রিতে সভাস্থলে কতজন কুলি উপস্থিত তাহা জানিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে হাত তুলিতে বলিলেন, কিন্তু সেই দশ পনর সহস্র লোকের মধ্য হইতে মাত্র তিন চারিটী হাত উঠিয়াছিল। এদিকে তাঁহার আবাসস্থলে একজন কুলি গোপনে আসিয়া তাহাদিগের সমস্ত দুঃখের কাহিনী মহাত্মাজীকে বলিয়া গিয়াছিল।

রাত্রিতে জনসাধারণের সভায় মহাত্মাজী তাঁহার প্রাণের কয়েকটী কথা ব্যক্ত করিলেন। তিনি ভারতের জন্য কিরূপ স্বরাজ আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং সেই স্বরাজ লাভ করিতে হইলে স্বদেশী সাধনার প্রয়োজন কেন, তাহা তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ইংরাজদিগের গ্রাস হইতে যদ্যপি দেশের লোক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিতে পারে তাহা হইলে এক প্রকার

স্বরাজ স্থাপিত হইবে বটে; কিন্তু উহা খাঁটি স্বরাজ হইবে কি না তাহা নিরূপণ করিবার উপায় বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, উহা দ্বারা গরীবের প্রাণে শান্তি আসিল কি না, গরীব লোক সুখে থাকিতেছে কিনা তাহাই দেখিতে হইবে; যদি তাহা না হয় তাহা হইলে সেরূপ স্বরাজ দ্বারা ভারতের লাভ নাই। আজ কেবল অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আসামে প্রায় ১০ লক্ষ কুলি আসিয়া রহিয়াছে। মহাত্মাজী বুঝাইয়া দিলেন যে, সমাজের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক অবস্থা। বাড়ী-ঘর-আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া, নিজের সমাজ, নিজের পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, এই যে এত দুঃস্থ ভারতবাসী কেবল পেটের জ্বালায় বাহির হইয়া আসিয়াছে, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে, স্বরাজ স্থাপন করিয়াও তাঁহার সমস্ত আশাভরসা ব্যর্থ হইবে। সেজন্য তিনি চরকা, তাঁত ও খদ্দরের উপর এত জোর দিতেছেন। আমরা যেমন হোটেলে না গিয়া ঘরে আহার প্রস্তুত করি, সেই প্রকার নিজেদের বস্ত্রের সংস্থান যদি ঘরে ঘরে নিজেরা করিয়া লইতে না পারি, তাহা হইলে সমগ্রভাবে দেশের কল্যাণ কখনই হইবে না, এবং গরীবের দুঃখ দূর হইবে না,—এই কথা মহাত্মাজী পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। সেজন্য স্বদেশী ব্রত তাঁহার চক্ষে এক প্রকার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। বিলাতী বস্ত্র, সেই ধর্ম্ম পালনের অন্তরায় বলিয়া তিনি তাহা জ্বালাইয়া দিয়া মহা সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন যে তাঁহার এই

সন্তোষের কারণ কি তাহা না বুঝিতে পারিয়া উহা ঘৃণাপ্রসূত কার্য্য বলিয়া অনেকে তাঁহার সমালোচনা করিতেছে। কিন্তু কেহ যদি ভাবিয়া দেখেন যে, এই বিলাতী বস্ত্রের ব্যবহার নিমিত্ত ভারতে অসংখ্য লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া মারা যাইতেছে, অসংখ্য লোক অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতেছে, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন, কেন ঐ বস্ত্র অপবিত্র ও অস্পৃশ্য। তিনি আরও বলিলেন যে প্লেগের রোগীর বস্ত্র যেমন জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, ঠিক সেই প্রকার হৃদয়ের ভাব লইয়াই তিনি বিলাতী কাপড় জ্বালাইয়া আনন্দ পাইয়া থাকেন। মদ গাঁজা খাইয়া লোকে যে পাপ করে, তাহা অপেক্ষা তিনি বিলাতী বস্ত্র ব্যবহারের পাপ গুরুতর মনে করেন। কারণ তিনি বলিলেন, গঞ্জিকাসেবী, মগ্তপায়ী জানে যে সে কুকার্য্য করিতেছে; কিন্তু বিলাতী বস্ত্র ব্যবহারের পাপ লোকে পাপ বলিয়া বোধ করে না। সেই কারণে তিনি যে আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভের কথা বলিয়া থাকেন, তাহার জন্য যে প্রকার নেশা ত্যাগ, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি ত্যাগের প্রয়োজন, বিলাতী বস্ত্র ত্যাগেরও সেইরূপ প্রয়োজন, ইহা তিনি বুঝাইয়া দিলেন।

আসামের যে যে সহর মহাত্মাজী পরিদর্শন করিয়াছেন, সকল সহরেই তিনি স্তূপীকৃত বিলাতী বস্ত্র অগ্নিসাৎ করিয়া আসিয়াছেন। কেবল ডিব্রুগড়ে সেরূপ কোন বন্দোবস্ত হইল না। এখানে জনসাধারণের উৎসাহ ও উত্তেজনার অভাব নাই; কিন্তু সেরূপ ত্যাগী ও একনিষ্ঠ নেতার অভাবে অপর স্থানের ন্যায়

কাজের শৃঙ্খলা ছিল না। তাঁহার আসাম অবস্থানের শেষ দিনে ঐ পবিত্র যজ্ঞ করিতে না পারিয়া মহাত্মাজী বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। শেঠ যমুনালালজী আমাদের সহিত জোড়হাট না গিয়া নওগাঁও হইতে সোজা ডিব্রুগড়ে চলিয়া আসিয়াছিলেন। আসামের বিলাতী বস্ত্রের ব্যবসা সমস্তই মাড়োয়ারিদের হাতে। ডিব্রুগড় ঐ ব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র। সেজন্য শেঠ্‌জী এখানকার মাড়োয়ারিদের সঙ্গে কিছু সময় থাকিয়া তাহাদিগকে স্বদেশী-ব্রতে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকল সহরেই মাড়োয়ারিদের বিশেষ সভা হইয়াছিল এবং শেঠ্‌জীর চেষ্টায় তাহাদিগের দ্বারা প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করান হইয়াছে। অনেক স্থলে তাহারা কেবল এক বৎসর বিদেশী কাপড় আমদানী করিবে না এরূপ চুক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মহাত্মাজী তাহাতে সম্মত হ'ন নাই। স্বদেশী সম্বন্ধে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তের একটুও ইতরবিশেষ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন।

ডিব্রুগড়ের চা-কর সমিতির (Planters' Association) সাহেবদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় ও বন্ধুভাবে মেলামেশা করিয়া মহাত্মাজী তাঁহার আসামের কার্য্য শেষ করিলেন। ২৬শে অগাষ্ট ২টার সময় তিনি ডিব্রুগড় হইতে চলিয়া আসেন, তাহার পূর্ব্বে বেলা ১০টা আন্দাজ সাহেবদিগের 'ক্লাবে' যাইবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে তিনি কাহাকে সঙ্গে লইবেন বা না লইবেন, কিছুই জানিতাম না। আমাকে সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নাই, সেজন্য আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম

না। এদিকে সময় মত ঠিক্ ঘড়ি ধরিয়া উঠিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাহার পর যমুনালালজী ডাকাডাকি করিয়া আমাকেও যাইতে হইবে বলিয়া, একখানা গাড়িতে আমাকে তুলিয়া দিলেন। 'ক্লাবে' পৌছিয়া দেখি, মহাত্মাজীকে সঙ্গে করিয়া সাহেবরা বসিয়া গিয়াছে। মধ্যভাগে একটা প্রকাণ্ড ঘর-জোড়া টেবিল ; টেবিলের অপর দিকে অপর সকলের বসিবার আসন শূন্য রহিয়াছে। নেতাদিগের মধ্যে মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব, শেঠ যমুনালালজী এবং আসামের কয়েক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সেখানে রহিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, আমাদের মধ্যে প্রভু-দাস, হিরোয়ে ও আমি ছিলাম। আসামের চা-বাগিচার সাহেব-দিগের যে প্রকার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শুনিয়াছি, তাহাতে তাহাদের আশেপাশে দেশী লোকের যাইবার সাহস হয় না। কিন্তু আজ মহাত্মাজীর আগমনে লোকের বন্যা কে আট্‌কাইয়া রাখিবে? সামান্য কুলি-মজুর, যাহারা সাহেব দেখিলে দূরে পলাইয়া যায়, তাহারাও দলে দলে এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ ক্লাবঘর ঘিরিয়া ফেলিল, এবং তাহার পর কেহ তাহাদিগকে বাধা দিল না দেখিয়া সাহস পাইয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সেই স্থানের শান্তিরক্ষা দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িল। সাহেবদিগের ইচ্ছা ছিল, মহাত্মাজীর সহিত তাহাদের এই আলোচনা গোপনে হইবে ; সেজন্য মহাত্মাজীর অভিপ্রায়মত কোন বক্তৃতার রিপোর্ট লওয়া হয় নাই। কিন্তু জনতার মধ্যে একান্তে কথাবার্ত্তার কোন সম্ভাবনাই রহিল না। চারিদিকে

গোলমাল হইতে থাকিলেও সাহেবেরা শান্ত, ধীর ও নম্রভাবে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিলেন। চা-কর সভার সভাপতি মহাশয় মহাত্মাজীকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে, তিনি যখন কথা আরম্ভ করিলেন, তখন সহসা চারিদিক্ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা আমি ইতঃপূর্ব্বে কখনও শুনি নাই, এত দিন তিনি হিন্দীতে বক্তৃতা দিতেছিলেন। কিন্তু এখানে যাহা শ্রবণ করিলাম তাহাকে বক্তৃতা বলিব, না মন্ত্রঃপূত, শক্তিযুক্ত শব্দের স্ফুরণ বলিব, বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার ভাষার কোন আড়ম্বর ছিল না; অথচ এক একটী কথা যেন তিনি হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া উদ্ধার করিতেছিলেন। তাহার ফলে সেই শব্দ উচ্চারণ মাত্র সকলের প্রাণ বিদ্ধ করিতেছিল। গভীর রবে তিনি যখন নিজের বক্তব্য বলিয়া যাইতেছিলেন, তখন মনে হইল তিনি ক্রমশঃ এক মোহজাল বিস্তার দ্বারা সকলের মন প্রাণ হরণ করিয়া লইতেছেন। বলিবার সময় দেখিলাম, তাঁহার চক্ষুতে যেন স্পন্দন নাই, কোন দিকে অঙ্গসঞ্চালন নাই, মনও বোধ হয় সেইরূপ স্তব্ধ ও স্পন্দনরহিত হইয়া গিয়াছিল। নতুবা, তাঁহার বাক্যের প্রভাবে শ্রোতার অন্তরে ঐরূপ শান্তরসের বিকাশ হইবে কিরূপে? এরূপ সত্য, এবং একাধারে কঠোরতা ও মাধুর্য্যপূর্ণ সমালোচনা আমি পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করি নাই। সাহেবদিগের বিরুদ্ধে আমাদের দেশবাসীর যাহা কিছু অভিযোগ, সমস্তই তিনি নিজের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া সাহেবদিগকে বলিয়া দিলেন। কিন্তু কোন অপূর্ব্ব শক্তির প্রভাবে ঐরূপ তীক্ষ্ণ

সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি সাহেবদিগকে এমন মিত্র করিয়া লইলেন যে, মাথা তুলিয়া তাঁহার প্রতিবাদ করিতে কাহারও শক্তি রহিল না। বরং তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে সাহেবেরা এক জনের পর একজন উঠিয়া তাঁহার স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং ভবিষ্যতে মহাত্মাজীর আদর্শানুরূপ আপনাদিগকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিবেন, এইরূপ তাঁহারা অঙ্গীকার করিলেন।

সভাভঙ্গের পর তিনি দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু সেই জনতার লোক সকলেই ধাক্কাধাক্কি করিতে করিতে, একে অপরের অগ্রে মহাত্মাজীর নিকট যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি, প্রভুদাস ও হিরোয়ে বাহিরে আসিয়া দেখি, এত লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে যে, তাহা ভেদ করিয়া গাড়িতে উঠিবার চেষ্টা বৃথা। সেজন্য আমরা একটু অগ্রসর হইয়া পথে দাঁড়াইয়া রহিলাম; ভাবিলাম, যদি তিনি দেখিতে পান আমাদিগকে তুলিয়া লইবেন। কিন্তু তাহাও হইল না, মোটার ছাড়িতেই সমস্ত লোক সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিল, তাহাতে এত জনতা আসিয়া উপস্থিত হইল যে, তাহার মধ্যে আমরা হারাইয়া গেলাম। ভিড় সরিয়া গেলে আমাদের যাইবার কোন গাড়ি নাই দেখিয়া, কিরূপে বাসায় ফিরিব ইহা এক সমস্যা হইল। রাস্তা ঘাট আমরা কেহই চিনি না; তাহার উপর ট্রেণেরও সময় হইয়া আসিতেছে। একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পায়ে হাঁটিয়া বাসায় গিয়া আমাদের ট্রেণ পাইবার সম্ভাবনা অল্প।

সেজন্য বাসায় না ফিরিয়া আমরা সোজা ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরেই মহাত্মাজী এবং আমাদের দলের অপর সকলে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্ল্যাটফরমে ও ষ্টেশনের বাহিরে লোকের অত্যন্ত ভিড়; সকলেই ঠেলিতে ঠেলিতে মহাত্মাজীর নিকট যাইতে ব্যগ্র। তাহাতে পাছে ধাক্কাধাক্কি সুরু হইয়া যায় এবং জনতার মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য তিনি একটা টুল বা চেয়ারের উপর উন্নত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহাতে সকলের মাথার উপর দিয়া দূরের লোকেরাও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া যে যাহার স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।
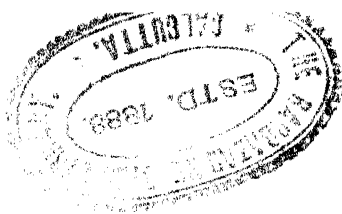
দ্বাদশ অধ্যায়

শিলচরের পথে

ডিব্রুগড় হইতে শিলচর পৌঁছিতে একটানা ৩২ ঘণ্টার পথ চলিতে হইবে। ইহার মধ্যে তিন স্থানে ট্রেণ বদল করিবার হাঙ্গামা আছে। আমাদিগকে যাহাতে সে অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, সেজন্য ট্রেণের একখানা 'বোগি' স্বতন্ত্র ভাড়া করা হইয়াছে। তাহাতে ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড, ইণ্টার ও থার্ড, এই চারি শ্রেণীর কামরা এক সঙ্গে আছে। যে যে ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিবার কথা, সেই সেই স্থানে আমাদের সেই গাড়িখানি কাটিয়া দ্বিতীয় ট্রেণের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। ইহাতে আমাদিগকে প্রত্যেকবার নামা উঠার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। শিলচরের পথে এই ৩২ ঘণ্টার অসামান্য ক্লেশ এবং সুখভোগ, উভয়ই ভুলিবার নহে। গত পনর ষোল দিন যাবৎ উপর্য্যুপরি এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে এবং দিবারাত্রি ট্রেণে আবদ্ধ থাকাতে শরীরের সমস্ত পদার্থ যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তদুপরি অবিচ্ছেদে ৩২ ঘণ্টা ট্রেণে বায়ুবেগে চলিতে গিয়া শরীরের উপর কি পরিমাণ ধাক্কা লাগিয়াছিল, তাহা যাঁহারা বহু দূরপথ ট্রেণে চলাফেরা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এদিকে পথের সেই ক্লেশ অপনোদন করিবার জন্যই যেন লামডিং জাংশান হইতে দশ এগার

ঘণ্টার পথ, নাগা পর্ব্বতমালার মধ্যে, প্রকৃতি দেবী যে অপরূপ, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের পসরা খুলিয়া এক স্বপ্ন-রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তাঁহারই নয়ন-মন সার্থক হইয়াছে।

এই ৩২ ঘণ্টার মধ্যে আমি মহাত্মাজীর নিকট একবার মাত্র গিয়াছিলাম। বোধ হয় ডিব্রুগড় হইতে রওনা হইয়াই ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া ষ্টেশনের মধ্যে, মাত্র এক ঘণ্টাকালের জন্য আমি তাঁহার কামরায় ছিলাম। সে সময় ঈষৎ হাসিতে হাসিত তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আসামের যে সহরে তিনি যা'ন নাই বলিয়া সেখানকার লোকেরা অভিমান করিয়া পত্র দ্বারা তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছে যে ট্রেণ-লাইনের উপর তাহারা শুইয়া থাকিবে, সে সহর কতদূর ? আমি ঐ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু শুনি নাই, সেজন্য ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনসুকিয়া আসিয়া প্রভুদাস, হিরোয়ে ও আমি অন্য এক কামরায় গিয়া আমাদের শয়নের স্থান করিয়া লইলাম। সন্ধ্যার সময় ট্রেণের দোলানিতে সকাল সকাল নিদ্রা আসিয়া পড়িল। তাহার পর অধিক রাত্রিতে হঠাৎ লোকের তর্জ্জন গর্জ্জন ও চীৎকার শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখি রাত্রি তখন প্রায় ১১টার সময় আমরা শিবসাগর রোড্ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই স্থান হইতেই বোধ হয়, লোকেরা ঐরূপ ভয় দেখাইয়া চিঠি পাঠাইয়াছিল। এদিকে মহাত্মাজী তাঁহার নিয়মমত, রাত্রি ৯ টার সময় নিদ্রা গিয়াছেন। যমুনাদাসজী তাঁহার কামরায় পাহারা দিতে-

ছিলেন। শিবসাগর রোডে গাড়ি থামিতেই সেখানকার লোকেরা আলো লইয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে মহাত্মাজীর কামরায় প্রবেশ এবং তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে উদ্যত হইল। রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে না পাইলে তিনি দিন ভরিয়া কাজ করিতে পারিবেন না, ইহা লোকেরা বুঝিতে পারে না। এতদ্‌ব্যতীত, তখন যেরূপ সঙ্গীন সময়, তাহাতে এক দিনের জন্যও তিনি অসুস্থ হইয়া থাকিলে তাঁহার কত কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে। এই কারণ রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত যাহাতে না হয়, তজ্জন্য আমরা বিশেষ সাবধান। শিবসাগরের লোকেরা যখন তাঁহার গাড়ির নিকট ঐ প্রকার গোলমাল করিয়া ও আলো হাতে লইয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে আসিল, তখন যমুনাদাসজী তাহাদিগকে অনেক করিয়া নিষেধ করিলেন। কিন্তু সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ২।১ জন লোক গাড়ির ভিতর যাইবার উদ্যোগ করিল। যমুনাদাসজী তখন পথরোধ করিয়া তাহাদিগকে বাধা দিলেন। এদিকে মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে মহাত্মাজীর গাড়ির সম্মুখে ঐরূপ গোলমাল ও চীৎকার শব্দ শুনিয়া তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়া আসিলেন, এবং যাহারা আদেশ অমান্য করিয়া মহাত্মাজীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে দূর করিয়া দিলেন। ইহাতে সেই লোকেরা অপমানিত বোধে ক্রোধে আত্মহারা হইল। মহাত্মাজী কিন্তু তখনও অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এত গোলমালের মধ্যেও তাঁহার ঐরূপ গাঢ় নিদ্রা আমাদের নিকট অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া বোধ

হইল। কিন্তু পরিশেষে মৌলানা সাহেবের প্রতি সেই লোকদিগের 'ধিক্ ধিক্' (shame, shame) চীৎকার শব্দ ও হাততালিতে এমন সোরগোল হইল যে তাহাতে মহাত্মাজী উঠিয়া পড়িলেন এবং ঘুমের চোখে ব্যস্ততার সহিত "ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া" বলিতে বলিতে গাড়ির দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সেই অসংযত জনতার ক্রোধ মুহূর্ত্ত মধ্যে শান্ত হইয়া গেল এবং সমস্ত লোক উল্লাসধ্বনি করিতে করিতে প্ল্যাট্‌ফরমের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারা গাড়ি ছাড়িয়া ঐরূপে বসিয়া পড়িল দেখিয়া ট্রেণের ড্রাইভার সুযোগ পাইল; সে তথনই হুইসিল্ (বাঁশি) না দিয়া চুপে চুপে ট্রেণ চালাইয়া দিল, এবং একটানে ট্রেণখানি জনতার গণ্ডির বাহিরে আনিয়া রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদিগকে লইয়া ছুটিতে লাগিল।

পরদিন (২৭শে অগাষ্ট) সকালে একটু বেলাতে লামডিং জাংশানের নিকটবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ গাড়ি থামিয়া গেল। ষ্টেশন তথন দূর হইতে দেখা যাইতেছিল। একজন ইংরাজ সেই সময় কয়েকজন রেলের কর্ম্মচারী সঙ্গে করিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া মহম্মদ আলী সাহেবকে বলিলেন যে, আমাদের ট্রেণের আসিতে বিলম্ব হওয়াতে লামডিং ষ্টেশনে যে ট্রেণে আমাদের বদল হইবার কথা ছিল তাহা চলিয়া গিয়াছে। সেদিন আর আমাদের যাইবার কোন ট্রেণ নাই। তবে তথনই একখানা মালগাড়ি বদরপুর ও শিলচরের পথে যাইতেছে, সেজন্য তিনি মনে করিয়াছেন যে

আমাদের 'বোগি'খানা কাটিয়া, পশ্চাদ্‌ভাগে সেই মালগাড়ির সহিত উহা সংযুক্ত করিয়া দিবেন। ঐ মালগাড়ির সঙ্গে যাইতে না পারিলে সমস্ত দিন লামডিং ষ্টেশনে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে জানিয়া মৌলানা সাহেব তখনই সেই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং সাহেবটীকে তাঁহার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তখনই সাহেব তাঁহার লোকজনের সাহায্যে বিশেষ তৎপরতার সহিত সাণ্টিং আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং আমাদের 'বোগি'খানা কাটিয়া সেই মালগাড়ির সহিত জুড়িয়া দিলেন। লামডিং ষ্টেশনে পৌছিয়া কংগ্রেসের বিভাগমত মহাত্মাজীর আসাম ভ্রমণ সমাপ্ত হইল। লামডিং-এর পর এক দুর্ভেদ্য গিরিমালা, বাঙ্গালা ও আসামের স্বাভাবিক সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। সেই গিরিমালা ভেদ করিয়া সুরমা উপত্যকায় পৌছিলে শিলচর ও শিলেট নগর পাওয়া যাইবে। সুরমা উপত্যকার লোকেরা বাঙ্গালী বা বাঙ্গলা-ভাষী বলিয়া কংগ্রেসের বিভাগমত ইহাদিগকে বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগ অনুসারে উহা আসাম গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন। লামডিং আসিয়া আমাদিগকে আসামের বন্ধুবর্গের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইল। ফুকন্ সাহেব সকলের নিকট বিদায় লইয়া গৌহাটী যাইবার ট্রেণ ধরিতে চলিয়া গেলেন। তাহার পর, অক্লান্তকর্ম্মা ও সদা প্রফুল্লবদন স্বেচ্ছাসেবক গোস্বামী-ভ্রাতৃদ্বয় এবং তৎসহ আসামের অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন।

এদিকে মহাত্মাজীর গাড়িখানা মালগাড়ীর সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া লামডিং ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে যে জনতা মহাত্মাজীর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা সেই মাল-গাড়ির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। চাঁদপুরের কুলি-বিভ্রাট লইয়া আসামবেঙ্গল রেল লাইনে যে ধর্ম্মঘট চলিতেছে, তাহার ফলে অনেক রেল-কর্ম্মচারী কাজ ছাড়িয়া লামডিংএ বেকার বসিয়া আছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, মহাত্মাজী সেদিন লামডিং থাকিয়া তাঁহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যা'ন। মহাত্মাজীর সঙ্গে আমাকে একা বাঙ্গালী দেখিয়া অনেকে আমার নিকট আসিয়া নানারূপ ভয়ের কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন যে পর্ব্বত-মালার মধ্যে অত্যন্ত দুর্গমপথ দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে; রাত্রিতে সে পথে গাড়ি চালান হয় না। আমরা যদি বেলা থাকিতে সেই ভীষণ পর্ব্বত ও অরণ্যশ্রেণী পার হইয়া যাইতে না পারি, তাহা হইলে বড়ই ভাবনার কথা। কেহ কেহ স্পষ্টই বলিলেন, রেলওয়ের সাহেবটী বোধ হয় কোন অসদভিপ্রায়ে মালগাড়ির সহিত মহাত্মাজীর গাড়ি জুড়িয়া দিয়াছেন। এক পর্ব্বতের চূড়া হইতে গাড়িখানি ফেলিয়া দিলে মহাত্মাজীকে লইয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের যত ভয় ও দুশ্চিন্তা এক নিমিষে তাহা দূর হইয়া যাইবে, অথচ মালগাড়ি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে বিশেষ কোন জবাবদিহিতে পড়িতে হইবে না।

এই সমস্ত অলীক ভয়ের কথা মহাত্মাজীর কাণে তুলিয়া উপহাসাস্পদ হইতে অবশ্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিছুক্ষণ

পরে মালগাড়ি ছাড়া হইলে ক্রমশঃ আমরা সেই দুর্গম বন-মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। এই নিবিড় অরণ্য ও পর্ব্বত-মালার মধ্যেও দশ-বিশ মাইল অন্তর রেলওয়ে ষ্টেশন, এবং চতুর্দ্দিকে কোথাও লোকজনের বসতি দেখা না গেলেও মহাত্মাজীর নামের প্রভাবে প্রত্যেক ষ্টেশনে কিছু না কিছু লোক জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত হইতেছে। এই বিজন বনমধ্যে তাঁহার নাম কি করিয়া প্রবেশ করিল তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। এক ষ্টেশনে গিয়া দেখি, আসামের গভর্ণর সাহেব স্পেশ্যাল ট্রেণে আমাদের বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তিনি লামডিংএর দিকে যাইতেছিলেন। দুইখানা ট্রেণ যখন পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইল, তখন মনে হইল যেন মহাত্মাজীর সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ওজনের পরিমাণ তুলাদণ্ডে মাপ হইয়া গেল। গভর্ণর সাহেবের গাড়িতে বন্দুক স্কন্ধে সিপাহী পাহারা দিতেছিল এবং মাজা, ঘসা, চক্‌চকে ট্রেণখানি দর্পণের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। কিন্তু এত শক্তির আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও ষ্টেশনে যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, কেহ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মহাত্মাজী যে কদর্য্য মালগাড়ির সঙ্গে চলিয়াছেন, তাহারই নিকটে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় লোকের গোলমালে লাট্ সাহেবের শান্তির ব্যাঘাত হওয়াতে, মহাত্মাজীর ট্রেণখানি প্ল্যাটফরম্ হইতে একটু দূরে লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু তাহাতে মহাত্মাজী ও গভর্ণমেণ্টের

প্রভাবের তারতম্য আরও স্পষ্ট হইয়া গেল। গভর্ণর সাহেবের গাড়িখানা তখন একেবারে জনপ্রাণী-পরিশূন্য হইয়া নিঝুম ভাবে এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিল; আর সেই পর্ব্বতবেষ্টিত বনস্থলীর মধ্যে যেটুকু জীবনের স্পন্দন ও মানুষের নিদর্শন পাওয়া যায়, সে সমস্তই মহাত্মাজীর ট্রেণের চারিদিকে আবির্ভূত হইল।

লামডিং হইতে যাত্রা করিয়া আমাদিগকে যে সকল ষ্টেশন পার হইতে হইয়াছিল, কেবল তাহার নাম শুনিলেই পাঠক সে প্রদেশের দুর্গমতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রথম ষ্টেশনের নাম হাতীখালি, তাহার পর লাংটিং, মুপা, মইবাং, হাফ্‌লং, জাটিন্দা, মৈলংদিসা, ইত্যাদি। এইরূপ অজ্ঞাত ভাষার নামযুক্ত বহুস্থান অতিক্রম করিয়া যখন দামচারা ও কাচ্‌লিচারা নামক দুই ষ্টেশনের পর চন্দ্রনাথপুর নামে এক ষ্টেশন পাইলাম, তখন সেই পরিচিত শব্দ হইতেই বুঝিতে পারিলাম, আমরা পুনরায় লোকালয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আসাম-বেঙ্গল রেল-লাইনের হিল্‌ সেক্সান (Hill-section) ইংরাজদিগের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। এই দুর্গম প্রদেশের মধ্য দিয়া রেল লাইন লইয়া যাইতে যে অসামান্য উদ্যোগ করিতে হইয়াছে, তাহা দেখিলে তাহাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ়চিত্ততাকে স্বতঃই ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে এই রেল লাইনে বন্য হস্তীর খুব উপদ্রব ছিল। কখনও পালে পালে হাতী আসিয়া রেল লাইন অবরোধ করিত এবং তাহাদের রাজত্বে মানুষের আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইত। আজকাল সেরূপ দুর্ঘটনা প্রায় হয় না। তথাপি

ভরসা করিয়া এখনও এই অঞ্চলে রাত্রিতে ট্রেণ চালান হয় না। এইরূপ ভীষণ দেশ, অথচ এত সুন্দর! সে সৌন্দর্য্যের কি পার আছে? কোথায়ও পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত দাঁড়াইয়া যেন স্পর্দ্ধা করিয়া গগন স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কোথাও বা এক পর্ব্বতে বর্ষার মেঘ ঝুর্‌ঝুর্‌ করিয়া বৃষ্টি দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর এক পর্ব্বতে সূর্য্যের কিরণ ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। কোথাও বা মেঘে কিরণে আলিঙ্গিত হইয়া পর্ব্বত বেষ্টন করাতে অপূর্ব্ব রামধনুর সৃষ্টি হইয়াছে। কোন স্থানে কুজ্মটিকার গাঢ় আবরণের ভিতর দিয়া সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিয়া রক্তিম আভায় চারিদিক ব্যাপ্ত করিয়াছে। আবার কোথাও বা কোন উদ্ধত পর্ব্বত-শৃঙ্গ আস্ফালন পূর্ব্বক উন্নত মস্তকে সূর্য্যকে অন্তরালে ফেলিয়া নিম্ন-দেশে ঘন বৃক্ষরাজির মধ্যে অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে এক সঙ্গে আলোক ও আঁধার, কুয়াসা ও মেঘ, রৌদ্র ও বৃষ্টি, এবং সর্ব্বোপরি প্রকৃতির শ্যামল শোভার স্থানে স্থানে রক্তিম আভার সমাবেশ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, সেই বনস্থলীতে যেন একই সময় দিবা ও রাত্রি, প্রাতঃ ও সন্ধ্যা, বিরাজ করিতেছে; এবং ছয় ঋতু নিজ নিজ সৌন্দর্য্যের পসরা খুলিয়া যুগপৎ বিলাস করিতেছে। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে বহুদূর বিস্তৃত উপত্যকার মধ্যে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পর্ব্বত-শিলায় আঘাত লাগিয়া নাচিতে নাচিতে তর্‌তর্‌ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথাও বা উপত্যকা শনৈঃ শনৈঃ সমুন্নত হইয়া, দূরে অপর এক গিরিশৃঙ্গকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছে; এবং এইরূপ যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ ঢেউ

খেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এক এক স্থানে, তুঙ্গ পর্ব্বতের উপর উঠিতে ট্রেণখানি মাঝে মাঝে যেন কষ্ট করিয়া অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তাহাতে মনে হইতে লাগিল বুঝি বা আমাদের মত উহারও হৃদয় সেই স্থানের শোভায় মুগ্ধ হইয়া বিকল হওয়াতে উহার গতিরোধের উপক্রম হইতেছে। ট্রেণের সেই মন্দগতি দেখিয়া কতস্থানে প্রলুব্ধ হইয়া মনে মনে ট্রেণ হইতে নামিয়া গিয়াছি, এবং সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্যের মদিরাপানে আত্মবিস্মৃত হইয়া কত পর্ব্বতের ছায়ায় নীল নভোমণ্ডলের নিম্নে কুটীর বাঁধিয়া জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছি। প্রভুদাস এই সময় কিছুক্ষণ মহাত্মাজীর নিকট ছিলেন, এবং আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, মহাত্মাজী ঐ স্থানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। আসামের জঙ্গলে লোকের অজ্ঞাতে, এই ভূস্বর্গ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে ইউরোপ, আফ্রিকা ও ভারতের বহুস্থান তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ মনোরম স্থান কোথায়ও তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

পার্ব্বত্য প্রদেশ পার হইয়া যখন আমরা বদরপুর জাংশানে আসিয়া পৌছিলাম তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। বদরপুর হইতে শিলচর এক ঘণ্টার পথ। শিলচর হইতে বহুলোক নানা প্রকার দ্রব্যসম্ভার লইয়া মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা করিতে বদরপুর আসিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে দিন ভরিয়া যে অনাবিল শান্তি ও নীরবতা উপভোগ করিতেছিলাম, লোকালয়ে পৌছিয়া তাহা

অন্তর্হিত হইল এবং বহু লোকের সমাগম ও কোলাহলের মধ্যে প্রকৃতির এক স্বতন্ত্র মূর্ত্তির প্রকাশ দেখিলাম। কেহ হয়ত বলিবেন যে প্রকৃতির এই মূর্ত্তি সচেতনা ও কর্ম্মশীলা; আর অপর মূর্ত্তি নিশ্চেষ্টা ও চৈতন্য-বিরহিতা। কিন্তু বনে, পর্ব্বতে, নির্ঝরিণীতে, বায়ুতে, আকাশে ও মেঘে যে জীবনের স্পন্দন ও চেতনা বিদ্যমান, তাহা আসামের বনে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করিয়া আসিয়াছি। নিস্তব্ধা প্রকৃতির সেই মধুর রূপ দেখিয়া এবং তাহার নিঃশব্দ ও অস্ফুটবাণী প্রাণে প্রাণে শ্রবণ করিয়া লোকালয়ের সমস্তই এখন বিসদৃশ ও কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের ন্যায় জনপ্রবাহ মহাত্মাজীকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের কথাবার্ত্তা হইতে যে শব্দতরঙ্গ উত্থিত হইতেছে তাহা এখন নিরস ও রুক্ষ বোধ হইতেছে। তখন রাত্রির নিবিড় অন্ধকার চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু ষ্টেশনের বাহিরে একস্থানে অভ্যর্থনার জন্য আলো লইয়া এত লোক উপস্থিত হইয়াছে যে, সেই বহুদূর বিস্তৃত আলোকমালা ও লোকসংঘট্ট দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন যুদ্ধের প্রাক্কালে এক বিশাল সৈন্যব্যূহ রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়-মান রহিয়াছে। মহাত্মাজীকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া যখন সেই স্থানে যাওয়া হইল তখন সেই অন্ধকার রাত্রিতে আমাদের ভয় হইতে লাগিল। যদি জনতার শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই বিপদের সম্ভাবনা। মহম্মদ আলী সাহেব মহাত্মাজীর পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার দুই পার্শ্বে হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে

রক্ষা করিয়া যাইতে লাগিলেন, তাহাতেই আমরা কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম। লোকালয়ে আসিয়া মনে হইল এতক্ষণ যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া এই বত্রিশ ঘণ্টা একটানা ভ্রমণের ক্লেশ ভুলিয়াছিলাম। কিন্তু এখন তন্দ্রার মোহ আক্রমণ করিয়া শরীরকে অবসন্ন ও অভিভূত করিতে লাগিল, এবং এক প্রকার অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় রাত্রি প্রায় দশটার সময় লোকের জয়ধ্বনি ও আনন্দ কলরবের মধ্যে আমরা বদরপুর হইতে শিলচর আসিয়া পৌছিলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিলচর

শিলচর আসিয়া আমরা বাঙ্গলার মাটিতে পদার্পণ করিলাম। ।দরপুর হইতেই বাঙ্গলার হাওয়া অনুভব করিতেছিলাম। কারণ বাঙ্গলার মাটি যেমন কোমল, সেইরূপ বাঙ্গালীর হৃদয় ও বাঙ্গালীর ভাষাও কোমল। সেজন্য বাঙ্গালীর প্রাণ হইতে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা স্বভাবতঃ কোমল ছন্দঃ ও সুরের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায়। বাঙ্গলার এত বড় স্বদেশী আন্দোলন, তাহা গান আশ্রয় করিয়াই উদ্বুদ্ধ হয়; গানে গানে তাহার বৃদ্ধি হয় এবং সে গান যখন থামিল তখন সেই স্বদেশীযুগের উদ্দীপনা অবসান-প্রাপ্ত হইল বলিয়া বুঝা গেল। তখন বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য কবির অভ্যুত্থান হইয়াছিল এবং তাহাদের গানের সুরে বাঙ্গলার পথ, ঘাট ও মাঠ সর্ব্বদা মুখরিত হইত। বাস্তবিক সেই ২২ বৎসরের অতীত ঘটনা যখন স্মৃতিপথে উদিত হয়, আর মনে মনে চিন্তা করি, এত বড় আন্দোলনে আমরা কাজের মত কাজ কি করিয়াছি, তখন দেখি, এক প্রাণ ভরিয়া গান করা ব্যতীত আমরা কেহই বিশেষ কিছু করি নাই। বদরপুর হইতে শিলচরের লোকেরা মহাত্মাজীকে ট্রেণে করিয়া লইয়া যাইবার সময় সমস্বরে গান করিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতে সেই স্বদেশী যুগের পুণ্যস্মৃতি

আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। তাঁহারা অবশ্য মহাত্মা-জীকে পাইয়া বাঙ্গালীর স্বভাবগত আনন্দের অভিব্যক্তি, গানের সাহায্যেই করিতেছিলেন, কিন্তু মহাত্মাজীর দলের অন্য কেহই বাঙ্গালী নহেন; সেজন্য পথশ্রমের পর এই ভাবে বহু লোক কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে গান তাঁহাদের বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল, এবং মহম্মদ আলী সাহেব চলন্ত গাড়ি হইতেই অনেকবার ডাকাডাকি করিয়া তাহা থামাইয়া দিলেন।

শিলচরে আমরা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের বাটীতে উঠিয়াছি। চন্দ মহাশয় অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় ছিলেন, মহাত্মাজীর শিলচর পৌছিবার পরদিন তিনি ফিরিয়া আসিয়া-ছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে পূর্ব্ব রাত্রির অভ্যর্থনা ও আতিথ্য তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অরুণকুমার করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে আমরা এই তিন জন, যমুনাদাস, প্রভুদাস ও কৃষ্ণদাস। নামের এই সাদৃশ্য দেখিয়া অরুণকুমার মনে করিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাসও গুজরাত প্রান্তের কোন লোক হইবে। সেজন্য তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা ইংরাজীতে হইতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, তিনি যখন ইংরাজীতে কথা আরম্ভ করিয়াছেন, আমিও সেই স্থলে আত্মগোপন করিয়া যাইব। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহা পারিলাম না, কারণ ইতিমধ্যে যমুনাদাসজী গোপনে তাঁহাকে আমার বাঙ্গালীত্বের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। তখন অরুণকুমার আমার নামের সূত্রে আমি তাঁহাকে এতক্ষণ ফাঁকি দিতে পারিয়াছি বলিয়া হাসিতে হাসিতে আবার নূতন করিয়া আত্মীয়তা করিয়া গেলেন।

অরুণকুমারের সৌজন্য, সরলতা ও সেবার পারিপাট্য দেখিয়া সকলের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট। মহাত্মাজীও তাঁহাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখিতেছেন।

পথশ্রমে আমরা যে প্রকার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহাতে রাত্রিতে যেখানে যাহার সুবিধা হইল, সেখানেই পড়িয়া রহিলাম এবং রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। পরদিনও শরীরের ক্লান্তি দূর হইল না। মহাত্মাজীর সঙ্গে আসা অবধি এমন একটু স্থান কোথাও পাই নাই, যেখানে দুই মিনিট নিশ্চিন্তমনে, নিরালা বিশ্রাম করিতে পারি। সর্ব্বদা শত শত লোকের দৃষ্টির মধ্যে থাকা কিরূপ কষ্ট-দায়ক, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কেহ বুঝিতে পারিবে না। প্রাতঃকালে দেখিলাম, মহাত্মাজীর মুখমণ্ডল নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে সকল শিশু বালক ও বালিকা তাঁহার নিকট আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে একটু হাসিয়া খেলিয়া তিনি যেন সেই পথশ্রম কথঞ্চিৎ অপনোদনের চেষ্টা করিতেছেন। এক একটী শিশুর প্রতি যেই তিনি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, অমনি সেই শিশু তাঁহার আত্মীয় হইয়া যাইতেছে। তাঁহার মিশিবার ভঙ্গী ঐরূপ; বোধ হইল যেন বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা বালকদিগের সহিত তাঁহার প্রাণের যোগ অধিক। একটী ছোট ছেলে তাঁহার কোলে উঠিয়াই সেই স্নিগ্ধ স্পর্শগুণে ঘুমাইয়া পড়িল; তখন তিনি হাসিতে হাসিতে "আমার কোলে আসিলেই ঘুম", এই কথা বলিয়া ছেলেটীকে হাতে করিয়া লইয়া অপর এক ব্যক্তির কোলে তুলিয়া দিলেন। কিছু পরে ঘরের মধ্যে লোক-

জনের ভিড় একটু কম হইলে তিনি আমাকে পার্শ্বের ঘর হইতে ডাকিয়া তাঁহার এক ইংরাজ বন্ধুর নামে একখানা চিঠি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু লেখার পর, অপর সময় পত্রখানা লিখাইয়া লইবে, এই কথা বলিয়া তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

বৈকাল ৪ টার সময় শিলচর হইতে আমাদের চলিয়া যাইবার কথা ছিল। সেজন্য তৎপূর্ব্বেই মহাত্মাজী সেখানকার জনসভার কার্য্য সমাপ্ত এবং শিলচরের জাতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। আমি মালপত্র লইয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম বলিয়া সভাস্থলে যাইতে পারি নাই। শিলচর হইতে শিলেট প্রায় এক শত মাইলের পথ, কিন্তু এই পথ অতিক্রম করিতে এত অসুবিধা যে বলা যায় না। ট্রেণে ও ষ্টেশনে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হইবে ; ইহার মধ্যে আবার দুই ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে, এবং কুলাউরা নামে এক ষ্টেশনে রাত্রি দ্বিপ্রহরে পৌঁছিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানেই থাকিতে হইবে। পরদিন প্রাতে শিলেট যাইবার ট্রেণ পাওয়া যাইবে। যাহাতে মহাত্মাজীকে এই অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, সেজন্য শিলেটের নেতারা অনেক চেষ্টা করিয়া শেষ মুহূর্ত্তে একখানা স্পেশ্যাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহার ফলে আমাদের ৪টার সময় যাওয়া স্থগিত রহিল।

স্পেশ্যাল ট্রেণ রাত্রি ৯।১০ টার সময় ছাড়িবে ; তাহার পূর্ব্বে, আজ রবিবার বলিয়া সন্ধ্যা হইতে মহাত্মাজী মৌনাবলম্বন

করিলেন। শিলচর আসা অবধি আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে, আমি কি জন্য মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে দেশ পর্য্যটন করিতেছি? আমার দ্বারা তিনি কিরূপ কাজ পাই-বার আশা করেন তাহা আমি বুঝিতেছি না। দেখিতেছি, তেমন কোন কাজে আমি নিযুক্ত নাই। এই কয়দিন সঙ্গে থাকিয়া যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে যে তাঁহার পক্ষে লোকের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা তিনি মনে করেন না। প্রায় সকল কাজই তিনি যথাসম্ভব নিজের আয়ত্তে রাখিয়া থাকেন। অপরের দ্বারা কাজ করাইতে হইলে অপরকে যে সামান্য অবলম্বন আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহাতেও তিনি যেন নারাজ। আমাকে কেবল তাঁহার হিন্দী বক্তৃতার রিপোর্ট ইংরাজীতে লিখিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাও আমি ভালরূপ সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। অনবরত স্থান পরিবর্ত্তনে ও লোকের গোলমালে যেরূপ অশান্তিতে থাকিতে হয়, তাহাতে আমার দ্বারা লেখার কার্য্য অসম্ভব। তদ্ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে লোকের এত ঠেলাঠেলি হয় যে তাহার মধ্যে মনঃসংযম করিয়া তিনি যেমন ট্রেণে বসিয়া লেখেন, সেরূপ চেষ্টা অসম্ভব। এই সমস্ত কারণে মনে হইতেছে, আমি যেন একপ্রকার বিনা কাজে মহাত্মাজীর সঙ্গে পরিভ্রমণ করিয়া বৃথা তাঁহার অর্থব্যয় করিতেছি। সন্ধ্যার সময় আমার চিত্তের চঞ্চলতার বিষয় কথাপ্রসঙ্গে প্রভুদাসকে একটু বলিয়াছি। রাত্রিতে স্পেশ্যাল ট্রেণ ছাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে, আমি

প্রথমে মালপত্র লইয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম। তাহার পর প্রভুদাস মহাত্মাজীর সঙ্গে এক মোটারে ষ্টেশনে আসিবার সময় আমার মনের ঐরূপ অবস্থা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছে, ইহা সে ট্রেণে উঠিয়া আমাকে বলিল। মহাত্মাজী মৌন ছিলেন বলিয়া কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে ষ্টেশনে একটা মহা গণ্ডগোল বাঁধিয়া গেল। তাহার মধ্যে মহম্মদ আলী সাহেবের চড়া গলার শব্দ শুনিতে লাগিলাম। মহাত্মাজীর এই স্পেশ্যাল ট্রেণের সঙ্গেও ২।৩ জন পুলিসের গোয়েন্দা গার্ডের গাড়িতে চড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মহম্মদ আলী সাহেব জোর ধমক্ দিয়া তাহাদিগকে নামাইয়া দিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শিলেট

২৯শে অগাষ্ট তারিখ প্রাতে মহাত্মাজী শিলেট পৌঁছিলেন। আজ সোমবার বলিয়া তিনি মৌনী আছেন। মৌনাবস্থায় বাহিরের লোকের সংস্পর্শে আসিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক, সেজন্য ট্রেণে বসিয়া তিনি আমাকে লিখিয়া দিলেন যে, ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার পথে যেন শোভাযাত্রার আয়োজন করা না হয়। শিলেটের যে সকল লোক তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সে কথা আমি বুঝাইয়া বলিলাম। তাঁহারা বলিলেন, শিলেটের সুরমা নদীর তীরেই মহাত্মাজীর আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং ষ্টেশন হইতে নৌকাযানে সোজা সেখানে যাইবার সুবিধা আছে। তাঁহাকে ঐরূপে পাঠাইয়া দিয়া মৌলানা মহম্মদ আলী, শেঠ্ যমুনালালজী ও মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেবকে লইয়া শোভাযাত্রা করিলেই লোকের আগ্রহ নিবৃত্তি হইবে। তাঁহাদের ঐ কথা যখন আমি মহাত্মাজীকে বলিলাম, মাথা নাড়িয়া তিনি তাহাতে সম্মতি জানাইলেন, এবং তাঁহার মৌনব্রতের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

সুপ্রশস্ত সুরমা নদীতীরে শিলেট নগর অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইতে হইলে ঐ নদী পার হইতে হয়। বহুলোক

নৌকা করিয়া মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, তাহাতে নদীতে যেন নৌকার বহর লাগিয়াছে। নদীর অপর পারে সহরের সমস্ত লোক মহাত্মাজীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি মনে করিলাম, এখানকার লোকেরা মহাত্মাজীর আচার ব্যবহারের সহিত পরিচিত নহেন। সেজন্য তিনি যে আজ মৌনী, এবং মৌনবারে লোকের সংস্পর্শে আসিতে তিনি অনিচ্ছুক, ইহা না বুঝিয়া তাঁহারা তাঁহার আবাসের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ হইতে পারেন, এই ভাবিয়া আমি পূর্ব্বে বাসায় যাইয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিয়া রাখিব স্থির করিলাম এবং কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে করিয়া ছোট এক ডিঙ্গিতে রওনা হইলাম। অর্দ্ধেক পথ আসিয়া নদীবক্ষ হইতে দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহার বাসার দিকে মহাত্মাজীকে না আনিয়া যে ঘাট হইতে শোভাযাত্রা করা হইবে, সেই ঘাটে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার পর আমাদিগের বাসায় পৌছিবার বহুক্ষণ পরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, তাঁহার মস্তকে, ললাটে ও সর্ব্বদেহে ফুলের পাপ্‌ড়ী বিক্ষিপ্তভাবে লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার বদনমণ্ডল গম্ভীর ও রক্তবর্ণ। আসিয়াই তিনি শেঠ্‌ যমুনালালজীকে সম্মুখে দেখিয়া কাগজ পেন্সিল লইয়া গুজরাতীতে লিখিয়া দিলেন, তাঁহাকে আজ এত কষ্ট দেওয়া হইল কেন? নিকটে স্থানীয় কংগ্রেসের সেক্রেটারী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাকে শেঠ্‌জী সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারই সহিত আমার ট্রেণে কথা হইয়াছিল যে,

মহাত্মাজীকে আজ শোভাযাত্রায় লইয়া যাওয়া হইবে না। কিন্তু তিনি সে কথা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এদিকে মহাত্মাজীও মৌনী ছিলেন বলিয়া সেই কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। শেঠ্‌জীর কাতর দৃষ্টিতে সেক্রেটারী মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া দোষ স্বীকার করিলেন এবং যদি কোনরূপ শাস্তি গ্রহণ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়, তবে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু মহাত্মাজী কি শাস্তি দিবেন! মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্য লোকের যে অপরিমিত আগ্রহ তাহাও স্বাভাবিক, এবং জেলার চতুঃসীমা হইতে এত লোক শিলেটে সমবেত হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে শান্ত, সুসংযত এবং সুনিয়মিত করিতে স্থানীয় কর্ম্মিবৃন্দকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এইরূপ স্থলে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলেই বা আমরা কি করিয়া স্বরাজের দায়িত্বগ্রহণে সমর্থ হইব?

আসামে মহাত্মাজীকে যত্ন এবং সর্ব্বদা লোকের ভিড় হইতে রক্ষা করিবার জন্য একদল কর্ম্মক্ষম স্বেচ্ছাসেবক সর্ব্বদাই নিযুক্ত ছিলেন; এখানে উহার বিশেষ অভাব বোধ হইতে লাগিল। এই কারণ আমাকে ছুটাছুটি করিয়া স্থানে স্থানে স্বেচ্ছাসেবকের পাহারা বসাইয়া যাহাতে তাঁহার ঘরের ভিতর ভিড়ের চাপ না আসে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইতেছিল। শিলেটে পৌঁছিয়াই মহাত্মাজী লিখিয়া লিখিয়া আমাকে আদেশ করিয়া আমার দ্বারা অনেক কাজ করাইতেছেন। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১টা

অবধি আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া কাজ করিয়াছি। তাহার পর, 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'র জন্য একটী প্রবন্ধ তিনি ট্রেণে বসিয়া লিখিয়াছেন, তাহা আমাকে নকল করিতে দিলেন। তাঁহার বড় বড় করিয়া পেন্সিলে লেখা অভ্যাস। তাঁহার কোন্ প্রবন্ধের কত পৃষ্ঠা এবং কোন্ তারিখে তাহা ডাকে পাঠান হইল, এই সমস্ত বিষয় একখানা ছোট ডায়েরী পুস্তকে তিনি লিখিয়া রাখেন। আজ কাজের পর কাজ দিয়া আমাকে মাথা তুলিতে দেন নাই। আমি ইহাতে বুঝিলাম, কাল শিলচর হইতে আসিবার সময় প্রভুদাসের মুখে আমার মনের চাঞ্চল্যের কথা শুনিয়া তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহার ফলে তিনি উপর্য্যুপরি আমাকে এইরূপ কাজ দিতেছেন।

কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া এখানকার স্বেচ্ছাসেবকেরা ভিড় নিয়মিত করিতে শিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দ্বিপ্রহর হইতে মহাত্মাজী কিছু শান্তিতে থাকিতে পারিতেছেন, এখন আর তাঁহার নিকট লোকজন আসিতে পারিতেছে না। কিন্তু এই সময় এক-খানা বহুলোক স্বাক্ষরিত বাঙ্গলা দরখাস্ত আসিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল যে, স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিরা বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভের জন্য আসিয়াছে। কিন্তু মহাত্মাজীর শুভাগমনে সহরে এত লোকের সমাগম হইয়াছে যে, কোন হোটেলে তাহাদিগের বাসা মিলে নাই; এমন কি, বাজারে আহার্য্য বস্তু অপ্রতুল হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহারা বৈকালের ষ্টীমারে স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে

হইবে। এই কারণ তাহারা প্রার্থনা করিল যে, মহাত্মাজী যদি একবার সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া তাহারা গ্রামে চলিয়া যাইতে পারিবে। আজ তাঁহার মৌনবার; প্রাতে ষ্টেশন হইতে আসিবার সময় এই পবিত্র দিনের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া তিনি যে প্রকার ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন, তাহাতে এই দরখাস্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিব কি না, চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। পরে ভাবিলাম, কথাটা উল্লেখ করিয়া দেখি, যদি তিনি পছন্দ না করেন, তখন দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করিলেই চলিবে। কিন্তু লোকদিগের ক্লেশের কথা তাঁহাকে বলিবামাত্র তিনি আসন ত্যাগ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই হাত তুলিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং হাত নাড়িয়া নাড়িয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব গ্রামে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব স্থানীয় খিলাফৎ কমিটির অতিথি হইয়াছেন। মধ্যে একবার মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়া অদ্যকার সংবাদ-পত্রে মালাবারের মোপ্‌লা হাঙ্গামার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তিনি তাঁহাকে দেখাইয়া গেলেন।

মহাত্মাজীর মৌনভঙ্গের পর সভাস্থলে যাইবার সময় এক-ঘোড়ার একখানা খোলা গাড়ি করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যাইবার মানসে বহু লোক ঐ গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ঘোড়াটি বলিষ্ঠ হইলেও উহার প্রতি

অত্যাচার হইতেছে বলিয়া মহাত্মাজী বিশেষ আপত্তি এবং বারম্বার অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যিনি মহাত্মাজীকে সভায় লইতে আসিয়াছেন, সভাস্থলে প্রবেশের পথ তাঁহার জানা ছিল না, সেজন্য গাড়ি লইয়া তিনি কেবল সভা পরিক্রম করিতে লাগিলেন।

শিলেটের সুপ্রসিদ্ধ ইদ্‌গাতে সভা বসিয়াছে। এই ইদ্‌গার সমকক্ষ ইদ্‌গা বাঙ্গলা ও আসামের মধ্যে আর নাই; শুনিলাম, সমগ্র ভারতেও এরূপ ইদ্‌গা ৩।৪টীর অধিক নাই। ৫।৬ সহস্র মুসলমান এই ইদ্‌গাতে এক সঙ্গে নমাজ পড়িতে পারেন। ইদ্‌গার উচ্চ প্রাঙ্গণের পশ্চিম পার্শ্বে মঞ্চের উপর মহাত্মাজী, মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব, আজাদ সুবানী সাহেব ও শেঠ যমুনালালজী বসিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে ঢালু জমিতে কাতারে কাতারে অসংখ্য লোক ধীরভাবে বসিয়া আছে। পশ্চাতে ইদ্‌গার দেওয়ালের নিকট বহুলোক নেতাদিগের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য ঠেলাঠেলি ও গোলমাল করিতেছে, আর মহম্মদ আলী সাহেব চীৎকার করিয়া "থাঁমোশ্", "থাঁমোশ্" বলিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিঞ্চিৎ শান্তি স্থাপিত হইলে মহাত্মাজী হিন্দীতে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

মহাত্মাজী যাহা বলিলেন তাহার সারকথা এই :—খিলাফৎ আন্দোলন ধর্ম্মের আন্দোলন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, মুসলমান ধর্ম্মের খিলাফৎ এক প্রধান স্তম্ভ, তখন মুসলমান ভ্রাতার ধর্ম্মরক্ষাকল্পে তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন।

তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, যদি তিনি ইহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে ভ্রাতার ধর্ম্মনাশের প্রতীকার-কল্পে চেষ্টা করেন নাই বলিয়া ভগবানের নিকট তাঁহাকে জবাব-দিহী করিতে হইত। তিনি আরও বুঝিয়া দেখিলেন যে, খিলাফৎ ধর্ম্মান্দোলন অবলম্বন করিয়া ভারতে হিন্দু-মুসলমানের একতা স্থাপিত হইতে পারে। এইরূপ সুযোগ শতবর্ষ মধ্যে আর আসিবে না। ইহা যদি প্রত্যাখ্যান করা যায়, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের আন্তর্বিরোধ নিমিত্ত ভারতবাসীকে এই শতবর্ষ দলিত ও লাঞ্ছিত হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। এই জন্য তিনি মনে করেন যে, খিলাফতের সহিত ভারতের স্বরাজ-সমস্যা ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। এই স্বরাজের জন্য শান্তির পথ অনুসরণ করিতে হইবে। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, ভারতের এমন শক্তি নাই যে তরবারির সাহায্যে ভারত ইংরাজের সহিত বোঝা-পড়া করিতে সক্ষম হয়। এক্ষণে ভারতের যে ক্ষাত্রশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার পরিচালন দ্বারা ভারত কেবল অপর দেশের স্বাধীনতা নাশ করিয়া উহাকে ইংরাজের আয়ত্তীভূত করিয়া দিতে পারে। কিন্তু তাহার দ্বারা ভারত নিজে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ নহে। সে জন্য তিনি সকলকে বারম্বার সাবধান করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়, দেশে যদি দাঙ্গা ফ্যাঁসাদ মারকাট্ আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট বজ্রের ন্যায় আমাদের উপর পড়িয়া এক ফুৎকারে এই আন্দোলন ধ্বংস করিয়া দিতে পারিবে। আরও বলিলেন, যে

হত্যাকাণ্ডের পথ অনুসরণ করিলে মালাবারের মোপ্‌লারা যেমন পাগল হইয়া পাঁচ ছয় জন ইংরাজ বধ করিয়া তদ্‌-বিনিময়ে শত সহস্র লোকের প্রাণ দিয়া তাহার প্রতিফল ভোগ করিতেছে, সেইরূপ সমগ্র ভারতকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে; আর পাঞ্জাবের অত্যাচারের সময় অমৃতসহরের একটীমাত্র গলির অধিবাসীদিগকে বুকে হাঁটিতে হইয়াছিল, কিন্তু এবার দেশশুদ্ধ লোককে বুকে হাঁটিতে হইবে। ঐরূপ দাঙ্গা ফ্যাসাদ সংঘটিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট শীঘ্র আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিবেন বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইতেছে। ঐ কথার উল্লেখ করিয়া তিনি তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন—"যদি গভর্ণমেণ্ট কাল তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে চাহে, আমি বলিব আজই তাঁহাদিগকে লইয়া যাও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি দেশের লোককে পাগল না হইয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে উপদেশ দিব। আমি দেশের নিকট ত্যাগ চাই; কিন্তু মারামারি, কাটাকাটি করিয়া প্রাণ দিতে যে পরিমাণে ত্যাগ দরকার, তদপেক্ষা অনেক অল্প ত্যাগ আমি চাহিতেছি। যদি আলী ভাইদের গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আমার ইহাই প্রত্যাশা যে অবশিষ্ট উকিলেরা ওকালতি ত্যাগ করিবেন; স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা সরকারী শিক্ষার সম্পর্ক বর্জ্জন করিবে এবং বিদেশী বস্ত্র অস্পৃশ্য ও অপবিত্র জ্ঞানে প্রত্যেক লোকেই সূতা কাটিয়া কাপড় বুনাইয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিবে। যদ্যপি এই সামান্য ত্যাগ-স্বীকার এই দেশের শক্তির

অতীত হয়, আর আমি যদি জীবিত থাকিতে সেই অকৃতকার্য্যতা প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইলে তখন আমি জগৎকে বলিয়া দিব, ভারতে স্বরাজ লাভের এখনও বিলম্ব আছে।"

জনসভা হইতে মহাত্মাজী স্ত্রীলোকদিগের সভাতে চলিয়া গেলেন। প্রাচীর-বেষ্টিত এক দেবমন্দিরে সেই সভা হইয়াছিল। সেখানে শিশুদিগের চীৎকার এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পরস্পরের বাক্যালাপে ভয়ঙ্কর গোলমাল হইতেছিল। স্বদেশীর যুগে স্ত্রীলোকদিগকে দেশের কাজে প্রবর্ত্তিত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই; কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলনে চরকা প্রচলনের আবশ্যকতা অধিক বলিয়া স্ত্রীলোকদিগের উপরই কাজের ভার অধিক ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহাদের উৎসাহের প্রমাণ বেশ পাওয়া যাইতেছে। অথচ শিক্ষার অভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি তাহাদিগের নাই বলিয়া স্থলে স্থলে শান্তির বড় ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল।

পরদিন (৩০শে অগাষ্ট) প্রাতে তাঁহার কামরায় তিনি একক আছেন দেখিয়া আমি নিকটে গিয়া বসিলাম এবং প্রভুদাস শিলচর হইতে আসিবার সময় তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছে তাহা ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া আমি নিজেই আমার মনের সন্দেহ ও চাঞ্চল্যের কথা তাঁহাকে জানাইলাম। তাহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন যে, আমি তাঁহার বিশেষ কোন কাজে নাই, কিম্বা তাঁহার সহিত চলাফেরা করিয়া সাধারণের অর্থ অপব্যয় করিতেছি, এই প্রকার চিন্তা করা আমার দরকার নাই। তিনি যখন

সেরূপ কিছু মনে করিবেন, তখন নিজেই তিনি আমাকে তাহা জানাইয়া দিবেন। এই কথার পর ট্রেণে যাইবার সময় আমার আহারাদির সম্বন্ধে বিচার করিয়া বলিলেন—"শরীরকে এত ক্লেশ দিও না।" তাহার পর কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া বলিলেন—"শরীর ভাল হইয়া যাইবে।" এই কথাবার্ত্তার সময় তিনি পুনরায় আমাকে বলিয়া দিলেন যে আমি যেন তাঁহার সকল বক্তৃতাস্থলেই উপস্থিত হই। আমি তাহাতে উত্তর করিলাম যে, 'ভিড়ের মধ্যে লোকের চাপে আমার বড় কষ্ট বোধ হয়; কাল সভাতে যাইবার জন্য গাড়িতে উঠিতেছি এমন সময় এত লোক আসিয়া আমার উপর পড়িয়াছিল যে তাহাদের ধাক্কাধাক্কিতে আজ শরীরে বেদনা বোধ হইতেছে'। ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলাফেরা করিতে বলিলেন; একটু অভ্যাস হইয়া গেলে ভিড়ের ক্লেশ আর আমার অনুভব হইবে না। এই কথার পর তিনি তাঁহার একটী ইংরাজী প্রবন্ধ আমার হাতে দিলেন এবং উহার ভাষা কোথায় কোথায় সংশোধন করিলে আমার মতে উহা ভাল হইবে তাহা পরীক্ষা করিতে বলিলেন। তাঁহার ইংরাজী আমি কি পরীক্ষা করিব? বরং আমাকেই তিনি পরীক্ষা করিতেছেন, ইহাই বুঝিলাম। যাহা হউক, আদেশ পালনের হিসাবে ভয়ে ভয়ে দুই স্থানের ইংরাজী সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে বলিলাম। সে স্থান দুইটী তিনি তখন পুনরায় পড়িলেন, এবং এক স্থানের ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া আমার বিশ্লেষণ ঠিক হইয়াছে

বলিলেন। দ্বিতীয় স্থানের ভাষার কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না, এবং কেন করিলেন না, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

বেকাল ৪টার সময় মহাত্মাজী শিলেট হইতে প্রস্থান করিয়া চট্টগ্রাম যাত্রা করিলেন। তৎপূর্ব্বে বেলা ২টার সময় শিলেটের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার নিকট আসিল। তিনি তখন রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের সমস্ত খবর লইতে লাগিলেন। ছাত্রেরা সূতা কাটে কি না, জিজ্ঞাসার পর তিনি চরকা বিভাগের শিক্ষক মহাশয়কে রকা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিক্ষক হাশয় কোন শ্রেণী চরকা পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, এবং নিজের চরকারও দোষগুণ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না; সুতরাং তিনি মহাত্মাজীর কোন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলেন না। মহাত্মাজী তাহাতে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন যে, ঐরূপ চরকা দ্বারা কোন ফললাভ হইবে না। ছাত্রদিগের মধ্যে কয়েক জনের মাথায় খদ্দরের সাদা টুপি (গান্ধিটুপি) দেখিয়া তাহারা ঐ টুপি পরিয়াছে কেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, ঙ্গলার এমন জল-হাওয়া, এখানে কি টুপির কোন প্রয়োজন ছে? ছাত্রদিগকে তিনি বুঝাইলেন যে, স্বরাজের জন্য যোগ্যতা ভ করিতে হইলে কেবল অনুকরণশীল হইলে চলিবে না; সমস্ত ষয় স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া কার্য্য সম্পাদনের শক্তি অর্জ্জন রিতে হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চট্টগ্রাম

৩০শে অগাষ্ট বৈকাল ৪টা হইতে এক রাত্রি ও একদিন ট্রেণে বাস করিয়া ৩১শে তারিখ সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহাত্মাজী চট্টগ্রাম পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে কুমিল্লা, লাক্‌সাম ও ফেণী এই তিন স্থানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বহুল আয়োজন হইয়াছিল। বাঙ্গলায় তখন কোথায়ও খদ্দরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। দেশী মিলের কাপড় ব্যবহার করিলেই স্বদেশীপালন হইল, এখানকার লোকের এরূপই ধারণা। তাহা দেখিয়া মহাত্মাজী প্রাণে বড় ক্লেশ পাইতেছেন। বাঙ্গলা হইতে তিনি অনেক প্রত্যাশা করেন; অথচ বাঙ্গলায় এত উৎসাহ সত্ত্বেও যে পথ অনুসরণ করিলে বাঙ্গলার প্রকৃত কল্যাণ হইবে এবং আন্দোলন সফল হইবে, বাঙ্গলা সে পথ তখনও অবলম্বন করে নাই।

শিলেটের বক্তৃতার উপসংহারে মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে তিনি দেশের নিকট যে সামান্য ত্যাগ প্রত্যাশা করিতেছেন, তাহাতে যদি দেশবাসী অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার দেহপাতের সম্ভাবনা আছে। তিনি এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করাতে তাঁহার পার্ষদবর্গের মধ্যে ট্রেণে সেই বিষয় লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল, এবং সকলের প্রাণে একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পতিত হইল। পূর্ব্বেও মহাত্মাজী দুই-একবার ঐ প্রকার ইঙ্গিত

করিয়াছিলেন। তিনি কি ভাবে ঐ কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝিবার জন্য শেঠ্ যমুনালালজী ট্রেণে তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলেন যে, এই বৎসর মধ্যে স্বরাজ লাভ না হইলে মহাত্মাজী কি আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিতেছেন? তাহাতে মহাত্মাজী উত্তর করিলেন যে তিনি নিজে ঐরূপ কিছু করিবেন না। তবে তিনি যে প্রকার অসামান্য পরিশ্রম করিতেছেন, এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার চিত্ত যেরূপ তন্ময় হইয়া আছে, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে শরীরের উপর যে ধাক্কা বা প্রতিঘাত লাগিবে, শরীরের পক্ষে তাহা সহ্য করা সম্ভব হইবে না বলিয়াই তিনি মনে করেন।

লাক্সাম ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বহু মুসলমান উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের মাথায় বিদেশী টুপি দেখিয়া মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব মনের দুঃখে তাহাদিগকে সেই টুপি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন এবং সেই পরিত্যক্ত টুপি স্মার্ণার প্রপীড়িত তুর্কীদিগের নিকট পাঠাইবার জন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক টুপি সংগৃহীত হইল। আসামে মুসলমানের সংখ্যা অল্প বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় অধিক সংখ্যায় বিলাতি টুপি এখানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে বিলাতী কাপড়ের পাগড়ি বাঁধিয়া আসামের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা মহাত্মাজীর দর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেই জ্বালাইবার জন্য তাহাদের সেই পাগড়ি স্বেচ্ছাসেবকগণ সংগ্রহ করিতেন। অনেক লোক দেখিয়াছি অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুরোধ এবং চক্ষুলজ্জার খাতিরে পাগড়ি সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আসামের

তিনসুকিয়া ষ্টেশনে কয়েকজন মাড়োয়ারী এইরূপে পাগড়ি খুলিয়া দিল, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকেরা একটু অন্তরাল হইলেই তাহারা মহাত্মাজীর নিকট আসিয়া পাগড়ি ফেরত চাহিল। মহাত্মাজী তখনই তাহা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। এই টুপি ও পাগড়ি কাড়াকাড়ি লইয়া ভবিষ্যৎকালে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা পাঠক এক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে, বম্বের হাঙ্গামার বিবরণ পাঠে অবগত হইবেন।

শিলেট হইতে চট্টগ্রামের পথে সর্ব্বস্থানে উৎসাহ ও উত্তেজনা পূর্ণমাত্রায় দেখা গিয়াছিল। তবে দুঃখের বিষয় এই যে মহাত্মাজী এবং তাঁহার সঙ্গের লোকজনের আহারের বন্দোবস্ত কোন স্থানে করা হয় নাই। তাহার ফলে আমাদিগকে ২৪ ঘণ্টা কাল একপ্রকার উপবাসী থাকিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালী এত কর্ম্মকুশল জাতি হইয়াও আতিথ্যের এই অমার্জ্জনীয় ত্রুটি হইল দেখিয়া, নিজে বাঙ্গালী বলিয়া আমার নিতান্ত লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। বেলা দ্বিপ্রহরে ট্রেণ ফেণী ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। এখানকার লোকেরা মহাত্মাজী ও মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবকে নামাইয়া ষ্টেশনের পার্শ্বস্থিত চাঁদোয়ার নিম্নে এক স্থানে লইয়া গেলেন। কিন্তু লোকের ভিড় এত অধিক হইয়াছিল যে ঐস্থান ট্রেণ হইতে ২০।২৫ হাত দূরে হইলেও ঐ সামান্য ব্যবধান অতিক্রম করিতে তাঁহাদের ৫।৬ মিনিট সময় লাগিল। তাঁহারা নামিয়া যাইবার একটু পরে ট্রেণখানি মন্দগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে ষ্টেশনে ঘণ্টার শব্দ হইল না, এবং ট্রেণের বাঁশী বাজিল না দেখিয়া

আমরা মনে করিলাম যে বোধ হয় "সান্টিং" করিয়া ট্রেণখানি লোকের ভিড় হইতে কিছুদূরে সরাইয়া রাখা হইতেছে। কিন্তু যখন ষ্টেশনের বহির্দ্দেশে যাইয়া ক্রমে ট্রেণের বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন মহাত্মাজী ও মৌলানা সাহেব ফেণীতে পড়িয়া রহিলেন দেখিয়া আমরা ৩।৪ জন এক সঙ্গে ট্রেণ থামাইবার শিকল টানিয়া ধরিলাম। তাহাতে ট্রেণ তখনই থামিল, এবং রেলওয়ের কয়েকজন ইউরেসিয়ান কর্ম্মচারী চোট্‌পাট্‌ করিয়া আমাদের জবাব তলব করিতে আসিল। তাহাদের সহিত অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে আমরা ষ্টেশনের দিকে ছুটিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখি তিনি সর্পের ন্যায় ত্বরিত গতিতে হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহার পশ্চাতে বহুলোক দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে। তিনি এবং মৌলানা সাহেব ট্রেণে উঠিলে, ট্রেণ আবার চলিতে লাগিল।

এইরূপে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা চট্টগ্রামে আসিয়া পৌছিলাম। সমস্ত দিন মহাত্মাজীর আহার হয় নাই, অথচ সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া, যাহাতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করিতে পারি, তজ্জন্য শোভাযাত্রায় যোগ না দিয়া আমি ও প্রভুদাস অন্য এক সোজা পথে আমাদের নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থলে আসিয়া পৌছিলাম। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে অভ্যাগত নেতৃবৃন্দের একত্র বাসের স্থান হইয়াছে। সমস্ত বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থার পারিপাট্য ও কার্য্যের

শৃঙ্খলা চট্টগ্রামে দেখিলাম, সেরূপ অল্প স্থানেই দেখিয়াছি। প্রত্যেক কাজ কিরূপে হইবে, পূর্ব্ব হইতেই তাহা নির্দ্দিষ্ট এবং এক এক ব্যক্তির উপর এক এক কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে মহাত্মাজীকে লইয়া 'প্র'শেসন' কি ভাবে সংগঠিত হইবে, তাহা পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের চতুঃপার্শ্বে তখন যেন একটা স্বরাজের হাওয়া প্রবলভাবে বহিতেছিল। সকলের প্রাণে যেমন উৎসাহ তেমনই তাহাদের ত্যাগ এবং কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখা যাইতেছিল। এই উৎসাহ, অনুরাগ এবং ত্যাগ যখন সাময়িক উত্তেজনা-সাপেক্ষ না হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গ হইয়া যাইবে, তখন আর জগতে এমন কোন্ শক্তি আছে যে এই জাতিকে নির্য্যাতন করিতে পারিবে? যাহাতে ঐ সকল গুণ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে এবং যাহাতে লোকে প্রতিদিন দেশের মঙ্গল চিন্তা অভ্যাস করে এবং কিছু না কিছু দেশসেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তজ্জন্য মহাত্মাজী সকলের পক্ষে প্রতিদিন কিছু সময় সূতা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদ্‌ভিন্ন, তিনি অপর যাহা উপদেশ দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিলে দেখা যায় যে জাতীয় চরিত্র সুদৃঢ় ও কর্ম্মপটু করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

ষ্টেশন হইতে বাসায় আসিয়া আহারাদির পর মহাত্মাজী সভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেনগুপ্ত মহাশয় ও চৌদ্দজন সহকর্ম্মীর উপর গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ১১৪ ধারার নোটীশ জারি হইয়াছে। তাহা মান্য করা হইবে, কিম্বা উহা

অমান্য করিয়া অদ্যকার সভায় সকলে উপস্থিত হইবেন, এই প্রশ্ন মহাত্মাজীর নিকট উত্থাপিত হইল। মহাত্মাজী উত্তর করিলেন যে, আইন প্রথমে ভালরূপ মান্য করিতে না শিখিলে আইন ভঙ্গ করিবার অধিকার জন্মিবে না। সেজন্য সেনগুপ্ত মহাশয় ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে "ব্রহ্মচর্য্য ব্রত" পালনের ন্যায় এই আইন প্রথমে মান্য করিয়া চলিতে হইবে, ইহাই তাঁহার উপদেশ। ইহার পর মহাত্মাজী সভায় যাইবার সময় আমাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সঙ্গে করিয়া লইবার জন্য আমাকে ডাকিলেন। আমি প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখি তিনি ও মহম্মদ আলী সাহেব চলিয়া গিয়াছেন। আমি শেঠ্ যমুনালালজীর সঙ্গে দ্বিতীয় এক মোটারে অল্পক্ষণ পরে সভাস্থলে আসিয়া পৌছিলাম। কিছু বিলম্ব হইল মনে করিয়া দ্রুত সভাস্থলে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখি মহাত্মাজী প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন— "আগে যাও।" সভাভঙ্গের পর পুনরায় তিনি আমাকে ডাকিয়া "আগে যাইতে" আদেশ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে মহম্মদ আলী সাহেবকে বলিতে লাগিলেন—"After me the deluge", অর্থাৎ 'আমার পরেই প্রলয়প্লাবন'। ইহাতে মনে হইল শিলেটে আমি যে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে লোকের ভিড়ে আমার কষ্ট হয়, সেই সামান্য কথাও তিনি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

চট্টগ্রামের মোস্‌লেম্ হল্ প্রাঙ্গণে সমবেত সেই বিশাল সভার চিত্র এখনও হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সভার

প্রকাণ্ড মাঠ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সম্মুখের ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য লোক কাতারে কাতারে স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছে। মহাত্মাজীর সঙ্গে পরিভ্রমণ করিয়া এরূপ বৃহৎ, এবং ইহা অপেক্ষাও প্রকাণ্ড অনেক জনতা দেখিয়াছি; কিন্তু এই সভাস্থলে যেরূপ শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা দেখিলাম, তাহা অল্পস্থানেই দেখিয়াছি। সভার প্রারম্ভে অনেক অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল। তন্মধ্যে হিন্দী অভিনন্দন পত্রখানিতে "ইস্ শারদ প্রদোষমে শৈলকিরীটিনী সরিন্মালিনী সাগরকুন্তলা প্রকৃতিকা রম্যভূমি" ইত্যাদি শব্দবিন্যাস দ্বারা চট্টগ্রামের বর্ণনার পর যখন মহাত্মাজী ও মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হইল, তখন সেই সংস্কৃতবহুল বাঙ্গালা শব্দের উপর হিন্দী বিভক্তির প্রয়োগ দেখিয়া মহাত্মাজীর দলের লোকেরা হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আর মৌলানা মহম্মদ আলী ও আজাদ সোবানী সাহেব সেই হিন্দীর একাক্ষরও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী তাঁহার বক্তৃতাতে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, হিন্দুস্থানী ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ের ভাষা। ভাষার একতা-সূত্র দ্বারাই ভারতের হিন্দু-মুসলমানের একতা দৃঢ় করিতে হইবে। কিন্তু হিন্দু যদি স্বীয় পক্ষ সমর্থন জন্য সেই ভাষাকে সংস্কৃতবহুল করিবার চেষ্টা করেন এবং মুসলমানও সেইরূপ যদি পারসিক শব্দের অলঙ্কারে ইহাকে সজ্জিত করিতে প্রয়াসী হ'ন, তাহা হইলে ঐ একতা রক্ষা সম্ভবপর

হইবে না। সেই কারণ তিনি খাঁটি হিন্দুস্থানী প্রচলনের পক্ষপাতী। ভারতে হিন্দু-মুসলমানকে পৃথক্ পথে চলিলে চলিবে না। এক পক্ষ যদি অপর পক্ষকে উপেক্ষা করিয়া চলে তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। যদি হিন্দু মনে করেন যে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা অধিক এবং স্বরাজ লাভ হইলে পুনরায় এই দেশে হিন্দুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত। যদি মুসলমান মনে করেন যে, তিনিই অধিক পরাক্রান্ত এবং স্বরাজ হইলে পুনরায় তিনি স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিবেন, তাহা হইলে তিনিও ভ্রান্ত। ভারতের স্বরাজ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং পার্শি সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইবে, এমন কি যে সকল ইংরাজবন্ধু ভারতকে স্বদেশরূপে স্বীকার করিবেন, তাহাদেরও ভারতে তুল্য অধিকার থাকিবে। এই আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হিন্দুস্থানী ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ উপদেশ প্রদানের পর মহাত্মাজী স্বরাজ লাভের জন্য আত্মশুদ্ধি, অহিংসা এবং বিদেশী বস্ত্রবর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন।

রাত্রি দশটার পর সভাভঙ্গ হইলে মহাত্মাজী বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। চাঁদপুরের কুলী-বিভ্রাট উপলক্ষে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় রেলওয়ে ও ষ্টীমার কোম্পানীর সহিত যে ধর্ম্মঘট চলিয়াছে তৎসম্বন্ধে ধর্ম্মঘটের উদ্যোগী নেতৃবৃন্দ মহাত্মাজীর সহিত রাত্রি ১টা অবধি যুক্তি, তর্ক এবং পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুঃস্থ ও

নির্য্যাতিত কুলীদিগের উপর গবর্ণমেণ্টের ভীষণ অত্যাচারের ফলে পূর্ব্ববঙ্গে কিরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এখনও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায় নাই। তখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব দেশে এতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে ঐ অত্যাচারের প্রতিবিধানকল্পে যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই সেই আন্দোলনের অঙ্গরূপে গণ্য হইতে লাগিল। কুলীদিগের উপর অত্যাচার তিন প্রকারের :— প্রথমতঃ, চা-কোম্পানীরা অন্যায়রূপে কুলীদিগের পারিশ্রমিকের পরিমাণ কমাইয়া দেয়; দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের গুর্খা দ্বারা তাহারা কুলীদিগের উপর অত্যাচার করে; তৃতীয়তঃ, ষ্টীমার কোম্পানী বিনা ভাড়ায় কুলীদিগকে নদী পার করিতে অস্বীকার করে। এস্থলে চা-বাগিচার উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিবার সামর্থ্য নেতৃবর্গের ছিল না, ইহা সহজেই অনুমিত হইবে। এক অসহযোগ ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের সহিত লড়াই করিবার অন্য কোন নূতন পন্থা কেহ বাহির করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় কংগ্রেসের স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তারা রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর সহিত দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিয়া দিলেন ও ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিলেন। তাহার ফলে রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর সাময়িক ক্ষতি বিস্তর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল কোম্পানীর পক্ষ অবলম্বন করিল, তখন উহারা ক্রমশঃ নূতন বল সঞ্চয় করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট যখন কোম্পানী গুলির সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন কংগ্রেস যদি ধর্ম্মঘটকারীদের পক্ষাব-

লম্বন না করে, তাহা হইলে ধর্ম্মঘট কতদিন রক্ষা পাইবে বলা যায় না। কংগ্রেসের স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তারা এই ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এখন ধর্ম্মঘট রক্ষাই তাঁহাদিগের একমাত্র কাজ হইয়া পড়িয়াছে। কোম্পানীর পক্ষ হইতে মিট্‌মাটের যে সমস্ত সর্ত্ত উপস্থিত হইতেছিল, তাহা একটু ক্ষতি স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিলে মিট্‌মাট্‌ হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা করিলে কংগ্রেসপক্ষকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। সেজন্য সকলে মহাত্মাজীর মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, এবং সেই ধর্ম্মঘট যাহাতে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গীভূত করিয়া ল'ন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। স্থানীয় নেতৃবর্গের উপর যেরূপ দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া মহাত্মাজী তাঁহা-দের সহিত বিশেষভাবে সহানুভূতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই ধর্ম্মঘট ব্যাপার লইয়া এ অঞ্চলে মহাত্মাজীর মূল আন্দোলন অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না দেখিয়া মহাত্মাজী ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। যদি বা ধর্ম্মঘটের জয় হয় তাহা হইলে সমগ্রভাবে দেশের কি বিশেষ লাভ হইবে? পক্ষান্তরে কোম্পানীরা যদি তাহাদের অবিবেচনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং কোন প্রকার শাস্তি না দিয়া কর্ম্মচারিবর্গকে তাহাদিগের পূর্ব্বের পদে বহাল রাখে এবং ষ্টীমার কোম্পানী কুলীদিগকে নদী পারের জন্য যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছে তাহা যদি প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলেই বা স্বরাজ লাভের কি সহায়তা হইবে? অসহযোগের দ্বারা

মহাত্মাজী গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের এই ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীকে শিখণ্ডীর ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিবার সুযোগ পাইয়া গবর্ণমেণ্টের আত্মরক্ষার সুবিধা হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মঘটকারিগণ যদ্যপি কোম্পানীর কাজে ফিরিয়া না যা'ন, তাহা হইলে তাঁহারা কি প্রকার উপজীবিকা অবলম্বন করিবেন, ইহাও এক সমস্যা হইয়াছে। মহাত্মাজী সমস্ত কথা শুনিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, বাস্তবিক যদি নির্য্যাতিত কুলীদিগের প্রতি সহানুভূতি স্বরূপ ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যতদিন গবর্ণমেণ্ট অনুতাপ প্রকাশ এবং ষ্টীমার কোম্পানী কুলীদিগকে পার করিতে যে অর্থ লইয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ না করে, ততদিন কোন ধর্ম্মঘটকারীর পক্ষে পুনরায় কোম্পানীর চাকরী স্বীকার উচিত হইবে না। ঐ ক্ষেত্রে কোম্পানীর সহিত অসহযোগই প্রত্যেক সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক হইবে, এবং তাহা হইলেই ধর্ম্মঘটকারিগণ আনন্দের সহিত সকলপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে সক্ষম হইবেন। যাঁহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া চিরকালের জন্য কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগের জন্য একটী 'কলনি' (Colony) প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে চরকা ও তাঁতের কারখানা স্থাপন আবশ্যক হইবে। রাত্রিতে নেতাদের সহিত পরামর্শ ও বিচারের পর মহাত্মাজী পরদিবস ধর্ম্মঘটকারীদের সভায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি ঐ ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে

কোন মত প্রকাশ করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে তিনি এই ধর্ম্মঘট সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা অবগত ছিলেন না। চট্টগ্রামে আসিয়া তিনি প্রথম শুনিলেন যে, চাঁদপুরে কুলীদিগের উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদস্বরূপ এই ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সহানুভূতি প্রকাশ ব্যতীত ধর্ম্মঘটকারিগণের কোন স্বার্থ-উদ্দেশ্য নাই। পরের দুঃখে সহানুভূতি করিয়া নিজের জীবিকার উপায় এত সহজে প্রত্যাখ্যান করিতে এই শ্রেণীর লোককে তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। অতএব বাস্তবিক যদি সহানুভূতির ফলস্বরূপ এই ধর্ম্মঘটের উদ্‌ভব হইয়া থাকে, তবে তিনি ধর্ম্মঘট-কারীদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিবেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু এবং তাঁহাদের কার্য্য বড়ই প্রশংসার্হ, এবং যতদিন না সেই অত্যাচারের প্রতিকার হয়, ততদিন তাঁহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা যদি কংগ্রেসের অর্থ-সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মঘট রক্ষা করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহা-দিগের ত্যাগের মহিমা অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়া যাইবে। সেজন্য সকলে কংগ্রেস কমিটীর দানের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের নিজের হাত পায়ের সুব্যবহার দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবেন, ইহাই তাঁহার উপদেশ; এবং চরকা ও তাঁতের ব্যবসা অবলম্বন করিলে তাহা সহজেই হইতে পারিবে ইহাও তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। ধর্ম্মঘটকারীদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্বের কার্য্যে ফিরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে তিনি সকলকে উপদেশ দিলেন।

বলিলেন যে ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪০ সহস্র শ্রমজীবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মঘট পরিচালন করিয়াছিলেন। তাহাতে দশ সহস্র লোককে কারাবাস এবং অনেককে প্রহার যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সত্য এবং ন্যায় অবলম্বন এবং শান্তি রক্ষা করিয়া অবশেষে তাহারা জয়ী হইতে পারিয়াছিল। সেজন্য তিনি ধর্ম্মঘটকারীদিগকে বিশেষভাবে অহিংসা পালন ও শান্তি রক্ষার উপদেশ প্রদান করিয়া বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন।

১লা সেপ্টেম্বর সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ অসহযোগী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে স্থানীয় সারস্বত আশ্রমের বালক-বৃন্দ সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি করিতে করিতে মহাত্মাজীর আবাস-স্থলে আসিয়া আশ্রমবাসীর অভিনন্দন-পত্র এবং আশ্রমে প্রস্তুত একটী চরকা মহাত্মাজীকে প্রদান করিল। তাহার পর সমস্ত দিন সভার উপর সভা চলিতে লাগিল। প্রথম ধর্ম্মঘটকারী-দিগের সভা, তাহার পর স্ত্রীলোকদিগের সভা, খিলাফৎ সভা, চট্টগ্রাম বণিক্ সমিতির সভা, এইরূপ বহু সভায় মহাত্মাজীকে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। এতদ্‌ভিন্ন তিনি একবার নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামে মহাত্মাজীর প্রকৃতির এক নূতন পরিচয় পাইলাম। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় ধীর এবং স্থিরভাবে বসিয়া কাজ করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু এখানে এক সভার পর অপর সভায় যেরূপ তৎপরতার সহিত

সভাকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার দ্রুত কার্য্য-পরিচালনার অসাধারণ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম। সমস্ত দিন এই প্রকার অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার ট্রেণে তিনি বরিশাল যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

বরিশাল

চট্টগ্রাম হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত রেলে ১লা সেপ্টেম্বর সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া মহাত্মাজী ২রা সেপ্টেম্বর প্রাতে চাঁদপুরঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। এখানে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের একটি শাখার শেষ হইয়াছে। চাঁদপুর হইতে ষ্টীমারে বরিশাল যাইতে হইবে। সুবিশাল মেঘনা নদীর তীরে চাঁদপুর সহর। জুন মাসে চা-বাগিচার কুলীরা আসাম হইতে নামিয়া আসিয়া সম্মুখে আর পথ না পাইয়া এখানে মেঘনার তীরে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই ষ্টেশনে তাহাদের উপর গুর্খা সিপাহীরা গভর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে অত্যাচার করিয়াছিল। যে স্থানে গুর্খারা কুলীদিগকে সেই ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, মহাত্মাজীকে সেই স্থান দেখান হইল। অতঃপর ষ্টীমারের ৩।৪ ঘণ্টা বিলম্ব আছে দেখিয়া চাঁদপুরের উদ্যোগী নেতৃবৃন্দ মহাত্মাজীকে লইয়া সহরের দুই স্থানে সভা করিলেন, এবং চাঁদপুরের রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ও তিনি পরিদর্শন করিলেন। এই বিদ্যালয় স্বদেশীযুগে স্থাপিত হইয়া চাঁদপুরের প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে, এবং বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে নবজীবন লাভ করিয়াছে।

চাঁদপুর আমার জন্মভূমি। আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রাধামাধব সিংহ রায় মহাশয় চাঁদপুরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং জাতীয় সংগঠনকার্য্যে সর্ব্বদা অগ্রণী। বিনা আড়ম্বরে তিনি বহুকাল যেরূপ লোকসেবায় এবং দেশের কল্যাণপ্রদ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহার প্রেরণাতেই আমি বাল্যকাল অবধি জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। ৩।৪ ঘণ্টা চাঁদপুরে থাকিতে হইবে জানিয়া আমি মহাত্মাজীর অনুমতি লইয়া পিতা-মাতার চরণ দর্শন করিয়া আসিলাম।

চাঁদপুর হইতে বরিশাল যাইবার ষ্টীমারের পথ আমাদের সকলের নিকট বড় মনোরম বোধ হইল। চারিদিকে অসংখ্য নদী এবং যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল নদীর জল দেখা যাইতেছিল। তাহার মধ্যে উর্ব্বরা ধরিত্রী ফলশস্যে সুশোভিতা হইয়া স্বীয় সুনীল কান্তিতে নয়ন স্নিগ্ধ করিতেছিল। জলস্থলের এরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ও সমাবেশ ভারতে অন্য কোথায়ও আছে কিনা জানি না। নদীর মন্দ, মধুর ও পবিত্র বায়ুর সংস্পর্শে আমাদের সকলের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইতে লাগিল। চট্টগ্রাম অবস্থানের দিন মহাত্মাজীকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; সেজন্য তিনি ষ্টীমারের উন্মুক্ত ও সুশীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে কিছুক্ষণ নিদ্রা গিয়া শ্রান্তি অপনোদন করিলেন। তাহার পর ষ্টীমার যখন স্থানে স্থানে কূলে আসিয়া লাগিল তখন যে সকল স্থানীয় লোক তাঁহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার দর্শনার্থ তীরে সমবেত হইয়াছিল, তিনি উপরের ডেক হইতে

দাঁড়াইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ ও ব্যবহার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বৈকাল ৫টার সময় ষ্টীমার বরিশাল পৌঁছিল। এখানে ষ্টীমার ঘাট পুলিশ প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। উহাদিগের প্রত্যেকের হাতে একটী সুদীর্ঘ লাঠি; এবং উহাদের বেশ যেমন উগ্রতা-ব্যঞ্জক, ব্যবহারও সেইরূপ উগ্র বোধ হইতে লাগিল। প্রহরীদের বেষ্টনীর বাহিরে বরিশালের জনসাধারণ সমবেত হইয়া মহাত্মাজী এবং তাঁহার সঙ্গীয় নেতৃবৃন্দকে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া গেলেন। 'প্রোসেশন' চলিয়া গেলে এবং জনতার হ্রাস হইলে যমুনাদাসজী, প্রভুদাস হিরোয়ে, মৌলানা মহাম্মদ আলী সাহেবের সেক্রেটারী, মিঃ হায়াৎ, পরশুরামজী ও আমি আমাদের মালপত্র লইয়া অন্যপথ দিয়া আবাসস্থলে পৌঁছিলাম।

চট্টগ্রামে রেলওয়ে ধর্ম্মঘট ব্যাপার যে প্রকার সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং তাহাতেই লোকের সমস্ত সময়, পরিশ্রম, অর্থ এবং বুদ্ধি ব্যয় হইতেছিল, সেইরূপ বরিশালেও কতকগুলি সমস্যা অপূর্ণ রহিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে বরিশাল বাঙ্গলার এক তীর্থভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রভাবে বরিশালে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে, এবং চাঁদপুরের কুলী-বিভ্রাট লইয়া ষ্টীমার কোম্পানীর সঙ্গে যে ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি হয় তাহা বরিশালে তখন পর্য্যন্ত রক্ষিত হইতেছিল। শিলেটে অবস্থান কালে মহাত্মাজী বরিশাল হইতে

একখানা পত্র পাইয়াছিলেন। বরিশাল আসিবার পথে ষ্টীমার কোম্পানীর জাহাজ ব্যবহার না করিয়া তিনি ধর্ম্মঘটের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, এই অনুরোধ তাহাতে করা হইয়াছিল। পত্রখানা পাইয়া, ধর্ম্মঘটের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার কিছু জানা আছে কি না, এবং ষ্টীমার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে বরিশাল যাওয়া যায় কি না, তাহা আমাকে মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

ষ্টীমারের ধর্ম্মঘট ব্যতীত বরিশালে বহুবার ঘন ঘন 'হরতাল' হইয়া গিয়াছে, এবং সেই সময় অসহযোগীরা গভর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের রসদ বন্ধ করাতে ইহাদিগকে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, এরূপ কথা মহাত্মাজী বরিশালে আসিয়া শুনিতে পাইলেন। ঐ কারণ অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এখানে এক 'ডিষ্ট্রিক্ট প্রপোগেণ্ডা সমিতি' স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সমিতির পক্ষ হইতে একজন মুসলমান যুবক মহাত্মাজীর আবাসস্থলে দেখা করিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, খিলাফৎ আন্দোলনের কোন ভিত্তি নাই এবং ইংরাজ ও মিত্রশক্তি সমূহের সহিত তুরস্কের যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ঐ যুবকের তর্ক করিবার আগ্রহ দেখিয়া মহাত্মাজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার মতের পক্ষে কোন মুসলমান উলমার সম্মতি আছে কি না, অথবা তিনি তাঁহার নিজের বুদ্ধি হইতেই ঐ উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। তাহাতে সেই যুবক বিহার প্রান্তের এক প্রসিদ্ধ মৌলানার নাম করিলেন; কিন্তু মহাত্মাজী তখন বলিয়া দিলেন যে, উক্ত মৌলানা এখন

খিলাফৎ আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়াছেন। যুবক চলিয়া যাইবার সময় মহাত্মাজীর নিকট অভয় প্রার্থনা করিল, যেন স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁহার উপর অত্যাচার না করে। ইহার পর সভাস্থলে মহাত্মাজীর বক্তৃতার সময় অপর দুইজন মুসলমান অভিযোগ করিলেন যে অসহযোগের সহিত সহানুভূতি নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে নানারূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। এতদ্‌ভিন্ন 'ডিষ্ট্রিক্ট প্রপোগেণ্ডা সমিতি'র পক্ষ হইতে অনেক অভিযোগের পত্র মহাত্মাজীর নিকট আসিল। সাধারণের বিশ্বাস যে, এই সমিতি গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যেই জীবিত এবং ইহার ভিতর অনেক কৃত্রিম ব্যাপার আছে।

বরিশালের স্বেচ্ছাসেবকদিগের যে প্রকার সঙ্ঘবদ্ধতা এবং কাজের শৃঙ্খলার প্রমাণ পাইলাম এরূপ আর কোথাও পাই নাই। মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে প্রতিযোগিতায় বরিশাল চট্টগ্রামকেও পরাস্থ করিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় স্বেচ্ছাসেবকেরা তালে তালে পা ফেলিয়া সিপাহীর ন্যায় পাহারা দিতেছে দেখিয়াছি। স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে একজন বহুবার মহাত্মাজীর সহিত গোপনে কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া একবার সুবিধা পাইয়া তাঁহাকে বলিয়া গেল যে, বরিশালের বহু স্বেচ্ছাসেবক শান্তির পথ অপেক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ও দাঙ্গাফেসাদের পক্ষপাতী। ইহা কতদূর সত্য তাহা বরিশালে একদিন মাত্র অবস্থান করিয়া বুঝা সম্ভব নহে। কিন্তু বরিশাল প্রবেশ এবং বরিশাল হইতে প্রস্থানের সময় ষ্টীমার ঘাটে পুলিশ প্রহরীদিগের

যেরূপ উগ্রতা, দৃঢ়তা এবং ব্যূহরচনা দেখিয়াছি, এরূপ অন্য কোন স্থানে দেখি নাই। তাহাতে মনে প্রশ্ন হইল, এখানকার স্বেচ্ছা-সেবকদিগের প্রতিচ্ছায়া কি রাজকর্ম্মচারীদিগের চিত্তে প্রতিফলিত হইয়াছে?

এতদ্‌ভিন্ন, বরিশালে তৃতীয় প্রকারের এক অভিনব সমস্যা মহাত্মাজীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বরিশালের বহু গণিকা কংগ্রেসের চাঁদা দিয়া সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, এবং তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারে অর্থদান করিয়াছে। কংগ্রেসের কর্ম্মচারী হইবার অধিকার তাহাদিগের আছে কিনা তাহা তাহারা জানিতে চাহিল, এবং মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। কংগ্রেস সম্বন্ধে তাহাদের প্রস্তাব শুনিয়া মহাত্মাজী প্রথমে একটু উন্মনা ছিলেন। তাহার পর বলিলেন—"বরিশাল ক্ষুদ্র সহর, এখানে আর কয়জন বেশ্যা আছে? যদি ৮।১০ জন থাকে, তবে একটা সময় করিয়া তাহাদিগকে আসিতে বলা যাইতে পারে।" কিন্তু যে ব্যক্তি বেশ্যাদের পত্র লইয়া আসিয়া-ছিলেন, তিনি বলিলেন যে ৩৫০ ঘর বেশ্যা এই সহরে বাস করিতেছে। তাহা শুনিয়া মহাত্মাজী চমকিত হইয়া দৃঢ়তা সহকারে "Shame, Shame on Barisal" (ধিক্, বরিশালকে ধিক্) এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অতঃপর একটু চিন্তা করিয়া তিনি বেশ্যাদিগের উপস্থিতির একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

এই সমস্ত আলোচনা শেষ হইলে সভাস্থলে যাইয়া মহাত্মাজী

বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে স্বরাজের জন্য অহিংসা (Non-violence), হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি এবং স্বদেশী ব্রতপালন, এই তিন সর্ত্ত পূরণের প্রয়োজনীয়তা প্রথমে তিনি বুঝাইয়া দিলেন। অহিংসা সম্বন্ধে বলিলেন যে, যদ্যপি গভর্ণমেণ্ট পাগল হইয়া আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, তথাপি মালাবারের মোপলাদিগের ন্যায় কাহার যেন মাথা খারাপ না হয়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি-স্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইতে গিয়া বলিলেন যে, যতদিন হিন্দু ও মুসলমান দুই বিরুদ্ধ দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরে বিবাদ করিতে থাকিবে, ততদিন ভারতে স্বরাজ লাভ অসম্ভব। তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। তাহাদিগের যোগ প্রাণের যোগ হইতে হইবে। নতুবা, যদি কেবল মুখে প্রীতির ভাণ করিয়া হৃদয়ে বিষ পোষণ করা হয়, তবে সেই প্রীতি দুই দিনও স্থায়ী হইবে না। এরূপ মৌখিক প্রীতি ঘোষণা করিয়া আমরা "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার দ্বারা নাটক অভিনয় করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের 'নাটকীয়' স্বরাজই লাভ হইবে, আসল বস্তু কিছুই মিলিবে না। স্বদেশী সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিলেন—তাঁহার বড়ই দুঃখ যে আজ বাঙ্গলায় আসিয়া তাঁহাকে স্বদেশী প্রচার করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গলার স্বদেশী যুগের স্বদেশী হইতে বিভিন্ন। তখন স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী স্বীয় বস্ত্রের জন্য বোম্বাই ও আমেদাবাদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতেই গত বারের আন্দোলন

কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কিন্তু এবার নিজেকে সূতা কাটিয়া বস্ত্র বয়ন করাইয়া লইতে হইবে। এইরূপ না হইলে এই আন্দোলনও বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যর্থ হইবে। এবার সকলকে মজুর হইতে হইবে। বাঙ্গালীজাতি সৌখীন এবং শারীরিক পরিশ্রমে অপটু হইয়া পড়িয়াছে। মোটা কাপড় পরিতে বাঙ্গালী ভয় পায়। কিন্তু এই সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর পক্ষে স্বরাজ লাভ দুর্ঘট হইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

স্বরাজ সাধনের তিন প্রধান সর্ত্তের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া মহাত্মাজী 'ডিষ্ট্রিক্ট প্রপোগেণ্ডা সমিতি'র কতিপয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। প্রশ্নগুলি মুদ্রিত করিয়া সমিতির পক্ষ হইতে মহাত্মাজীর নিকট পাঠান হইয়াছিল, অথচ সমিতির পরিচালকবর্গের নাম ধাম কিছুই উহাতে ছিল না। মহাত্মাজী পূর্ব্ব বাঙ্গলায় রেল ও ষ্টীমার সম্পর্কিত ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ সেই ধর্ম্মঘট রক্ষার জন্য কংগ্রেসের অর্থব্যয় হইতেছে, তাহাতে কেন তিনি বাধা দিতেছেন না,—ইহাই এক প্রশ্ন। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, যে কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা কোন নেতার কারাবাসের প্রতিবাদস্বরূপ ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হইলে তিনি সেই ধর্ম্মঘট সমর্থন করিতে পারেন না। কিন্তু স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে কিম্বা অসহযোগ আন্দোলনের সুবিধার জন্য, যদি ধর্ম্মঘটের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি সেই ধর্ম্মঘট অনুমোদন করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান ধর্ম্মঘটের ফলে অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষতি হইয়াছে, ইহাই

তিনি মনে করেন ; সেই জন্য ইহার প্রতিকূলে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ধর্ম্মঘট পন্থার বিরুদ্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই।

"প্রপোগেণ্ডা সমিতি"র দ্বিতীয় প্রশ্নে অসহযোগী ছাত্রদের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করা হইল। তাহারা অত্যন্ত অসংযত হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে সকল ছাত্রেরা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে নাই, তাহাদিগকে তাহারা গালাগালি ও ভয়প্রদর্শন করিয়া থাকে। সেই জন্য সমিতি প্রশ্ন করিতেছেন যে, তাহাদিগকে সুসংযত করিবার জন্য এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবিকা-অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজী কি উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া রাখিয়াছেন ? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন—যদি কোন অসহযোগী অসংযত হইয়া অপরকে অপমান বা ভয়প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তবে তিনি অসহযোগী হইবার উপযুক্ত নহেন, কারণ অসহযোগের আদি অক্ষর তাঁহার এখনও শিক্ষা হয় নাই। সেই শ্রেণীর যুবক দ্বারা এই আন্দোলনের কোন সহায়তা হইবে না। তাহাকে তিনি স্কুল-কলেজে যাইয়া পুনরায় দাসত্বের পাঠ অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিতেছেন, কারণ ঐরূপ শিক্ষাই তাহার পক্ষে উপযোগী। যুবকদের জীবিকা সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিলেন, তিনি নিজে ভগবান নহেন যে সমস্ত বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহার বিশ্বাস যে ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কোন বালকের ভরণ-পোষণের জন্য তাহার পিতামাতাও দায়ী নহেন। সেই বয়স হইতেই তাহার স্বাবলম্বন শিক্ষা দরকার। তিনি নিজের পুত্র-

দিগের জন্য নিজেকে এখন দায়ী মনে করেন না। সকলকে পরিশ্রম করিয়া নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ও বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে। এই শক্তি উদ্‌ভূত না হইলে স্বরাজ লাভ এবং স্বরাজ রক্ষা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বলিলেন যে, শক্তিশালী বৃক্ষের বীজ প্রস্তরময় জমিতে নিক্ষিপ্ত হইলে, সেখানেও তাহা অঙ্কুরিত হয়। সেই কারণ তাঁহার বিশ্বাস যে যাহারা এই আন্দোলনের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা নিজেরাই জীবিকার পন্থা উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিবে। বর্ত্তমানে তিনি মনে করেন যে, যে সকল যুবক স্বরাজপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিয়া অসহযোগ অবলম্বন করিয়াছে, প্রত্যহ ৮।৯ ঘণ্টা কাল স্বরাজ লাভের প্রধান অস্ত্র চরকা ও তাঁতের ব্যবহার তাহাদিগের পক্ষে আবশ্যক। সেই উপায়ে তাহাদিগের ভরণ-পোষণ হইয়া যাইবে এবং শ্রীভগবান্ তাহাদের সদুদ্দেশ্য ও সৎকার্য্যের প্রতি শুভদৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগের সহায়তা করিবেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইহার পর বরিশালের হরতাল সম্বন্ধে দুই তিনটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া স্বদেশী সম্বন্ধে 'প্রপোগেণ্ডা সমিতি'র যে প্রশ্ন ছিল তাহারই তিনি উত্তর করিলেন। সমিতির প্রশ্ন ছিল যে, বোম্বাই অঞ্চলের কাপড়ের কলের স্বত্বাধিকারীরা স্বদেশীর হুজুগ তুলিয়া স্বার্থসিদ্ধির আশায় তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারে কত টাকা দিয়াছে? দ্বিতীয়তঃ, মহাত্মাজী বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন-নীতি প্রচার করিতেছেন, কিন্তু ভারতবাসীর অভাবের অনুরূপ বস্ত্রসংস্থান

কি ভারতে আছে? তৃতীয়তঃ, ঐ নীতির প্রভাবে যদ্যপি ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা কি মহাত্মাজী চিন্তা করিয়াছেন?

মহাত্মাজী উত্তরে বলিলেন যে প্রশ্নের প্রথমাংশে বোম্বাইয়ের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে যে শ্লেষোক্তি হইয়াছে তাহার কোন ভিত্তি নাই, এবং অন্যায়রূপে ঐ ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাঁহারা "তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারে" অধিক অর্থ দেন নাই। এই আন্দোলনের দ্বারা তাঁহাদিগের স্বার্থসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ সকল প্রদেশের অধিবাসিবর্গকে নিজ নিজ প্রদেশের বস্ত্র উৎপন্ন করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশী হইতে হইলে বরিশাল বম্বের বস্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের বস্ত্র নিজেই তৈয়ার করিয়া লইবে। তাঁহার বড়ই আক্ষেপ যে, বরিশালে বিশ সহস্র অধিবাসী, অথচ মাত্র দুই শত চরকার প্রচলন হইয়াছে। তাঁহার ইহাই প্রত্যাশা যে, অন্ততঃ চারি সহস্র চরকা এবং এক সহস্র তাঁত এই সহরে বসিবে; তাহা হইলে বরিশালকে বস্ত্রের জন্য বম্বের বা আমেদাবাদের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না।

প্রশ্নের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশ বিচার করিবার পূর্ব্বেই মহাত্মাজী বলিলেন যে, এরূপ প্রশ্ন শুনিলে তাঁহার বড়ই দুঃখ হয়, কারণ তাঁহার বিশ্বাস, কেবল সত্যকে প্রচ্ছাদিত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ বাক্যজালের অবতারণা হইয়া থাকে। তিনি বৈদেশিক বাণিজ্যের বিরোধী নহেন। বিদেশ হইতে কাঁচের

জিনিষ ও লোহার কলকব্জা আমদানী করা যাইতে পারে। কিন্তু শরীরের প্রাণবায়ু যেমন বাহির হইতে গ্রহণ করা যায় না, ভারতেও সেইরূপ বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানী করা যাইতে পারে না। অতঃপর তেজোময়ী ভাষায় তিনি বলিতে লাগিলেন—"দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যখন ইংরাজ আধিপত্য ছিল না, তখন ভারত কাহার সাহায্যে লজ্জা নিবারণ করিয়াছিল? তখন যদি নিজের বস্ত্র ভারত নিজেই প্রস্তুত করিয়া থাকে, তবে আজ কে তাহাকে সেই কার্য্যে বাধা দিতেছে? দেশে যত গম উৎপন্ন হয়, তাহা পিষিয়া ময়দা করিবার জন্য কি উহা বিদেশে পাঠাইয়া দিতে হইবে, এবং বিদেশ হইতে বিস্কুট প্রস্তুত হইয়া আসিলে কি দেশের লোক তাহা খাইয়া জীবনধারণ করিবে? যদি লোকের প্রকৃতি এরূপ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই জাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। বস্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা। তুলা এখানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বস্ত্র প্রস্তুতের নিমিত্ত তাহা আমরা বিদেশে পাঠাইয়া দেই। আমাদের অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, মনুষ্যত্ব সমস্তই হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেইজন্য চরকা ও তাঁতের কাজ এখন আমাদের কষ্টসাধ্য মনে হইতেছে। কিন্তু ইহার ফলে দিন দিন দেশের কিরূপ অধোগতি হইতেছে তাহা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি না। ক্রমে ক্রমে যদ্যপি স্ত্রীলোকেরা রন্ধনকার্য্য কষ্টদায়ক মনে করিয়া হোটেলে ভোজন পছন্দ করিতে থাকেন, তাহা হইলে বুঝিব, এই দেশ ধর্ম্ম হারাইতে বসিয়াছে এবং স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পরিশ্রম করিবার জন্য ভগবান্ মানুষের হাত পা দিয়াছেন। যদি লোকে তাহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে প্রতিফল-স্বরূপ অবশ্যই তাহাদিগকে ধর্ম্ম হারাইতে হইবে। আমি অনেকবার একথা বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, এই দেশে চাষের কাজ এবং চরকা ও তাঁতের কাজ জাতীয় শরীরের দুই ফুস্‌ফুস্ সদৃশ। যদ্যপি সেই দুই ফুস্‌ফুসের রক্ষা-কল্পে যত্নবান্ না হই, পরন্তু যদ্যপি অযত্নে একটী ফুস্‌ফুস্ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে এই জাতি অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারিবে না।”

সমিতির শেষ প্রশ্ন দ্বারা মহাত্মাজীর নিকট এই অভিযোগ উপস্থিত করা হইল যে, যে সকল লোক তাঁহার নামে জয়ধ্বনি ও চীৎকার করিয়া থাকে, তাহারাই বরিশালে উপর্য্যুপরি হরতাল অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে অসামান্য উদ্‌বেগ প্রদান করিয়াছে। তিনি তাঁহার নামের জয়ধ্বনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী আবেগভরে বলিতে লাগিলেন—“আমি যখন আমার নামে জয়ধ্বনি শুনি, তখন মনে হয় যেন শ্রবণমাত্র প্রত্যেক ধ্বনি এক একটী শেলের ন্যায় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। যদি বুঝিতাম এইরূপ জয়ধ্বনি করিলে তোমাদের স্বরাজ লাভ হইবে তাহা হইলে আমি ঐ ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন দেখি লোকের সমস্ত শক্তি এবং সময় কেবল অযথা চীৎকারে ব্যয়িত হইয়া কাজের ক্ষতি করিতেছে, তখন মনে হয় ঐরূপ জয়ধ্বনি না করিয়া যদি তাহারা চিতানল প্রজ্জ্বলিত

করিত, তাহা হইলে তাহাতে প্রবেশ করিয়া আমি হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাপিত করিতে পারিতাম।"

এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া তিনি অধিক রাত্রিতে আবাসে প্রত্যাগত হইলেন।

দোতালার যে কক্ষটী মহাত্মাজীর জন্য এখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে যাইতে হইলে আমাদের ঘরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় কিয়ৎক্ষণ তিনি সম্মুখের ছাদে যাইয়া বসিয়াছেন। এমন সময় দেখিলাম একজন স্ত্রীলোক আমাদের ঘরের মধ্য দিয়া ছাদের উপর যাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পর ক্রমশঃই দলে দলে বহু স্ত্রীলোক সেই দিকে যাইতে লাগিল। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক তাহাদিগকে ছাদের উপর পৌছাইয়া দিয়া কি কথাবার্ত্তা হয় শুনিবার জন্য সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি ("go, go, all of you must go") অর্থাৎ "যাও, যাও, তোমরা কেহই এখানে থাকিতে পারিবে না" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন শুনিয়া স্বেচ্ছাসেবক সকলেই চলিয়া আসিল। আমি এবং হিরোয়ে পার্শ্বের ঘরে ছিলাম, তিনি তাহা পছন্দ করিবেন কি না বুঝিতে না পারিয়া আমরাও নীচের তলায় চলিয়া আসিলাম। সেখানে যাইয়া শেঠ্ যমুনা-লালজীর নিকট শুনিলাম, বরিশালের যে সকল গণিকারা মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় নির্দ্ধারণের জন্য পত্র লিখিয়াছিল, তাহারাই রাত্রিতে দেখা করিতে আসিয়াছে। প্রায়

দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত কথা কহিয়া তাহারা নামিয়া আসিল, এবং কেহ কেহ অগ্রসর হইয়া যমুনালালজীকে প্রণাম করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া তখন মনে হইল যেন তাহাদিগের হৃদয় ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। বরিশালের এই পতিতা স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ মহাত্মাজী "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে বরিশালের অনুপাতে হিসাব করিলে সমগ্র ভারতে পতিতা স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা দশলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইবে। ইহারা যদি পাপপথ হইতে বিরত হইয়া ভারতের মঙ্গল কামনায় সন্ন্যাসিনী হয় এবং জীবিকাস্বরূপ চরকা ও তাঁতের কাজ অবলম্বন করে, তাহা হইলে প্রতি জনের এক টাকা দৈনিক আয়ের অনুপাতে প্রত্যেক দিন দশলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ভারতের আয় হইতে পারে। কিন্তু ইহাদিগের উদ্ধারের দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে ? বরিশালে যাহারা এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছিলেন, মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া দিলেন যে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহ যেন এইরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সহসা অগ্রসর না হন।

পরদিন (৩রা সেপ্টেম্বর) বৈকালে মহাত্মাজী বরিশাল হইতে যাত্রা করিলেন। বরিশালে আসিয়া পঞ্চম দিবসে তিনি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত প্রথম, এবং বরিশাল হইতে প্রস্থানের দিন দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

বরিশালের রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ও বয়নাগারের চরকা ও তাঁতের কাজের সুব্যবস্থা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত ব্যবসায়ীদিগের সভা, স্ত্রীলোকদিগের সভা, ধর্ম্মঘটকারীদের সভা, কংগ্রেসের কর্ম্মি-বৃন্দের সভা, খিলাফৎ সভা ও স্বেচ্ছা-সেবকদিগের সভাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করিতে হইয়াছিল। চট্টগ্রামে ধর্ম্মঘটকারী-দিগকে তিনি যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ দিলেন। কংগ্রেসের কর্ম্মিবৃন্দকে বলিলেন যে, খদ্দর প্রস্তুত এবং খদ্দর সরবরাহ করা এখন তাঁহাদের প্রধান কার্য্য হইবে এবং এই খদ্দরের কারবার লইয়া তাঁহারা দ্বিতীয় এক "ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" সংগঠন করিতে সমর্থ হউন, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বলিলেন যে, বরিশালে তাহাদের যেরূপ কার্য্যশৃঙ্খলা দেখিলেন এরূপ প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু তিনি শুনিয়াছেন যে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিংস পন্থার পক্ষপাতী নহে। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে অহিংসার পথ হইতে এক চুল স্খলিত হইলে এই আন্দোলন মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহাত্মাজী বরিশাল হইতে খুলনা যাইবার ষ্টীমারে উঠিলেন। ষ্টীমারে খুব ভিড়, এবং সকল লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। সেই কারণ তিনি এবং মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব উপরের ডেক হইতে নামিয়া আসিয়া ভিড়ের মধ্যে একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া গেলেন। ষ্টীমারে সমস্ত রাত্রি

যাপন করিয়া প্রাতঃকালে আমরা খুলনা পৌঁছিলাম। খুলনা ষ্টেশনের বাহিরে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। দম্‌দম্ ষ্টেশনে শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া মহাত্মাজী, মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব, বেগম সাহেবা এবং মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেবকে মোটার যানে কলিকাতা লইয়া গেলেন। আমরা (৪ঠা সেপ্টেম্বর) বেলা প্রায় ১১টার সময় শেয়ালদা পৌঁছিয়া দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার অতিথি হইলাম।
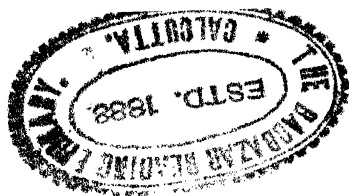
সপ্তদশ অধ্যায়

কলিকাতা

(১)

১৭ই অগাষ্ট কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া আসাম ও পূর্ব্ব বাঙ্গলা পরিভ্রমণের পর মহাত্মাজী ৪ঠা সেপ্টেম্বর সদলবলে কলিকাতা প্রত্যাগত হইলেন। এই ১৬ দিনের পথশ্রমে, অনিদ্রায় এবং আহার-বিহারের অনিয়মে আমরা সকলেই কিছু না কিছু কাতর হইয়া পড়িয়াছি। বেগম মহম্মদ আলী সাহেবা যে ভাবে এই ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি সর্ব্বদা পর্দ্দার অন্তরালে থাকিতেন এবং লোকের সম্মুখে আসিতে হইলে আপাদমস্তক তাঁহাকে মোটা খদ্দরে আবৃত রাখিতে হইত। পূর্ব্ববঙ্গের সেই ভাদ্র মাসের রৌদ্রের প্রচণ্ডতা স্মরণ করিলে সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন, ইহাতে তাঁহার কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল। তাহার উপর ট্রেণে-ষ্টীমারে চলাফেরার যে সামান্য স্বাধীনতা পুরুষদিগের ছিল, বেগম সাহেবার তাহাও ছিল না। কিন্তু তিনি কোনরূপ ক্লেশ-স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব বাঙ্গলার জলবায়ুর প্রভাবে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। মুসলমান শাস্ত্রে মৌলানা সাহেবের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, এবং তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মচর্চ্চাতেই কালাতিপাত করিতে ভালবাসিতেন,

সেজন্য নিজের জিনিষপত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। সঙ্গে মাত্র একটি ট্রাঙ্ক, তাহা বন্ধ করিবার তালা চাবিও ছিল না। মহম্মদ আলী সাহেব রহস্য করিয়া বলিতেন যে মৌলানার এই খোলা বাক্স হইতে কত জিনিষ বাহির হইয়া যাইতেছে, আবার কত জিনিষ উহাতে ভর্ত্তি হইতেছে, অথচ মৌলানা সাহেবের কিছুই খেয়াল নাই। পথের ধূলি-বালি ও কয়লার বাহুল্যে মৌলানা সাহেবের অঙ্গসৌষ্ঠব যেন মলিন হইয়া গিয়াছে। শেঠ্ যমুনালালজীর প্রশান্ত বদন ও সমুন্নত দেহ ম্লান ও কৃশ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা আসিয়া আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম। শেঠ্জী সদলবলে তাঁহার বড়বাজারের দোকানে চলিয়া গেলেন। মহম্মদ আলী সাহেব দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের অতিথি হইলেও তিনি এবং মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে আন্দোলনের বিস্তৃতি এবং খিলাফতের অর্থ সংগ্রহের জন্য তাহাদিগের সঙ্গে অধিক সময় অতিবাহিত করিতেছেন। যমুনাদাসজী ও প্রভুদাস এতদিন বাঙ্গলার ভাত-তরকারী খাইয়া তৎপ্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন; এখন মুখ বদলাইয়া শরীর প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য এবং গুজরাতী 'রোট্লা'র লোভে গুজরাতী আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের বাটীতে গমনাগমন আরম্ভ করিলেন।

কলিকাতা পৌছিয়াই শুনিলাম, এখানে সাতদিন বিশ্রাম করিয়া মাদ্রাজ যাত্রা করা হইবে। শেঠ যমুনালাল এবং তাঁহার সহচরগণ মহাত্মাজীর সহিত মাদ্রাজ যাইবেন না। শেঠ্জী

কলিকাতায় অবস্থান করিয়া ব্যবসাদার মহলে বিলাতী বস্ত্র বহিষ্করণের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু একদিন একদিন করিয়া সাত দিনের স্থলে নয়দিন কলিকাতা থাকা হইয়া গেল। ইহাতে আমাদের যথেষ্ট বিশ্রাম হইল, সন্দেহ নাই; কিন্তু মহাত্মাজীর বিশ্রাম কোথায়? তাঁহার শুভাগমনে সহরের চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। এই সময় কলিকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হইবে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রধান প্রধান নেতারা আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। তখন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগ; মহাত্মাজী কোন কোন বক্তৃতাস্থলে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যগুপি সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বিদেশী বস্ত্র-বহিষ্করণ-কার্য্য পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অক্টোবর মাসে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন। তাঁহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি এত প্রগাঢ় যে তাহারা সে কথা অবিশ্বাস বা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছে না; কিন্তু কিরূপে তাহা সংঘটিত হইবে তাহাও বুঝিয়া উঠিতেছে না। এত বৎসরের পরাধীনতা, এত বড় শক্তিশালী ব্রিটিশ্ গভর্ণমেণ্ট, সমস্তই কি স্বপ্নের মত একদিনে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে! মহাত্মাজী যে সর্ত্ত প্রতিপালনের কথা বলিতেছেন, সেদিকে লোকের মন তেমন ঐকান্তিকভাবে আকৃষ্ট হইতেছে না। কিন্তু 'স্বরাজ আসিতেছে, স্বরাজ আসিতেছে,—এবং মহাত্মাজী স্বরাজ আনিয়া দিবেন' এইরূপ ভাবনার মোহে সকলে অধীরভাবে কালাতিপাত

করিতেছে, এবং সকলের দৃষ্টি নিজেদের কর্ত্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া মহাত্মাজী কি করেন, সেই দিকেই পড়িয়া আছে। ওয়ার্কিং কমিটির সভার সভ্য পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় পাঞ্জাব হইতে আসিয়াছেন। মহাত্মাজী তখন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিভৃতে কিছু লেখার কাজ করিতেছিলেন। লালাজী দেশবন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া মহাত্মাজী যে কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপরাপর নেতাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ-মণ্ডল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং তাঁহার স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটী যেন আরও ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে। তাঁহারও মুখে সেই প্রশ্ন—তারপর? তারপর? what does he propose to do next? অর্থাৎ—এখন তিনি কি করিবেন বলিতেছেন?

৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে ১২ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কলিকাতা অবস্থান কালে নয়দিনের মধ্যে ৫ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর কেবল এই দুইদিন সোমবার এবং মৌনবার বলিয়া সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত মহাত্মাজীর অবিশ্রান্ত কথাবার্ত্তা, যুক্তি, তর্ক এবং পরামর্শ প্রদানের কার্য্য স্থগিত ছিল। কিন্তু সেই দুই দিনও "ইয়াং ইণ্ডিয়া" ও "নবজীবন" লেখার চাপে তাঁহার বিশ্রামলাভ কিরূপে সম্ভব? ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ৬, ৭, ৮ এবং ১১ তারিখ; এই চারিদিন বহুক্ষণ মহাত্মাজীর ঘরের দ্বার বন্ধ রহিল। তাহার পর সহরের স্থানে স্থানে প্রায় প্রত্যহ তাঁহাকে জনসভায় উপস্থিত হইতে হইত। তন্মধ্যে ৮ তারিখ এবং

১১ তারিখের বৈকালে সহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ৫টী পার্কে একই সময়ে যে ৫টী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহা স্মরণীয়। মহাত্মাজীকে এক সভার পর অপর সভায় যাইয়া বক্তৃতা দিতে হইত; এইরূপে যে সভাতে তিনি সর্ব্বশেষে উপস্থিত হইতেন, সেখানে উপস্থিত হইতে হয়ত রাত্রি ৯।১০টা বাজিয়া যাইত। কিন্তু তাহাতেও সহস্র সহস্র লোক ধৈর্য্যসহকারে স্থিরভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। ইহা দেখিয়া কলিকাতার কোন ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্র সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল। গরুর গাড়ির চালকেরা একদিন মিলিত হইয়া মির্জ্জাপুর পার্কে সভা করিল এবং তিলক-স্বরাজ-ফাণ্ডের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজীকে দশ সহস্র টাকা ভেট প্রদান করিল। বড়বাজারের উৎকলবাসী কুলীরা উপর্য্যুপরি সভা করিয়া স্বদেশী ব্রত গ্রহণ এবং বিলাতী বস্ত্রের গাঁট স্পর্শ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। সকল সভারই এখন প্রধান উদ্দেশ্য—স্বদেশী প্রচার এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন।

চারিদিকে এই আন্দোলনের প্রভাব দেখিয়া বড়বাজারের মাড়োয়ারী বস্ত্র-ব্যবসায়িগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং মাড়োয়ারী বণিক্-সভার নেতৃত্বে তাহারা এই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, আগামী ডিসেম্বর মাস অবধি বিলাতী বস্ত্র আমদানি তাহারা স্থগিত রাখিবে। কিন্তু তাহাতে তাহারা সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিল না। মহাত্মাজীও তাহাদিগের ঐরূপ কৃত্রিম মনোরঞ্জন ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কলু-

টোলার কাটা কাপড়ের ব্যবসায়িগণ মহাত্মাজীকে তাহাদিগের এক সভায় আহ্বান করিল এবং বিদেশী বর্জ্জন বিষয়ে উৎসাহ সত্বেও যে সমস্ত অসুবিধার জন্য তদনুসারে কার্য্য করা তাহা-দিগের পক্ষে কষ্টকর হইতেছে, তাহা বিবৃত করিয়া মহাত্মাজীর উপদেশ প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাদিগকে যে পরামর্শ দিলেন তাহা এইরূপ :—প্রথম, বিজ্ঞাপন জারী করিয়া মালগুলি শীঘ্র বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা যদ্যপি না হয় তাহা হইলে স্বরাজ স্থাপন অবধি উহার বিক্রয় স্থগিত রাখিতে হইবে ; অথবা যদি সম্ভব হয়, মহাজনকে মালগুলি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু কেহ যেন কপট আচরণ দ্বারা মহাজনকে প্রতারিত না করে, ইহা তিনি সকলকে বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন।

এদিকে মহাত্মাজীর কলিকাতা আগমনের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বিলাতী বস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বড়বাজারে স্বেচ্ছা-সেবকের পাহারা বসান হইয়াছে, এবং মুসলমান-সমাজের স্বনাম-ধন্য নেতা, সুপণ্ডিত, সুলেখক এবং বাগ্মী মৌলানা আবুল কলাম আজাদ সাহেব অগ্রণী হইয়া এই কাজে ব্রতী হইয়াছেন। মৌলানা সাহেব জামার আস্তিন গুটাইয়া লম্বা লম্বা পাদক্ষেপে মহাত্মাজীর নিকট প্রতিদিন আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কার্য্যের হিসাব দিয়া যাইতেন। মহাত্মাজীর আগমনের পর বড়বাজারে কয়েক-জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে ; তাহাতে সহরে উত্তেজনার মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই কারণ মাড়োয়ারী বণিকেরা মহাত্মাজীর নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া যাহাতে

'পিকেটিং' বন্ধ হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আসিয়া বলিলেন যে পিকেটিং চলিলে বর্ত্তমান আন্দোলনের সহিত তাঁহাদিগের সহানুভূতি থাকিতে পারে না। ক্রেতা যদি বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে চাহে, তবে তাহারা কি করিবে? তাহারা ক্রেতার মনস্তুষ্টি করিতে বাধ্য। আর বিলাতী বস্ত্র ত বিষ নহে যে উহা কাহাকেও দেওয়া যায় না?

ব্যবসায়িদিগের এই সমস্ত যুক্তি বহুক্ষণ মনঃসংযোগ করিয়া মহাত্মাজী শুনিলেন। শুনিয়া যে উত্তর প্রদান করিলেন তাহা এইরূপ :—'পিকেটিং আরম্ভ হইবার সময় কলিকাতায় উপস্থিত থাকিলে তিনি হয়ত এত শীঘ্র উহা আরম্ভ না করিয়া ব্যবসায়িদিগের সহিত আরও বোঝাপড়া করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এখন যখন উহা সুরু হইয়া গিয়াছে এবং যখন ঐ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কোন অন্যায় কার্য্য সংঘটিত হয় নাই, তখন পিকেটিং বন্ধ করিবার কারণ কি, তাহা তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তিনি যত দূর অবগত আছেন, স্বেচ্ছাসেবকেরা খুব ভদ্র আচরণ করিতেছে। যাহাতে ভবিষ্যৎকালেও তাহাদের ব্যবহার কোন প্রকারে অবিনীত না হয়, সেজন্য শেঠ্ যমুনালালজী তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। মহাত্মাজী আরও বলিলেন যে, ব্যবসায়িগণ যদি এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন প্রকার সংশ্রব থাকা উচিত নহে, তবে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, তাঁহারা জানেন যে ইংরাজ জাতির রাজনীতির মূলে ইংরাজের বাণিজ্য ও ব্যবসার উন্নতি-

সাধন। তাহারই রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাদের রাজনৈতিক জীবনের সর্ব্ব-প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রেতা যেরূপ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহারই সরবরাহ ব্যবসায়ীর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। মহাত্মাজী বলিলেন, এইরূপ যুক্তি পাশ্চাত্য জগতের মুখে শোভা পাইতে পারে বটে, কিন্তু ভারতবাসীর মুখে উহা আদৌ শোভা পাইবে না। মাড়োয়ারী সমাজ আজ গো-রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু যদ্যপি কেহ গোমাংস ক্রয় করিতে চাহে, তবে কোন্ মাড়োয়ারী তাহা বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইবে? ক্রেতা মদ চাহিলে মাড়ো-য়ারীরা কি মদ্যের ব্যবসা আরম্ভ করিবেন? ত্যাগ এবং সংযমের উপর হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অতএব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ব্যবসা করিতে হইলে ব্যবসায়েরও ভাল-মন্দ বিচার করিতে হইবে। ব্যবসায়ীরা বলিতেছেন যে, বিলাতী বস্ত্র বিষ নহে যে উহা সরবরাহ করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। বহুকাল ঐ ব্যবসাতে লিপ্ত থাকিয়া তাঁহারা ঐরূপ মনে করিতেছেন সত্য, কিন্তু যদ্যপি তাঁহারা একটু বিচার করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে সাধারণ বিষে মানুষের কেবল শরীর ধ্বংস করে, তাহা বরং সহ্য করা সম্ভব; কিন্তু বিলাতি বস্ত্র ব্যবহার দ্বারা দেশবাসীর আত্মার যেরূপ অধোগতি হইতেছে তাহা আর সহ্য করা যায় না। বিলাতি বস্ত্র আমদানির সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং জনসাধারণের একটা বিশিষ্ট আয়ের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে কত স্ত্রীলোক জীবিকার কোন পন্থা না পাইয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা কি কেহ হিসাব করিয়া

দেখিয়াছেন? কেবল এই বস্ত্র-ব্যবসায়ের সূত্রে আজ ভারতবর্ষ বিলাতের পদানত হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত যুক্তির অবতারণা দ্বারা মহাত্মাজী সহজেই বুঝাইয়া দিলেন—কেন তিনি বিলাতি বস্ত্র আমদানির ব্যবসায়কে পাপ ব্যবসায় আখ্যা দিয়া থাকেন। মাড়োয়ারীদিগের ব্যবসাবুদ্ধি, কর্ম্মদক্ষতা এবং ধর্ম্মভয়ের প্রশংসা করিয়া মহাত্মাজী তাহাদিগকে দেশ হইতেই চরকার সূতা উৎপন্ন করিয়া দেশের প্রয়োজনানুরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, এক মাড়বার প্রদেশ ইচ্ছা করিলে তাহারাই সমস্ত ভারতকে খদ্দর যোগাইতে পারে।'

সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই বিদেশী বস্ত্রের আমদানি বন্ধ করিবার সঙ্কল্প লইয়া মহাত্মাজী এবার ঐ কাজেই নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই জন্য উহাই এখন তাঁহার প্রধান চিন্তা এবং প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি বঙ্গদেশের স্থানীয় সমস্যাপূরণের প্রতিও তাঁহাকে মনঃসংযোগ করিতে হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের রেল এবং ষ্টীমার কোম্পানীর সহিত ধর্ম্মঘটের ব্যাপারই বাঙ্গলার এখন প্রধান সমস্যা। চট্টগ্রামে এবং বরিশালে তিনি ধর্ম্মঘটকারীদিগকে তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া আসিয়াছেন; তথাপি কলিকাতা আসিয়াও সেই বিষয়ের আলোচনা ও আন্দোলনের জের চলিতেছে। যখন দেখা গেল যে, ঐ ধর্ম্মঘটের সহিত কোনপ্রকার স্বার্থের সংমিশ্রণ ছিল না, কেবল নির্য্যাতিত কুলীদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হিসাবেই যখন উহার উদ্ভব, তখন যতক্ষণ সেই নির্য্যাতনের জন্য প্রতিপক্ষ দুঃখ প্রকাশ না করিবে এবং

কুলীদিগকে স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া যাইবার খরচ প্রত্যর্পণ না করিবে, ততক্ষণ ধর্ম্মঘটের কোন মীমাংসা হইতে পারে না, এই অভিমত মহাত্মাজী স্বীয় নামে এক পত্র লিখিয়া সংবাদ-পত্রে প্রচার করিলেন। সেই পত্রে ইহাও বলিলেন যে, এতদিন যখন কংগ্রেস ধর্ম্মঘটের সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব বহন করিয়া আসিয়াছে, তখন ধর্ম্মঘটকারীদিগের গ্রামে ফিরিয়া যাইবার খরচ, অথবা তাহাদিগকে চরকা ও তাঁতের কাজে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহাও সরবরাহ করা কংগ্রেসের কর্ত্তব্য। তাঁহার এই মন্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার ধর্ম্মঘট আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হইল। কিন্তু এই সময় মালাবারের বিদ্রোহী মোপ্‌লারা বহু হিন্দুর ধর্ম্মনাশ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিতে লাগিল এবং তাহাতে পুনরায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইবার সম্ভাবনা হইল। মহাত্মাজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষিত না হইলে ভারতে কখনও স্বরাজ স্থাপিত হইতে পারে না। ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্র মালাবারের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া হিন্দুদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল। ইংরাজ-রাজত্ব ধ্বংস হইলে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি ঐরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিবে, ইহাই তাহাদিগের মন্তব্য। ইহাতে পাছে হিন্দুদিগের প্রাণে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার সন্দেহের

পত্তি হয়, সেই জন্য মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব তাঁহার মির্জ্জাপুর পার্কের বক্তৃতা-প্রসঙ্গে কোরাণের এক বচন উদ্ধার

করিয়া দেখাইলেন যে, জোর-জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও মুসলমান করা যায় না, করিবার চেষ্টা করিলেও তাহাতে কোরাণের সম্মতি নাই।

এদিকে বাঙ্গলার পুরাতন বিপ্লববাদিগণ দেশের চারিদিকে নূতন জীবনের স্পন্দন দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন যে দেশে সুবাতাস প্রবাহিত হইতেছে, অতএব বিপ্লব সংঘটনের এইরূপ সুযোগ আবার কবে আসিবে তাহা বলা যায় না। তাঁহারা মহাত্মাজীর কার্য্যপ্রণালীর মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অহিংসার পদ্ধতি অবলম্বনে কিরূপে দেশের উদ্ধার হইতে পারে,তাহা যুক্তি দ্বারা তাঁহাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। কাহার কাহার এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে ইহা কেবল মহাত্মাজীর একটা 'চাল', এবং যখন সময় উপস্থিত হইবে তখন তিনিও তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করিবেন। সেই জন্য তাঁহারা মনে করিতেছেন, মহাত্মাজীকে এখন বুঝান দরকার যে, শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়া চলিয়া যাইতেছে, এখন আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। এই সময় একদিন দেশবন্ধু দাশ মহাশয় মহাত্মাজীকে হাসিয়া বলিলেন—"The violent school? The violent school exists only in name!" অর্থাৎ—"বিপ্লববাদীর দল? বিপ্লববাদীর দল কোথায়? উহার নামই সার।" যাহা হউক, একদিকে সেই ধর্ম্মঘটের হুজুগ, তাহার উপর কর্ম্মিবৃন্দের মধ্যে অহিংস-পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসের অভাব—এই দুই কারণে বাঙ্গলা প্রান্ত ভারতের অপরাপর প্রান্তের সহিত সমান তালে চলিতে না পারিয়া

পশ্চাতে পড়িতেছে দেখিয়া মহাত্মাজী মধ্যে মধ্যে বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এবং ভারতের জাতীয় দুর্ব্বলতা ও পরাধীনতার তিনি যে নিদান স্থির করিয়া দিয়াছেন, বাঙ্গলাদেশ মনঃপ্রাণে তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, ইহাও তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইতেছে।

এই সমস্ত কারণে অপরাপর প্রান্তে চরকার প্রচলন ও খদ্দর উৎপাদনের জন্য যেরূপ আয়োজন চলিতেছে, বাঙ্গলায় সেরূপ কিছুই নাই। বাঙ্গলার তিলক-স্বরাজ-ফণ্ডের ছয় লক্ষ টাকা ধর্ম্মঘট ব্যাপারেই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। অপরাপর প্রান্তে কিন্তু তাহা প্রধানভাবে চরকা ও তাঁতের কাজে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি যে পরিমাণে খদ্দরের কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে, তাহা কেবল বহুবিধ নূতন ধরণের চরকা উদ্ভাবনে ব্যয়িত হইতেছে। মহাত্মাজী যে যে জেলায় গিয়াছেন, এক এক জেলায় এক এক প্রকারের চরকা দেখিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতার রাষ্ট্রীয় কলেজে মহাত্মাজীকে একদিন এক চরকা-প্রদর্শনী দেখান হইল, তাহাতে বহু প্রকারের চরকা একত্র করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ চরকার কি গুণ বা কি দোষ, তাহা কেহই বলিতে পারিল না এবং বাঙ্গলায় সূতাকাটার কাজ প্রকৃত পক্ষে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার নিদর্শন কোথায়ও তেমন ভাবে পাওয়া গেল না। এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া মহাত্মাজী "Wanted Experts" অর্থাৎ,—("বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন") এই নাম দিয়া "ইয়াং ইণ্ডিয়া"র জন্য এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া

দিলেন। তাহাতে তিনি রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম্মের দিক্ হইতে চরকার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন যে, চরকার দোষ গুণ দেখাইয়া দিবার জন্য একদল বিশেষজ্ঞের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষজ্ঞদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা-লাভ করিয়া বিশেষজ্ঞের উচ্চপদ লাভ করিতে হইবে এবং সেই জন্য প্রথম তাহাদিগকে প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাল সূতা কাটা অভ্যাস করিতে হইবে। মহাত্মাজীর বিশ্বাস, বাঙ্গলাদেশ চরকার মাহাত্ম্য একবার ভালরূপ বুঝিতে পারিলে উহাকে এমনভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবে যে, তখন বাঙ্গলার সহিত প্রতিযোগিতায় কোন প্রদেশ সমকক্ষ হইতে পারিবে না। কারণ তিনি জানেন, বঙ্গদেশই পূর্ব্বকালে বস্ত্র-শিল্প বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী ছিল। কিন্তু এখন বাঙ্গলায় নূতন করিয়া চরকার পত্তন করা হইতেছে। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় একদিন মহাত্মাজীকে বলিলেন যে, তাঁহার সহিত এক বৃদ্ধার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বৃদ্ধার বিশ্বাস যে চরকা করিলে পুলিশ আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া জ্বালাইয়া দিবে। দেশবন্ধু বলিলেন যে, বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্প নষ্ট করিবার জন্য কি প্রকার অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার সংস্কার এখনও বৃদ্ধার চিত্তে রহিয়া গিয়াছে। মহাত্মাজী এই কথায় হাসিয়া উত্তর দিলেন যে, এবারও যদি ইংরাজ চরকা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন, কারণ তাহা হইলে দেশবাসী চরকার প্রকৃত মাহাত্ম্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কলিকাতা

(২)

কত অন্তরায় উল্লঙ্ঘন করিয়া বাঙ্গলাকে এই আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইতে হইতেছে, তাহা মহাত্মাজী এবার বাঙ্গলায় আসিয়া বুঝিতে পারিতেছেন। আইন-ব্যবসায় ত্যাগ না করিয়া কোন উকিল কংগ্রেস-কমিটির কর্ম্মকর্ত্তা হইবার অধিকার পাইবে না। এই অভিমত প্রকাশ করিয়া তিনি বহু আইন-ব্যবসায়ীর অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই সময় একদিন তাঁহার রোগ-শয্যা হইতে মহাত্মাজীকে আহ্বান করিয়া যাহাতে তিনি উকিল-দিগকে এই আন্দোলনের বহিরঙ্গরূপে না রাখেন এইরূপ অনুরোধ করিলেন। অপরদিকে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বর্ত্তমান আন্দোলনের নিদর্শন চরকার মধ্যে ভারতের অবনতির বীজ নিহিত রহিয়াছে, এইরূপ ধারণার বশে সকলকে সাবধান করিবার জন্য মহাত্মাজীর কলিকাতা আগমনের কয়েকদিন পূর্ব্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিবাদে "কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্" হলে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। রবিবাবুর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া অসহযোগের বিরুদ্ধবাদীরা উৎসাহ সহকারে এই আন্দোলনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। মহাত্মাজীর

সখা, সুহৃৎ ও পূর্ব্বতন সহচর, দয়ার মূর্ত্তি এণ্ড্রুজ সাহেব, রবিবাবুর সহিত বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কর্ম্মসূত্রে জড়িত রহিয়াছেন। রবিবাবুর প্রতি তাঁহার যে প্রকার প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ, মহাত্মাজীর প্রতিও সেইরূপ। তিনি নিজে এই আন্দোলনের পক্ষ গ্রহণ করিয়া খুব পরিশ্রম করিতেছেন। কিন্তু এখন রবিবাবু ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি এক শক্ত সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। সেইজন্য এণ্ড্রুজ মহোদয় মধ্যস্থ হইয়া ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতে মহাত্মাজীকে রবিবাবুর বাটীতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে তিন ঘণ্টা কাল রবিবাবুর সহিত মহাত্মাজীর নিভৃতে আলাপ হইল। মহাত্মাজী প্রত্যাগত হইলে শুনিলাম যে আলোচনার ফলে কিছুই নির্ণয় হয় নাই। রবিবাবু নিজের কথা বলিয়া গেলেন, মহাত্মাজীও তাঁহার যাহা বলিবার তাহা বলিলেন; এবং কেহ কাহারও মত গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু সংবাদপত্রে ও বাজারে এই কথা লইয়া অনেক গুজব রটিতে লাগিল। ইংরাজ-পরিচালিত এক সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল, মহাত্মাজী রবিবাবুর সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়াছেন। আর এক সংবাদপত্র লিখিল, মহাত্মাজী রবিবাবুকে বলিয়াছেন যে, এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ তিনি সম্ভবপর মনে করেন না, তবে আন্দোলনের সুবিধার জন্য তাঁহাকে ঐরূপ বলিতে হইয়াছে। ইহা লইয়া মহাত্মাজীকে আক্রমণ করিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। গুজবগুলি কতদূর সত্য তাহা জানিবার জন্য "সার্ভেন্ট"

সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি তাহাতে উত্তর দিলেন যে, দুই ব্যক্তিতে গোপনে কি কথা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের জানিবার দাবি করা অসঙ্গত, এবং এই সমস্ত গুজব রটাইয়া যখন তাঁহাকে ও তাঁহার আন্দোলনকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা হইতেছে, তখন তিনি কিছুতেই আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন না; কারণ তিনি সম্পূর্ণ-রূপে রবিবাবুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত। ইহার পর আর একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল যে, এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ সম্ভবপর নহে, এমন কথা কি তিনি রবিবাবুকে বলিয়াছেন? মহাত্মাজী উত্তর দিলেন, সেরূপ কোন কথা তিনি বলেন নাই। এসব কথা সংবাদপত্রে বাহির হইবার পর এণ্ড্রুজ সাহেব রবিবাবুর লিখিত একখানা পত্র মহাত্মাজীকে দেখাইতে আসিলেন। পত্রখানা "ইংলিসম্যান" কাগজে পাঠান হইবে। তাহাতে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপবাদ রটিতেছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, ইহা রবিবাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। একদিকে বর্ত্তমান আন্দোলনে রবিবাবুর বিরুদ্ধতা, তাহার উপর মহাত্মাজীকে রবিবাবুর নিকট লইয়া গিয়া কিছুই লাভ হইল না, বরং নানারূপ মিথ্যা অপবাদের সৃষ্টি এবং তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা হইল, ঐ সমস্ত দেখিয়া এণ্ড্রুজ সাহেব বড়ই ম্রিয়মান হইলেন। এই উপলক্ষে মহাত্মাজীকে একদিন দুঃখ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি—"বেচারা এণ্ড্রুজ দোটানায় পড়িয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ ভোগ করিতেছেন।"

এই প্রকার বাহিরের কাজ কর্ম্ম, আলোচনা ও আন্দোলনে মহাত্মাজী সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাঁহার সহিত কথা কহিবার, অথবা তাঁহার কথা শুনিবার বড় একটা সুযোগ পাইতেন না। প্রায় প্রত্যহ তিনি সন্ধ্যার সময় কোন-না-কোন সভা-সমিতিতে চলিয়া যাইতেন, দুপ্রহরে দরজা বন্ধ করিয়া "ওয়ার্কিং কমিটি"র পরামর্শ-সভা হইত, এবং প্রাতে লেখার কাজের সুবিধার জন্য মৌনব্রত গ্রহণ করিতেন। সেই সময় তাঁহার নিকট যাইবার বিশেষ প্রয়োজন হইলে তিনি দুই এক কথা লিখিয়া যাহা বলিবার বলিতেন। একটু অভ্যাস না হইলে তাঁহার হাতের লেখা পড়া বড় কষ্টসাধ্য। মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব তাহা প্রায়ই পড়িয়া উঠিতে পারিতেন না। একদিন সকালে মৌলানা সাহেব কিছু বলিতে আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়া গেলেন। মহাত্মাজী লিখিয়া লিখিয়া উত্তর দিতেছিলেন; তাঁহার সেই পেন্সিলের পেঁচানো লেখা মৌলানা সাহেব চশ্‌মা খুলিয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া অতি কষ্টে তোত্‌লাইয়া তোত্‌লাইয়া পড়িতেছিলেন, আর মহাত্মাজী সেই প্রকাণ্ড বীরের ঐরূপ বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া মনে মনে খুব হাসিতেছিলেন। আর এক দিন মহম্মদ আলী সাহেবের সেক্রেটারী হায়াৎ-ভাই ঐরূপ কিছু বলিতে আসিয়া কোন প্রকারে কাজ শেষ করিয়া আমাকে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"Babu is growing more and more atrocious every day", অর্থাৎ ঐ হাতের লেখা

অপরকে পড়িতে দেওয়া বাবুজীর এক অত্যাচার। এদিকে মহাত্মাজীর সহিত কথা কহিবার জন্য অথবা তাঁহাকে কেবল একবার দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিয়া দেশবন্ধুর বাড়ী পূর্ণ করিয়া ফেলিত। তন্মধ্যে বিশিষ্ট লোকেরা দোতালায় উঠিয়া তাঁহার ফুরসতের অপেক্ষা করিতে থাকিতেন। একদিন দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের সহোদরা শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী অনেকক্ষণ তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া শেষে আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন—"মহাত্মাজী আমাদের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছেন, অথচ আমরা পাঁচ মিনিটও তাঁহার সহিত কথা কহিবার সময় পাই না; সর্ব্বদা অপর লোকে তাঁহাকে দখল করিয়া থাকে।" এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই এই সময় কলিকাতা আসিয়াছেন। মহাত্মাজী নিজে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, অথচ একদিনও কিছু সময় তাঁহার সহিত কথা কহিবার অবসর পাইতেছেন না। সেইজন্য দেশাই মহাশয় একটু অভিমান করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এরূপ হইলে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইবার কি দরকার ছিল?"

চারিদিকের এই গোলমালের মধ্যে আমাদের স্বাধীন কাজ বিশেষ কিছু ছিল না, তথাপি তাঁহার হুকুমের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। একদিন মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ কৃষ্ণদাস, বিনা দোষে আমাকে বাঙ্গালীরা শত্রুভাবে দেখে। এই দেখ, কেমন গালাগালি দিয়া একজন বাঙ্গালী আমাকে পত্র দিয়াছে।" এই

বলিয়া তিনি একখানা পত্র আমার হাতে দিলেন। উহা হাওড়া হইতে এক ভদ্রলোক নিতান্ত অভদ্র ভাষায় মৌলানা সাহেবকে গালি দিয়া লিখিয়াছিলেন। পত্রখানা পড়িয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, ইহাতে তাঁহার দুঃখ করা উচিত নহে, কারণ বাস্তবিক পক্ষে লেখক তাঁহার শত্রু নহেন, পত্রের প্রথমেই "My very dear Mr. Mohamed Ali" এই বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি তাহাতে হাসিয়া উত্তর দিলেন—"ঐটুকুই ত বাঙ্গালীর বিশেষত্ব"।

আমাদের গৌহাটী অবস্থানকালে একদিন মৌলানা সাহেবকে মহাত্মাজীর ঘরে বহুলোকের সম্মুখে বলিতে শুনিয়াছি, লোকে মনে করে তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী, কিন্তু তাঁহার লেখা ভাল করিয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে, প্রথমাবধি তিনি হিন্দু-মুসলমানের একতার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিতেছেন। তবে তাঁহার বিশ্বাস, মুসলমান যদি দুর্ব্বল থাকিয়া যায় আর হিন্দু প্রবল হইতে থাকে, তাহা হইলে ঐ একতা স্থায়ী হইতে পারে না। সেইজন্য তিনি মনে করেন, মুসলমানেরও প্রবল হওয়া দরকার; এবং সেই অবস্থায় হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি স্থাপিত হইলেই ভারতের যথার্থ কল্যাণ হইবে।

মৌলানা সাহেব আমাকে ডাকিয়া যখন ঐ পত্র সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন যমুনাদাস আসিয়া কৌতুক করিয়া মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বরাজ স্থাপিত হইলে তিনি কি পদ গ্রহণ করিবেন?" তিনি উত্তর করিলেন—"আমি

ছোট একটী স্কুল স্থাপন করিয়া ছোট ছোট ছেলের মাষ্টারি করিব।” তাঁহার মতে ছোট ছেলেদের পড়াইয়া যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, বড় ছেলেদের লইয়া তেমন পাওয়া যায় না। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি আরও কিছু মত প্রকাশ করিয়া, একটু চুপ করিয়া যমুনাদাসকে আবার বলিলেন—“এসব ত আমার প্রাণের ইচ্ছার কথা বলিলাম; কিন্তু স্বরাজ হইলে কি আর বিশ্রামের সময় পাইব যে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারিব? তখন দেশকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কত কাজ সম্মুখে আসিয়া পড়িবে।”

৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ সকালে রাস্তায় বাহির হইয়া দেখি, ট্রাম কোম্পানীতে ধর্ম্মঘট হইয়া সহরের সমস্ত ট্রাম বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। মহাত্মাজীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মঘট হওয়াতে লোকে মনে করিতে লাগিল যে, ইহার সহিত বোধ হয় মহাত্মাজীর যোগ আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। আমি ফিরিয়া আসিয়া ট্রামের ধর্ম্মঘটের কথা তাঁহাকে বলিলাম। তাহাতে তিনি এত আশ্চর্য্য হইলেন যে, মনে হইল আমার নিকটই সেই সংবাদ প্রথম শুনিলেন।

৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেনারস হইতে কলিকাতা আসিলেন এবং এই সময় প্র’ফেসর কৃপালানীজী সিন্ধু-প্রদেশ হইতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হওয়াতে তিনি পিতার নিকট হায়দরাবাদ (সিন্ধু) চলিয়া আসিয়াছেন। পিতার

শুশ্রূষাকারীর অভাব নাই, তথাপি যে ভাবে প্র'ফেসরজী হিন্দু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকতা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে পিতার অনুমোদন নাই, এবং প্র'ফেসরজী আবার ঐরূপ দেশে কাজ করিতে পিতার নিকট হইতে চলিয়া আসেন, ইহাতে পিতার সম্মতি নাই। এই অবস্থায় "প্র'ফেসর" কি করিবেন? মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্র'ফেসরজীর পত্রখানি আমাকে মহাত্মাজীকে দিতে বলিলেন। মহাত্মাজী উহা পড়িয়াই স্বহস্তে যে উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি পর পৃষ্ঠায় দিলাম।

অনুবাদ

"আমার মতে আমাদের পিতাও নাই মাতাও নাই, স্ত্রীও নাই সন্ততিও নাই; আমরা ভারতের সাধারণ সম্পত্তি। অতএব প্রত্যেক জরাগ্রস্ত ব্যক্তির সেবার ভার আমাদিগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। অতএব প্র'ফেসারের পিতার জন্য যখন অন্য শুশ্রূষাকারী আছে, তখন দেশের সেবা দ্বারা পিতারও সেবা হইবে, এইরূপ মনে করিয়া যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে তাঁহার সরিয়া আসা উচিত। যদি পিতার শুশ্রূষাকারীর অভাব থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে পিতৃসেবাই দেশের সেবা বলিয়া গণ্য হইত।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি"

In my opinion we
have neither father
nor mother neither
wife nor children
we belong to India
& every old man calls
out to us for service.
As therefore the
Professor's father
has other nurses
he should with-
draw in the
gentlest manner
possible believing
that service of India
includes service
of his father. If his
father was without
nursing, service
of him would
have been service
of India. MKG.

ঊনবিংশ অধ্যায়

মেদিনীপুর

১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতে মহাত্মাজী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। আসাম ও বাঙ্গলাদেশ পরিভ্রমণের পর তাঁহার মাদ্রাজ প্রদেশ যাইবার কথা। মাদ্রাজে মোপ্‌লা বিদ্রোহের বিস্তারিত সংবাদ যত পাওয়া যাইতেছে, ততই তাঁহার সেখানে যাইয়া বিদ্রোহ প্রশমনের ও হিন্দু-মুসলমানের একতা রক্ষার চেষ্টা করা প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। কারণ উত্তেজিত ও বিদ্রোহী মোপ্‌লারা মালাবারের হিন্দুদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিতে লাগিল। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে কংগ্রেস-কমিটির রিপোর্ট কলিকাতাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, এবং তাহা লইয়া মহাত্মাজী পণ্ডিত মতিলালজী, লালা লাজপৎ রায়, দেশবন্ধু দাশ মহাশয় এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ নেতাদিগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। শীঘ্র মাদ্রাজ যাওয়ার এইরূপ প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও কলিকাতাতে তাঁহার দুই দিন বিলম্ব হইয়া গেল। কারণ তখন মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের গ্রেপ্তারের গুজব বড় বড় লোকের মুখে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জন্য মৌলানা সাহেব মহাত্মাজীর সহিত মেদিনীপুর গেলেন না। বোম্বাই হইতে একজন লোক বিশেষ সংবাদ লইয়া সেইদিন

কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিবেন, এইরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার কথা শুনিয়া যদি মৌলানা সাহেব মাদ্রাজ যাওয়া স্থগিত রাখা দরকার মনে করেন, তাহা হইলে মহাত্মাজীও মেদিনীপুর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিবেন। নতুবা সন্ধ্যার সময় মাদ্রাজ মেলে মৌলানা সাহেব কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া খড়্গপুরে আসিয়া মহাত্মাজীর সহিত মিলিত হইবেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে মহাত্মাজীর মাদ্রাজ যাওয়া হইবে, কিংবা আবার কলিকাতা ফিরিয়া আসিতে হইবে, তাহার কোন স্থিরতা রহিল না।

মেদিনীপুর যাইবার সময় তিনি প্রভুদাস ও আমাকে সঙ্গে লইলেন। যমুনাদাস মালপত্র লইয়া কলিকাতা রহিয়া গেলেন, এবং মাদ্রাজ যাওয়া স্থির হইলে, মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের সঙ্গে তিনিও মাদ্রাজ মেলে খড়্গপুর আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হইবেন, এইরূপ কথা রহিল।

মহাত্মাজীর সহিত এক ট্রেণে দেশবন্ধু দাশ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী, এইরূপ অনেকে মেদিনীপুর চলিয়াছেন। দাশ মহাশয় মেদিনীপুর হইতে তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে লইয়া বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে যাইবেন। ট্রেণে উঠিয়া মহাত্মাজী হিন্দীতে একখানা খুব বড় পত্র লিখিয়া উহা শেঠ্ যমুনালাল বাজাজ মহাশয়ের নামে তাঁহার কলিকাতার ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠাইতে আমাকে বলিয়া দিলেন।

খড়্গপুরে পৌঁছিয়া দেখি, খিলাফৎ ভলাণ্টিয়ারেরা সিপাহীর ন্যায় পোষাক ও টুপি এবং পায়ে বুট পরিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু তাহাদের পোষাকের আড়ম্বর সত্ত্বেও তাহারা যে স্বেচ্ছাসেবকদিগের প্রধান কার্য্য ভালরূপ শিক্ষা করিতে অবহেলা করিয়াছে, তাহা বুঝা গেল। কারণ মহাত্মাজীর পিছনে থাকিয়া লোকের চাপে আমাদের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখান হইতে স্পেশ্যাল ট্রেণে মহাত্মাজী মেদিনীপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেদিনী-পুরবাসিদিগের আতিথ্যের আয়োজন এবং তাঁহাদের সুমিষ্ট বাক্য ও ব্যবহার দেখিয়া মেদিনীপুরের লোকের হৃদয়ের কোমলতা ও মাধুর্য্যের পরিচয় আমরা পদে পদে পাইতে লাগিলাম। কিন্তু ইহাও দেখিলাম যে কোন বৃহৎ ব্যাপার সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিতে হইলে যেরূপ কর্ম্মকুশলতার প্রয়োজন, তাহা মেদিনীপুর অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতের এক এক প্রান্তের লোকের হাব, ভাব, ভাষা ও ব্যবহারের যেমন এক একটী বিশেষত্ব আছে, বাঙ্গলার প্রতি জেলার লোকেরও সেইরূপ এক একটা বিশেষত্ব আছে, ইহা মেদিনীপুরে আসিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম এবং তখন মনে হইতে লাগিল, এক জেলার লোক যদি অপর জেলার লোকের গুণের মর্য্যাদা দিয়া তাহা নিজেদের চরিত্রে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র আমাদের জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে।

মেদিনীপুরে বাসায় পৌঁছিয়া মহাত্মাজীর কাজে আমাকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইয়াছিল। মধ্যে একবার তাঁহার আহারের সময় নিকটে গিয়া দেখি, দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের সহিত মহাত্মাজীর নানা বিষয়ে আলাপ হইতেছে, এবং মহাত্মাজী কিরূপে তাঁহার বর্ত্তমান মতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই বিষয়ে দাশ মহাশয় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তাহাতে মহাত্মাজী উত্তর করিলেন যে, তিনি পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাঁহার মত সংগ্রহ করেন নাই। তাঁহার অধিক পুস্তক পাঠ করার অভ্যাস নাই; সারা জীবনে তিনি বোধ হয় দুইশতের অধিক পুস্তক পড়েন নাই। তবে কোন কোন পুস্তক হইতে তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তন্মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান-কালীন এক দিবস রাস্কিন প্রণীত Unto This Last (অণ্টু দিস্ লাষ্ট্) পড়িয়া তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইল যেন এক নূতন জগৎ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে খুলিয়া গেল, এবং তিনি নিজে এক নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিকটে বসিয়া ছিলেন; ইংরাজী-সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, এবং সেই বিষয়ে কথা হইতেছে শুনিয়া আনন্দে তিনি শরীর দোলাইতে লাগিলেন। রাস্কিনের নাম শুনিয়াই তিনি রাস্কিন প্রণীত অপর কতকগুলি পুস্তকের নাম করিয়া বলিলেন যে, রাস্কিনের পুস্তকে অহিংসার (non-violence) শিক্ষা নাই, সেজন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মাজী তাহা কোথা হইতে লাভ করিলেন? এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়া মহাত্মাজী

বলিলেন, যে সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবে তিনি প্রথমে মূল গীতা অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই, কিন্তু স্যর এডুইন আর্ণল্ড প্রণীত গীতার ইংরাজী অনুবাদ Song Celestial পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন।

মেদিনীপুরে সেই দিন সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর ছিল; তাহা সত্ত্বেও মহাত্মাজীকে লইয়া এক শোভাযাত্রা করা হইবে এইরূপ প্রস্তাব শুনিতে পাইয়া আমার ভয় হইল যে ইহাতে তাঁহার বড় ক্লেশ হইবে। মহাত্মাজীকে লইয়া লোকের আগ্রহ ও আনন্দের দিকটা ছাড়িয়া দিয়া আমি তখন মহাত্মাজীর সুবিধা এবং তাঁহার শরীরের ভাল-মন্দের দিকে অধিক মনোযোগী হইতে আরম্ভ করিয়াছি। সেজন্য তাঁহার নিকটে গিয়া শোভাযাত্রার প্রস্তাবের কথা বলিলাম; তাহাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"No procession, there should be no procession" (কোন শোভাযাত্রা নয়, কোন শোভাযাত্রা হইবে না), কিন্তু স্থানীয় নেতাদের অনুরোধে পরে শোভাযাত্রায় বাহির হইতে তাঁহাকে স্বীকৃত হইতে হইল। শোভাযাত্রার পরে স্ত্রীলোকদিগের সভায় যোগদান করিয়া মহাত্মাজী জনসাধারণের সভায় আসিলেন। সভার প্রারম্ভে স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে, তাহার পর জনসাধারণের পক্ষ হইতে এবং সর্ব্বশেষে উকীলদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র, এবং মেদিনীপুরের কিছু স্থানীয় খদ্দর উপঢৌকন দেওয়া হয়। সেই সময় একজন সাঁওতাল উঠিয়া—"গান্ধী মহারাজ, আমরা সাঁওতাল মানুষ, কিছু জানি না—এই কাপড় লেও" বলিয়া

তাহাদের প্রস্তুত অতি সুন্দর দুইখানা গাত্রাবরণ মহাত্মাজীকে উপহার দিল। আসামে এবং পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে পূর্ব্বে তাঁহাকে উপঢৌকন গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু সাঁওতালের বস্ত্র দুইখানা তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া যেরূপ আগ্রহ ও প্রীতি-সহকারে গ্রহণ করিলেন, এইরূপ আর অন্য কোন স্থানে দেখি নাই।

মেদিনীপুরের বক্তৃতায় প্রথমতঃ তিনি উকীলদিগের অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে বলিলেন যে, যদিও আজকাল তিনি নিজেকে কৃষাণ, জোলা ও মজুর বলিয়া পরিচয় দিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তথাপি তিনিও এককালে একজন ছোট উকীল ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন যে, ওকালতি করিয়া দেশের সেবা করা সম্ভবপর নহে, তখনই তিনি ঐ ব্যবসায় ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করেন, দেশে উকীলদিগের প্রাধান্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন দেশে ত্যাগের ও কাজের যুগ আসিয়াছে। যিনি এখন সাহস ও তেজের সহিত অধিক কাজ করিতে পারিবেন, তিনিই দেশের নেতা ও পরিচালক হইবেন। এখন আবেদন, নিবেদন বা কেবল সভায় বসিয়া মন্তব্য পাশের যুগ চলিয়া গিয়াছে, সেজন্য কেবল বুদ্ধির ব্যবহার ও বক্তৃতার দ্বারা দেশের সাধারণের সহানুভূতি লাভ হইবে না এবং ত্যাগে, সাহসে ও বীরত্বে অতুলনীয় না হইলে দেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ সম্ভবপর হইবে না। এই কারণে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান আন্দোলনে উকীলেরা নেতৃত্ব পাইতে পারেন না। উকীল বন্ধুদিগের প্রতি

তাঁহার ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ নাই। তিনি কেবল দেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, দেশ যাহা চায় তাহা বলিয়াছেন। তিনি উকীল ভ্রাতাদিগকে এই আন্দোলন হইতে বাহিরে রাখিতে চাহেন না। তবে তাঁহাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, ৩৫ বৎসর তাঁহারা দেশের নেতৃত্ব করিয়াছেন এবং প্রধানের আসন পাইয়াছেন, এখন কিছুকাল দেশের "স্বয়ং সেবক" হইয়া যান, কিছুকাল অপরের হাতে নেতৃত্ব দিয়া তাঁহারা সাধারণ সেনা-শ্রেণীভুক্ত হউন। বর্ত্তমান সময়ে যিনি সিপাহী হইতে পারিবেন, তিনিই দেশের প্রকৃত সেবা করিতে পারিবেন। কিন্তু অপরকে খুন করিবার জন্য এ সিপাহী নহে, আত্মবিসর্জ্জনের জন্য সিপাহী হইতে হইবে। যে সিপাহী অপরকে না মারিয়া নিজে মরিতে জানে সেই অধিক বীর। আজকাল দেশে এমন বীর চাই, যে প্রফুল্লচিত্তে ন্যায়ের জন্য অপরের কোন অনিষ্ট না করিয়া ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে পারে। এই জন্য তিনি উকীল ভ্রাতাদিগকে বলিয়াছেন যে এখন তাঁহারা কিছুকাল নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হইবেন না।

ইহার পর তিনি বাঙ্গলার তিলক-স্বরাজ-ফণ্ডে যে টাকা প্রতিশ্রুত আছে, অথচ আদায় হয় নাই, তাহা শীঘ্র পূরণ করিয়া দিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন, এবং বলিলেন যে এবার তিনি বাঙ্গলায় 'স্বদেশী', 'অহিংসা' (Non-violence) ও 'হিন্দু-মুসলমানের একতা' এই তিনটী বিষয় প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছেন। যদি দেশে শান্তি রক্ষিত হয় এবং স্বদেশী-ব্রতে

আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে শীঘ্রই স্বরাজ স্থাপিত হইবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্বন্ধে বলিলেন যে, মোপ্‌লাদের বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্ভবপর নহে। মোটামুটি একতা থাকা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে এরূপ ছোট খাট দাঙ্গাফেসাদ এবং অত্যাচার একেবারে হইবে না, ইহা তিনি মনে করেন না। তাঁহার বিশ্বাস, হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান ও সজ্জন নেতা আছেন, তাঁহাদের প্রভাবে ঐ একতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মোপ্‌লা হাঙ্গামা ব্যতীত গত ১২ই তারিখ কলিকাতায় যে ঘটনার কথা শুনা গিয়াছে, তাহাও তিনি অত্যন্ত অন্যায় মনে করেন। একজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদার কোন উড়িষ্যাবাসী কুলীকে বিলাতী কাপড় তুলিতে বলে, সেই কুলী তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় ব্যবসাদারটি বিষম প্রহার করিয়া তাহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়াছে। উক্ত মাড়োয়ারীর এই কার্য্য অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উৎকলবাসী ভ্রাতা ও তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি ঐ অত্যাচারের প্রতীকারের জন্য কিছু না করিয়া তাহা সহ্য করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বাস, কলিকাতায় বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায় অতি শীঘ্র বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রায় বিশ সহস্র, অন্ততঃ পক্ষে দশ সহস্র লোক সেই মাড়োয়ারীর বাড়ী ঘেরাও করিয়া প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইয়াছিল। এইরূপ উত্তেজনা ও দাঙ্গা-ফেসাদের দ্বারা আমাদের

কার্য্য উদ্ধার হইবে না। অত্যাচার আমাদিগকে সহ্য করিতে শিখিতে হইবে। তাহা হইলেই নিরুপদ্রবে, শান্তির সহিত এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া সবিনয় আইন ভঙ্গ (civil disobedience) করিবার উপযোগিতা লাভ হইবে।

বিংশ অধ্যায়

মৌলানা মহম্মদ আলীর গ্রেপ্তার

মেদিনীপুর হইতে আমরা রাত্রি ৮টার সময় খড়গপুরে আসিয়া দেখি, মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেব মাদ্রাজ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া মাদ্রাজ মেলে আসিয়াছেন। সঙ্গে যমুনাদাসও মহাত্মাজীর মালপত্র লইয়া আসিয়াছে। বম্বে হইতে যাঁহার সংবাদ লইয়া আসিবার কথা ছিল, তিনিও খড়গপুর অবধি আসিয়া মৌলানা সৌকৎ আলীর লিখিত এক পত্র মহাত্মাজীর হস্তে প্রদান করিয়া গেলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে আলী ভ্রাতা দুই জনই শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবেন, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মহাত্মাজীর জন্য হাওড়া ষ্টেশন হইতে 'বার্থ' রিজার্ভ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি তাহাতে গিয়া বসিলেন; আমি এবং প্রভুদাস আমাদের সুবিধা মত স্থান খুঁজিয়া লইলাম। রাত্রিতে উড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগ পার হইয়া সকালে উড়িষ্যা ও অন্ধ্রদেশের সীমানায় আসিয়া পড়িলাম। এখানকার অধিবাসীরা আতিথ্য-পরায়ণ বলিয়া মনে হইল। কারণ মহাত্মাজী যাইতেছেন সংবাদ পাইয়া তাহারা নিজ হইতেই নানারূপ আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল।

বেলা আড়াইটার সময় ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি, বহু তেলিঙ্গী সৈন্য দ্বারা প্লাটফর্মের একার্দ্ধ ঘিরিয়া রাখা

হইয়াছে। তাহাদের আকৃতি এবং যুদ্ধসজ্জার ভীষণতায় চতুষ্পার্শ্বের জনপ্রাণী যেন ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এত সৈন্যসজ্জা দেখিয়াই আমাদের মনে হইল, এখানে কিছু নূতন ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু ট্রেণখানি ধীরে ধীরে সৈন্যশ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্লাটফর্‌মের যে অংশ খালি ছিল সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। যে সকল আরোহীদিগের ওয়ালটেয়ারে নামিবার কথা, তাঁহারা নামিয়া গেলেন; আমিও তখন নামিয়া মহাত্মাজীর কামরায় আসিয়া বসিলাম। এই সময় ওয়ালটেয়ার কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদক মহাশয় অল্প কয়জন সঙ্গী লইয়া বাহিরের জনতাকে কিছু উপদেশ দিবার জন্য মহাত্মাজী ও মৌলানা সাহেবকে অনুরোধ করিতে আসিলেন। এতক্ষণ সৈন্যদিগের কোন প্রকার চেষ্টা না দেখিয়া এবং ট্রেণখানি সৈন্যশ্রেণীর বহির্ভাগে রহিল দেখিয়া মনে করিলাম, বোধ হয় ঐ আয়োজন মৌলানা সাহেবের উদ্দেশ্যে হয় নাই। মহাত্মাজী ও মৌলানা সাহেব উভয়েই কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ মত ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইহার ৪।৫ সেকেণ্ড পরেই ট্রেণখানি পিছু হটাইয়া সৈন্য-পরিবেষ্টিত স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার পর দেখি, সৈন্যদের ইংরাজ নেতা ৪।৫ জন সৈন্য লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া ষ্টেশনের বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাহার দুই তিন মিনিট পরে অপর যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহারাও এক লাইনে সজ্জিত হইয়া 'কুইক্ মার্চ্চ' করিয়া প্ল্যাটফর্‌মের বাহিরে অদৃশ্য হইল।

এই পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহ আমার চক্ষুর সম্মুখে হইয়াছে। ষ্টেশনের বাহিরের ঘটনা মহাত্মাজীর মুখে যাহা শুনিলাম তাহা লিখিতেছি। তিনি এবং মহম্মদ আলী সাহেব সভায় যাইতেছিলেন ;—তিনি আগে যাইতেছিলেন এবং মৌলানা সাহেব তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় দুই জন সাহেব ও জন কয়েক সিপাহী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মৌলানা সাহেবকে গ্রেপ্তার করিল। মহাত্মাজী ইহাতে দাঁড়াইলেন না। কারণ সেখানে খুব জনতা ছিল; পাছে তাহারা উত্তেজিত হইয়া একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করিয়া ফেলে, সেই ভয়ে তিনি জনতাকে সঙ্গে লইবার জন্য অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলেন, এবং জনতাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। এই কারণে, গ্রেপ্তারের পর মৌলানা সাহেবের সঙ্গে মহাত্মাজীর কোন কথা হইতে পারে নাই। তৎপর সভাস্থলে যাইয়া দুই এক কথায় লোকদিগকে শান্ত থাকিতে বলিয়া, এবং কংগ্রেসের নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়া, যে স্থানে মৌলানা সাহেবকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল সেই স্থানে আসিলেন ও তিনি মৌলানা সাহেবের সঙ্গে কথা কহিতে পারিবেন কিনা, উপস্থিত ইংরাজ পাহারাদার অফিসারটীকে প্রশ্ন করিলেন। সেই অফিসার উত্তর করিল যে, কেবল বেগম মহম্মদ আলী ও মহম্মদ আলী সাহেবের সেক্রেটারীকে কিছুক্ষণ কথা কহিতে দিবার হুকুম আছে। মহাত্মাজী হাসিয়া বলিলেন—"I become his private secretary, if you have no objection." যদি তোমার

আপত্তি না থাকে, আমিই তাঁহার সেক্রেটারী হইতে প্রস্তুত। সাহেবও ঈষৎ হাসিয়া প্রত্যুত্তর দিল যে, তাহা হইতে পারে না।

মৌলানা সাহেবের সেক্রেটারী হায়াৎভাই তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বেগম সাহেবা ও তাঁহাকে মৌলানা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে শ্রবণমাত্র তিনি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া বেগম সাহেবাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া লইয়া গেলেন।

তাহার কিছুক্ষণ পরে দেখি, এক পার্শ্বে বেগম সাহেবা ও এক পার্শ্বে হায়াৎকে সঙ্গে লইয়া মহাত্মাজী ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ বহুলোক বিমর্ষ ও নিস্তব্ধভাবে ছুটাছুটি করিতেছিল। বেগম সাহেবা যেন সগর্ব্বে তেজের সহিত দ্রুত পদবিক্ষেপে আসিতেছিলেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি ভয় হইতেছে?" তিনি উত্তর করিলেন—"না।" মহাত্মাজী ট্রেণে উঠিয়া বসিলে হায়াৎভাই বেগম সাহেবাকে তাঁহার কামরায় রাখিয়া মহাত্মাজীকে আসিয়া বলিলেন যে, বেগম সাহেবা স্বামীকে উৎসাহ দিয়া তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিয়াছেন। মহম্মদ আলী সাহেব বলিয়াছেন— হায়াৎ যেন তাঁহার নামে মহাত্মাজীর হস্ত চুম্বন করে। ইহা বলিয়া হায়াৎ আবেগভরে মহাত্মাজীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিল। বেগম সাহেবার সঙ্গে এক বৃদ্ধা দাসী ছিল, সে আমার সঙ্গে এক কামরাতে যাইতেছিল, আমি মধ্যে একবার সেখানে গেলে সে ব্যস্তভাবে "ক্যা

হুয়া, ক্যা হুয়া?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমাদের সকলের মনে হইতে লাগিল যেন পলকের মধ্যে কি একটা কাণ্ড হইয়া গেল। মৌলানা সাহেবের গ্রেপ্তারের গুজব বহুদিন চলিয়া আসিতেছিল, সেজন্য ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যেভাবে সৈন্য সাজাইয়া পূর্ব্বে কোন খবর না দিয়া আচম্বিতে তাঁহাকে পথের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হইল, তাহাতে মনে হইতে লাগিল—বাঘ যেমন শিকার করিবার সময় সহসা পশ্চাৎ হইতে শিকারের স্কন্ধে লাফাইয়া পড়ে, ইহাও যেন সেইরূপ কিছু হইয়া গেল। যদি কোন নিজজন এইভাবে সহসা অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ঘটনার আকস্মিকতার জন্য অন্তরে যেরূপ বিস্ময় ও স্তব্ধতার সঞ্চার হইবার কথা, আমাদেরও সেই প্রকার অনুভূত হইল। ষ্টেশনের একপার্শ্বে ছোট পুলিশের কুঠরীতে মৌলানা সাহেবকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহার উচ্চ-হাসি, প্রাণখোলা সরল কথাবার্ত্তা, এবং সমুন্নত প্রশান্ত বপু, সমস্তই যেন সেখানে জোর করিয়া চাপিয়া রাখা হইয়াছে, এইরূপ মনে হইতে লাগিল। তাঁহার পরিজন ও সহকর্ম্মীদিগের সহিত যদি বিদায় লইবার দুই এক মিনিট সময় দেওয়া হইত, তাহা হইলে এই গ্রেপ্তার সকলের নিকট হাসি-খেলার ব্যাপার হইত, এবং এই অতর্কিত আক্রমণ যেরূপ নিষ্ঠুর বলিয়া তখন মনে হইতে লাগিল তাহা কাহারও মনে হইত না।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে মৌলানা সাহেবের খানসামা তাঁহার কিছু কিছু জিনিষ লইয়া ওয়ালটেয়ারে চলিয়া গেল। মহাত্মাজী

স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির সম্পাদক মহাশয়কে বলিয়া দিলেন, মৌলানা সাহেবকে কোথায় লইয়া যাওয়া হয় তাহা যেন তিনি লক্ষ্য রাখেন এবং কিছু জানিতে পারিলে মাদ্রাজে মহাত্মাজীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। ইহা বলিয়া তখনই মহাত্মাজী কাগজ ও পেন্সিল লইয়া এক সুবিস্তৃত টেলিগ্রামের মুসাবিদা করিলেন এবং প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্র সমূহে প্রেরণ করিবার জন্য তাহা আমাদিগকে নকল করিতে দিলেন। তাহা নকল হইলে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে টেলিগ্রাম আফিসে উহা উপস্থিত করা হইল; কিন্তু শুনিলাম, সরকারী হুকুমে ২৪ ঘণ্টার জন্য টেলি-গ্রামের চলাচল বন্ধ রাখা হইয়াছে এবং সেই কারণ ২৪ ঘণ্টা পরে ঐ টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হইবে। মহাত্মাজী সেই টেলিগ্রামে মৌলানা সাহেবের গ্রেপ্তারের বিবরণ সংক্ষেপে প্রথমে লিখিয়া সর্ব্বসাধারণকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন—

"There is no cause for sorrow, but every cause for congratulation. There should be no hartal. Perfect peace and calmness should be observed. I regard the arrest as a prelude to Swaraj and the redress of Khilafat and the Punjab wrongs, if we can remain non-violent, retain Hindu-Moslem unity despite the madness of some Moplahs, and fulfil the Swadeshi programme.

"I hope every Indian, man or woman, will

completely boycott foreign cloth and take up spinning or weaving during every spare minute.

"By striving like the Maulana, be insistent on religious and national rights.

"Let us earn imprisonment. I am conscious of the Maulana's innocence, and I am sure the imprisonment of the innocent will enable the nation to reach the cherished goal.

"The Maulana was quite calm. So is the Begum Saheba. She accompanies me during the travel. So does Maulana Azad Sobani.

Gandhi"

অনুবাদ

"এই গ্রেপ্তার হওয়াতে আমাদিগের দুঃখ করিবার কিছুই নাই; বরং আমাদিগের আনন্দ করা কর্ত্তব্য। কোথায়ও 'হরতাল' করা উচিত হইবে না। আমাদিগের সকলকে পূর্ণ শান্তি ও স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। যদি আমরা প্রতিহিংসার ভাব ত্যাগ করিয়া শান্তির পথ অবলম্বন করিতে পারি, যদ্যপি আমরা মোপ্‌লাদিগের পাগলামি সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের একতা রক্ষা এবং স্বদেশী-ব্রত পূর্ণ করি, তাহা হইলে এই গ্রেপ্তারই স্বরাজ-প্রাপ্তি এবং খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অত্যাচার দূরীকরণের পূর্ব্বাভাব বলিয়া আমি মনে করিব।

যখন 'ষ্টোভ' জ্বালিয়া মহাত্মাজীর দুগ্ধ গরম করিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি তাহা দেখিয়া বলিলেন—সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছে, সেই দিন আর তাঁহার আহার হইবে না।

একবিংশ অধ্যায়

মাদ্রাজ সহর

রাত্রিতে অন্ধ্র প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম—সকল ষ্টেশনেই প্ল্যাটফরমের উপর অগণিত লোক মহাত্মাজীর সম্বর্দ্ধনার জন্য ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতেছিল। ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইলে দুই চারি জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অগ্রগামী হইয়া মহাত্মাজীর সহিত কথা কহিয়া যাইতে লাগিল এবং সেই কথার সার তাহাদের মাতৃভাষায় চীৎকার করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিল। তাহারা যখন মাথার উপর হাত ঘুরাইয়া উল্লাস-ধ্বনি করিতে লাগিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতাও চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। ট্রেণ চলিতে থাকিলে ট্রেণের শব্দে এবং ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া লাগিলে লোকের গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। সন্ধ্যার সময় অন্ধ্র-শিরোমণি দেশভক্ত কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পায়া মহোদয় আসিয়া মহাত্মাজীর সহিত একত্র হইলেন। তাঁহার শান্ত, শিষ্ট ও সাত্ত্বিক মূর্ত্তি এবং স্বাভাবিক নম্রতা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। এইরূপে ট্রেণে রাত্রি যাপন করিয়া আমরা প্রাতে মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম।

মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের পূর্ব্বের ষ্টেশন বেসিন্ ব্রিজ। মাদ্রাজের স্বনামধন্য নেতারা সেই ষ্টেশনে আসিয়া মহাত্মাজী, বেগম মহম্মদ আলী ও মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেবকে

ট্রেণ হইতে নামাইয়া এক স্পেশ্যাল ট্রেণে করিয়া লইয়া গেলেন। মহাত্মাজীর আগমনে ষ্টেশনে বহু লোক সমাগম হইবে এবং সেই কারণ মেল ট্রেণের যাত্রীদিগের বিশেষ অসুবিধা হইবে বুঝিয়া বেসিন্ ব্রিজ ষ্টেশনে কিছু অধিক সময় মেল ট্রেণ আট্‌কাইয়া রাখা হইল, এবং মহাত্মাজীকে স্পেশ্যাল ট্রেণে করিয়া প্রথম পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মিঃ হায়াৎ, যমুনাদাসজী ও আমি মাল-পত্র লইয়া মেলট্রেণে রহিলাম; প্রভুদাস মহাত্মাজীর সঙ্গে চলিয়া গেল। আমরা কিছুক্ষণ পরে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে জনস্রোত চলিয়া গিয়াছে। বেগম মহম্মদ আলী সাহেবা স্থানীয় খিলাফৎ-কমিটির অতিথি হইয়াছেন, সেই জন্য মিঃ হায়াৎ সেখানে গেলেন। আমি এবং যমুনাদাস সান থোম মহল্লার সালিভান্‌স্ রোডে রামজী কল্যাণজী নামে গুজরাতী সওদাগরের বাটীতে মহাত্মাজীর আবাসস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১৫ই প্রাতে আমরা মাদ্রাজ পৌঁছিলাম। রামজী কল্যাণজী মহাশয়ের বাটী অনেকাংশে পুরাতন হিন্দু-স্থাপত্যপদ্ধতি অনুসারে রচিত। দরজার উপরিভাগে এবং অন্যান্য স্থানেও খিলানের পরিবর্ত্তে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসমূহ সমান্তরাল ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে; ছবিতে হিন্দু-স্থাপত্যের ঘর যেরূপ দেখিয়াছি এই গুলিও অনেকটা সেইরূপ। ইহাতে বোধ হইল এখনও মাদ্রাজে হিন্দু-স্থাপত্য-পদ্ধতি জীবিত রহিয়াছে। কিন্তু এই যুগের নিদর্শন—মোটার ও টেলিফোনসমূহ

বর্জ্জন করিলে পাছে যুগধর্ম্মের অপমান হয়, সেই ভয়ে পুরাতন স্থাপত্যের সহিত নূতনের সংমিশ্রণ-স্বরূপ গৃহস্বামী নূতনেরও আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন।

আমি সেখানে পৌঁছিয়াই দেখি, ইংরাজ-পরিচালিত মাদ্রাজের সংবাদ-পত্র 'মাদ্রাজ মেলের' প্রতিনিধি একজন সাহেব মহাত্মাজীকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া উত্তর লিখিয়া লইতেছেন। তিনি চলিয়া গেলে Daily Express [ডেলি এক্সপ্রেস্] নামে অপর এক দৈনিক পত্রের মাদ্রাজী প্রতিনিধি নূতন জুতা পায়ে মচ্ মচ্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে হাসি এবং তিনি সকলকেই আপ্যায়িত করিতে চাহেন। মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের গ্রেপ্তারের সংবাদে সহরে যে পরিমাণে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, সংবাদ-পত্র পরিচালকদিগের মধ্যেও সেই অনুপাতে সংবাদের জন্য দৌড়াদৌড়ি লাগিয়া গিয়াছে। মাদ্রাজে আসিয়া আমরা মৌলানা সৌকৎ আলী, ডাঃ কিচ্‌লু এবং তাঁহাদের সহযোগী কারাচির মোকদ্দমার অন্যান্য আসামীগণের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইলাম। মহাত্মাজী এখন কি হুকুম দিবেন ইহাই সকলের প্রশ্ন। দৈনিক 'Hindu' [হিন্দু] সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার আসিয়া যমুনাদাসের প্রমুখাৎ মহম্মদ আলী সাহেবের গ্রেপ্তারের বিবরণ লিখিয়া লইলেন। ডেলি এক্সপ্রেসের প্রতিনিধি দ্বিতীয়বার আসিয়া একজন ইংরাজ চিত্রকর দ্বারা মহাত্মাজী কি ভাবে বসেন, কি ভাবে লেখেন

ইত্যাদি চিত্র আঁকিয়া লইয়া গেলেন। ঘরে একটী চরকা ছিল, তাহা দেখিয়া চিত্রকর সাহেবের বিশেষ আনন্দ; তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া দুই তিন দিক্ হইতে চরকার ছবি ভাল করিয়া আঁকিয়া লইলেন। পরে এই সমস্ত কাগজে ছাপা হইলে দেখিলাম, কিম্ভূতকিমাকার ছাপা হইয়াছে। মহাত্মাজীর সম্মুখের কয়েকটী দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, তাহাও রিপোর্টারেরা রিপোর্ট করিতে ভুলেন নাই। যাহা হউক, মাদ্রাজী কাগজওয়ালাদের দৈনিক কাগজ চালাইবার বাহাদুরী দেখিয়া তাহাদের প্রশংসা করিতে হয়, এবং বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রসমূহ যেন তাহাদের পঞ্চাশ বৎসর পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ইংরাজী মতে আমরা মাদ্রাজ প্রান্ত বলিতে যাহা বুঝি, কংগ্রেসের বিভাগ মতে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রধান দুই বিভাগ উত্তর-মাদ্রাজ বা অন্ধ্র, এবং দক্ষিণ-মাদ্রাজ বা তামিল নাড়ু, এবং তৃতীয় বিভাগ কেরল। অন্ধ্র প্রদেশের ভাষা তেলুগু এবং দক্ষিণ মাদ্রাজের ভাষা তামিল। মহাত্মাজীর নিকট এই দুই প্রদেশের নেতৃবর্গ উপস্থিত দেখিলাম। তৃতীয় প্রদেশ কেরল, ইহারই অন্তর্গত মালাবার। সেখানকার প্রধান ব্যক্তিরা তখন মালাবারের মোপ্লা বিদ্রোহ লইয়া বিব্রত এবং Martial Law (সামরিক আইন) জারি হওয়াতে তাঁহারা কেহই মহাত্মাজীর নিকট আসিতে পারেন নাই। মহাত্মাজী এবং মহম্মদ আলী সাহেব মালাবারে যাইয়া শান্তি স্থাপন করিবেন, মাদ্রাজ আগমনের ইহা এক উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মহম্মদ

আলী সাহেব পথেই অবরুদ্ধ হইলেন, মহাত্মাজীও মাদ্রাজে আসিয়া গভর্ণমেণ্টের এক চিঠি পাইলেন যে, তাঁহাকে মালাবারে যাইতে দেওয়া হইবে না। সেই চিঠি তিনি তখনই 'হিন্দু' কাগজে ছাপাইতে পাঠাইলেন। এই ব্যাপার লইয়া লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে, মাদ্রাজের চীফ সেক্রেটারী সাহেবই মাদ্রাজ প্রদেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা এবং তিনি পাঞ্জাবের ও-ডায়ার ও টমসন সাহেবের অনুকরণে মালাবারকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশবাসীকে কষাঘাত করিবার যে সুযোগ পাইয়াছেন, তাহা তিনি কখনই ছাড়িবেন না। মহাত্মাজী মালাবার যাইয়া শান্তি স্থাপন করিলে সেই সুযোগ নষ্ট হইবে, এই জন্যই তাঁহাকে মালাবার যাইতে দেওয়া হইল না, ইহাই এখানকার সাধারণের বিশ্বাস।

মাদ্রাজে আসিয়া দেখিতেছি, ক্রমশঃই দেশের সমস্যা যেরূপ জটিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মাথা ঠিক রাখিয়া কাজ করিতে একা মহাত্মাজীই সক্ষম। আমাদের ন্যায় তাঁহার অনুচর-মণ্ডলীর পক্ষে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কাজ করা সম্ভবপর নহে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যেরা যখন অগ্রসর হইয়া থাকে, তখন তাহাদের পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবার যেমন অবকাশ থাকে না, বা ইচ্ছা হইলেও কেহ পিছনে হটিতে পারে না, ইহাও যেন অনেকটা সেই প্রকার। বর্ত্তমানের ঘটনাসমষ্টিই সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া রাখে, তাহাতে অতীত বা ভবিষ্যৎ বিবেচনার সময় পাওয়া যায় না। দেখিলাম, ইহাই এক নূতন ধরণের জীবন। ক্রমে ক্রমে ইহাও আমার অভ্যস্ত হইয়া যাইতে লাগিল।

বাঙ্গলাদেশে মহাত্মাজী স্বদেশী বা খদ্দর প্রচারকেই প্রধান প্রচারের বিষয় করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে খদ্দর আন্দোলনের অবস্থা বাঙ্গলা অপেক্ষাও তখন খারাপ বোধ হইল। তদুপরি এখানকার অস্পৃশ্যতা-সমস্যা ভারতে সর্ব্বজন-বিদিত। মহাত্মাজী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে স্বদেশী প্রচার কার্য্য সমাপ্ত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল, কোটি টাকা সংগ্রহ এক প্রকার সহজসাধ্য ব্যাপার হইয়াছিল; কিন্তু স্বদেশীব্রত ঠিক সেইভাবে সহজে জনসাধারণের প্রাণে স্থান পাইতেছে না। যেখানে মহাত্মাজী উপস্থিত হয়েন, সেখানেই উৎসাহ, উত্তেজনা ও জয়ধ্বনির অভাব নাই। কিন্তু অন্তর হইতে খদ্দর-ব্রতে দীক্ষিত হইতে হইলে, হৃদয়ের যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা সমগ্রভাবে দেশের লোকের কখন কি ভাবে হইবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অথচ স্বদেশী ভাব এই আদর্শানুরূপ লোকের হৃদয়ে স্থান না পাইলে এই আন্দোলনের স্থায়ীফল লাভ সম্ভবপর হইবে না।

উত্তর মাদ্রাজ বা অন্ধ্র প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট এক **grazing tax** অর্থাৎ গোচারণ কর জারি করিয়া লোকের নিতান্ত উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। লোকে তাহা মান্য করিতে পারিতেছে না, তাহাতে সমগ্র গ্রামের লোকের গাভী খোঁয়াড়ে রাখা হইতেছে। সেখানে গাভীগুলির উপযুক্ত আহার দেওয়া হয় না, এবং গাভী হইতে গোবৎস পৃথক্ করিয়া রাখাতে উহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে। ইহা লইয়া সেখানে লোকের মধ্যে উত্তেজনার

সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানকার নেতারা এই বিষয় লইয়া civil disobedience অর্থাৎ সবিনয় আইন ভঙ্গ করিতে মহাত্মাজীর অনুমতি লইতে আসিলেন।

মালাবারের মোপ্‌লা হাঙ্গামার সময় কয়েকজন হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হইয়াছে বলিয়া সেখানকার হিন্দুদিগের প্রাণে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কয়েকজন মালাবারের লোক দুঃখে এবং ক্রোধে আত্মহারা হইয়া মহাত্মাজীকে বুঝাইতে আসিলেন যে, মোপ্‌লাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না এবং তাহাদের সহিত হিন্দুর একতা কখনও স্থাপিত হইতে পারে না। তাহাদের হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত করিবার জন্য মহাত্মাজী সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐরূপ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে ভারতের পক্ষে স্থায়িভাবে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা পূরণ অসম্ভব। মোপ্‌লাদিগের কার্য্য নিতান্ত গর্হিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; তথাপি ঐ অত্যাচারের ক্লেশ তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে ইহাই মহাত্মাজীর উপদেশ এবং ভবিষ্যতে যাহাতে মোপ্‌লারা শিক্ষিত ও সংযত হইয়া চলিতে শিখে, তাহার চেষ্টা এখন হইতে করিতে হইবে।

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্ত্যজ জাতিসমূহের মধ্যে সেখানকার ব্রাহ্মণ জাতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিয়াছে, তাহারও নিষ্পত্তির জন্য মহাত্মাজীকে চেষ্টা করিতে হইতেছে। তিনি সম্প্রতি অন্ত্যজ জাতিদিগের একখানা ছাপান সার্কুলার-পত্র পাইয়াছেন। মাদ্রাজের

কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন,—"A most amazing document" অর্থাৎ, ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য ইস্তাহার। তাহার শিরোনামায় লেখা "Down with the Brahmans" ব্রাহ্মণদিগের নিপাত কর। তাহার পর মহাত্মাজী বলিলেন যে, সেই পত্রে যেরূপ ভাষা প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা পড়িয়া তাঁহার মনে হয়, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন বিষয়ে সময় থাকিতে যদি হিন্দুদিগের চেতনা না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে দক্ষিণ ভারতে সমাজ-বিধ্বংসি ভীষণ আন্তর্জাতিক বিদ্রোহের আবির্ভাব হইবে। তিনি মাদ্রাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে তাঁহার সেই আশঙ্কার কথা বলিয়া অস্পৃশ্যতা প্রথা যাহাতে শীঘ্র দূরীভূত হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মহাত্মাজীর মাদ্রাজ আগমন অবধি একমাত্র মিসেস্ বেসেণ্ট দল ব্যতীত অপর যত রাজনৈতিক দল আছে, সকলেরই কেন্দ্রস্থল মহাত্মাজী হইয়া পড়িয়াছেন এবং সকলেরই কথা তাঁহাকে মনোযোগের সহিত শুনিতে হইতেছে। তাহার উপর আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের ফলে তাঁহার দায়িত্ব ও কার্য্যভার বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিয়াছে। মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের সেক্রেটারী মিঃ হায়াৎ আসিয়া ১৬ই তারিখ প্রাতে সংবাদ দিলেন যে, মৌলানা সাহেবের খানসামা ফিরিয়া আসিয়াছে। মৌলানা সাহেবকে এক রাত্রি ভিজাগাপাট্টম্ জেলে রাখা হইয়াছিল, তাহারপর তাঁহাকে স্পেশ্যাল ট্রেণে করিয়া উত্তরদিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমরা সকলেই অনুমান করিলাম

যে, তাঁহাকে কারাচি লইয়া যাওয়া হইতেছে। মিঃ হায়াৎ করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, মৌলানা সাহেবকে সেই রাত্রিতে ভিজাগাপাট্টম্ জেলে কেবল দুগ্ধ ও পাউরুটি খাইতে দেওয়া হইয়াছিল; মৌলানা সাহেব তাহা খান নাই, এবং সমস্ত রাত্রি উপবাসী ছিলেন। এই সময় মহাত্মাজী কিছু লেখাপড়া করিবার জন্য মৌন হইয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ হায়াতের ঐ কথা শুনিয়া আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না এবং কয়েকবার মাথা নাড়িয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। দুধ ও পাউরুটি মহাত্মাজীর নিজের আহার, আলী ভাইদের ন্যায় বীরপুরুষের তাহাতে কি হইবে? গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় ভাবিয়াছে যে, অসহযোগী হইলেই তাহাকে মহাত্মাজীর ন্যায় কেবল একটু পাউরুটি ও দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে।
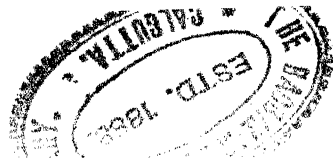
দ্বাবিংশ অধ্যায়

মাদ্রাজ সহর (২)

সাধারণ সভা-সমিতিতে মহাত্মাজীর বক্তৃতা অপরাপর স্থানের ন্যায় এখানেও চলিয়াছে। ১৫ই তারিখ সন্ধ্যার পর সমুদ্রের তীরে এক বিরাট সভা হইল। আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের পর মহাত্মাজীর এই প্রথম বক্তৃতা। সেই জন্য তাঁহার উপদেশ শুনিতে সভার অসংখ্য লোক ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। কেহ যেন তাঁহার বক্তৃতাকালে উল্লাসধ্বনি অথবা shame, shame (ধিক্, ধিক্) চীৎকার না করেন, মহাত্মাজী প্রথমেই এই অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, কেবল গভর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদ-স্বরূপ shame, shame (ধিক্, ধিক্) করিলে দেশের কাজ কিছুই অগ্রসর হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে যদি আমাদিগকে এই অল্প সময়ের মধ্যে কিছু ফললাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এখন অবধি আমরা যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছি, তাহা অপেক্ষাও দৃঢ়চিত্তে কাজে ব্রতী হইতে হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে, আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইয়া আসিতেছে; এই অল্প সময়ের মধ্যে কি উপায়ে এত বড় কাজ সম্পাদিত হইবে, ইহা সকলের পক্ষেই সমস্যা। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ভগবান্ আমাদের

সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এই কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন এবং যদিও আমরা এখন এত দুর্ব্বল ও অপটু, তথাপি ভগবানের ইচ্ছায় এক মুহূর্ত্তেই আমরা জয়লাভ করিতে পারি, ইহা আমি সকলকেই বিশ্বাস করিতে বলি।

আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী বলিলেন যে, তাঁহাদের এই গ্রেপ্তার ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ তিনি গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহারা প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় যতদূর সম্ভব ধর্ম্ম এবং সত্যের পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। মৌলানা মহম্মদ আলী শান্তিস্থাপন-রূপ মঙ্গল উদ্দেশ্যে মালাবারে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে কেন গ্রেপ্তার করা হইল, এই প্রশ্নের উত্তর বড়লাট রেডিং বাহাদুরের দেওয়া কর্ত্তব্য। যে দিন মৌলানা মহম্মদ আলী মহাত্মাজীর পরামর্শ মত সংবাদ-পত্রে প্রচার করিলেন যে তাঁহার নামে দাঙ্গা-ফ্যাসাদের উত্তেজনা প্রদানের যে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অলীক, এবং বর্ত্তমান অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সংস্রবে থাকিয়া ঐরূপ উত্তেজনা প্রদান তাঁহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব, সে দিন হইতে মহাত্মাজী বলিলেন, মৌলানা সাহেব তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। সেই জন্য মহাত্মাজী সকলের নিকট সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, মৌলানা সাহেব এক চুল তাঁহার প্রতিশ্রুতি হইতে বিচ্যুত হন নাই। যাঁহারা গোপনে বা প্রকাশ্যে তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিতেন, সকলকেই তিনি অহিংস-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতেন। তবে আলী-ভ্রাতারা কাপুরুষ নহেন; কেহ যদি

মনে করিয়া থাকেন যে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহারা নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তবে তাহা তাঁহাদের মস্ত ভুল। আলী-ভ্রাতাদের ন্যায় একাধারে তেজস্বী ও সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক মহাত্মাজী প্রায় দেখেন নাই। তাঁহারা সময় সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিলেও তাহা সত্যের অনুরোধে করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাত্মাজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতের সর্ব্বত্র এই সময় শান্তিরক্ষার জন্য তাঁহারা যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন, এইরূপ আর অন্য কোন মুসলমান করেন নাই। সেই জন্য তিনি মনে করেন যে আলী-ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিয়া গভর্ণমেণ্ট বস্তুতঃ খিলাফৎকেই কারারুদ্ধ করিলেন।

ইহার পর মহাত্মাজী মাদ্রাজের মোপ্‌লা হাঙ্গামা লইয়া দেশে যে সরকারী দমন-নীতি চলিয়াছে, কোথায়ও বা লোকের মাথা হইতে জোর করিয়া খদ্দরের টুপি ও দেহ হইতে জামা ছিঁড়িয়া তাহাদিগকে অপমান ও নির্য্যাতন করা হইতেছে; অন্ধ্র প্রদেশে গৃহস্থদিগের গরু জোর করিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে; এই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিলেন। মহাত্মাজী বলিলেন—যদ্যপি এই সমস্ত অত্যাচার হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান আন্দোলনের অহিংসাত্মক পদ্ধতি হইতে এক চুল বিচ্যুত হইলে চলিবে না। আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া যদি আমাদের সমস্ত জাতীয় দাবী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আদায় করিতে হয় এবং যদ্যপি আমাদিগকে মৌলানা মহম্মদ আলী ও অন্য যে সকল দেশসেবককে গভর্ণমেণ্ট অন্যায়রূপে কারারুদ্ধ

করিতেছে, তাহাদিগকে মুক্ত করিতে হয়, তবে তাহা স্বরাজ স্থাপন করিয়াই করিতে হইবে।

কিন্তু স্বরাজ কিরূপে স্থাপিত হইবে? রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে অহিংসার অভ্যাস, হিন্দু-মুসলমানের একতা স্থাপন এবং খদ্দর গ্রহণ এই তিনটী স্বরাজলাভের উপায়; ইহার অতিরিক্ত নূতন কিছু উপায় তাঁহার বলিবার নাই। তিনি মনে করেন, দেশে রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে যতই অহিংসভাবের প্রভাব বিস্তৃত হইবে, ততই হিন্দু-মুসলমানের একতা বৃদ্ধি পাইবে; এবং 'অহিংসা' ও হিন্দু-মুসলমানের একতা—এই দুই বস্তু খদ্দর প্রসারের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবে। অহিংস-পদ্ধতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে তখনও বিদেশী বস্ত্রের প্রাচুর্য্য দেখিয়া বলিলেন যে, তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতেছে, এবং বেগম মহম্মদ আলী-সাহেবা ও আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া তিনি সভাস্থলের স্ত্রী পুরুষ সকলকেই বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ করিয়া খদ্দর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

অসহযোগের কোন কোন অঙ্গ লইয়া যদি কেহ কোন আপত্তি, অথবা শক্তির অভাবে তাহা পালন করিতে অসমর্থ— এইরূপ তর্ক উত্থাপন করেন, তথাপি স্বদেশী সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ থাকা সম্ভব বা উচিত নহে; মহাত্মাজী এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। 'স্বদেশীব্রত' দেশের আপামর-সাধারণের ধর্ম্ম। আমাদের এই যুদ্ধ যেমন ধর্ম্ম-যুদ্ধ, সেইরূপ ভগবানের কৃপায় আমাদের সৈন্যশ্রেণীতে কোনরূপ উচ্চ-নীচ ভেদ নাই;

ইহাতে ধনী, নির্ধন, অস্পৃশ্য, অন্ধ, আতুর, বালক, বৃদ্ধ সকলেই খদ্দর গ্রহণ দ্বারা সমান পদবী বা অধিকার লাভ করিতে পারিবে, ইহাও তিনি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

ইহার পর তিনি চরকা সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটী প্রাণের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। চরকার প্রশংসা আরম্ভ করিলে মহাত্মাজীর আনন্দের বেগ-সম্বরণ কঠিন হইয়া পড়ে। এই চরকার মধ্যে তিনি ভারতের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী দেখিতে পাইতেছেন। চরকার কৃতকার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় অবসাদ কাটিয়া যাইবে, এবং আমরাও যে অকর্ম্মণ্য নহি, প্রাণে এইরূপ বল ও ভরসা আসিবে। দেশে অহিংসা-ধর্ম্মের কতটা প্রসার হইয়াছে, তাহা চরকার প্রসার দেখিয়া বুঝা যাইবে। চরকাই ভারতের আন্তর্জাতিক একতার মূলস্বরূপ হইবে। এই একতা কেবল হিন্দু-মুসলমানের একতা নহে; ভারতের অপর যে সমস্ত জাতি বসবাস করিতেছে, চরকার প্রসাদে সকলের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতি স্থাপিত হইবে। চরকাই স্ত্রীলোকদিগের সতীত্বের নিদর্শন-স্বরূপ পরিগণিত হইবে। এই চরকার অভাবে কত অভাগা স্ত্রীলোক কেবল জীবিকার জন্য সতীত্ব-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য মহাত্মাজী দিতে পারেন। চরকা দেশের বিধবাদিগের নিত্য সহচর হইবে। এই চরকাই পূর্ব্বে আমাদের দীন, দরিদ্র কৃষিজীবীদিগের কয়েক মাসের এক মাত্র সম্বল ছিল; ইহা কত লোককে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? প্রতি গৃহে যখন এই চরকার কাজ

সুচারুরূপে চলিতে থাকিবে, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝা যাইবে যে, আমরা এতকাল শারীরিক শ্রমকে ঘৃণা করিয়া কেবল মস্তিষ্কচালনাকে যে প্রাধান্য দিয়াছিলাম, আমাদের সেই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। চরকা অস্পৃশ্য জাতিদিগের হৃদয়ের সম্বল এবং এই চরকা দ্বারাই ভারতের পতিতা স্ত্রীলোকদিগের উদ্ধারের উপায় হইতে পারিবে। পরিশেষে মহাত্মাজী বুঝাইয়া দিলেন যে, এই চরকা যখন স্থায়িভাবে আমাদের গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে এবং আমাদের দৈনিক জীবনের সহচর হইবে, তখনই দেশের উদ্ধারের জন্য সার্ব্বজনীন সবিনয় আইন ভঙ্গ (Mass civil disobedience) অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইবে। ক্রোধের অধীন হইয়া, উত্তেজনার দ্বারা বিচলিত হইয়া, আইন ভঙ্গ করিলে তাহা কখনই 'সবিনয়' (Civil) আইনভঙ্গ হইবে না। যদ্যপি এই বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ স্থাপনের জন্য রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে দেশের সর্ব্বত্র অহিংসার প্রভাব বিস্তার আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে চরকা ব্যতীত অপর কোন যন্ত্র নাই, যাহার সাহায্যে সমগ্রভাবে দেশের শুদ্ধি সম্পাদিত হইতে পারিবে, ইহাই চরকা সম্বন্ধে মহাত্মাজীর শেষ কথা।

বক্তৃতা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে মহাত্মাজী সকলকে সভা-সমিতিতে হৈ চৈ এবং চীৎকারধ্বনি করিতে পুনরায় নিষেধ করিলেন। বহুকালের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিয়াছেন যে অযথা চীৎকার, হৈ চৈ বা গোলমাল করিয়া রক্ত গরম করিলে সেই সূত্রেই ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতে হিংসা বা অপরের অনিষ্ট-

চেষ্টা স্বতঃই উদ্ভূত হয়। সেজন্য ধীর, স্থির, শান্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে অহিংসার অভ্যাস করিতে হইলে ঐরূপ অযথা উত্তেজনা পরিহার করিতে হইবে। তিনি সকলকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে বৎসরের অবশিষ্ট কয়মাস্ কাল চারিদিকে অশান্তি, গোল-মাল, দুঃখকষ্ট ও কারাবাসের সময়। আলোক আসিবার পূর্ব্বক্ষণে অন্ধকার গাঢ়তম হয়, কিন্তু সেই গাঢ় অন্ধকারই উষার সূচনা। সেইরূপ দেশের চারিদিকে যে ঘন অন্ধকার ঘেরিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যেই তিনি বলিলেন যে, সকলে বিশ্বাসীর নয়নে উষার ক্ষীণ আলোক-রেখা দেখিতে পাইবেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

"শত্তুং পোড়াদে—শত্তুং পোড়াদে"

১৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা মাদ্রাজ সহর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে রামেশ্বরের দিকে ছুটিলাম। মহাত্মাজী প্রথম তামিলনাড়ু প্রদেশে ভ্রমণ করিবেন, তাহার পর বম্বে ফিরিবার পথে অন্ধ্র প্রদেশের কয়েকটি জেলা পরিদর্শন করিবেন। অন্ধ্র প্রদেশে ভ্রমণের 'প্রোগ্রাম' স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তামিলনাড়ুর 'প্রোগ্রাম' স্থির করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। উপস্থিত তিনি পর্টোনভো, কডলুর ও কুম্ভকোনম্ হইয়া ত্রিচিনপল্লী চলিলেন।

রাত্রি থাকিতে থাকিতে আমরা বাসা হইতে যাত্রা করিয়া, ভোর হয় হয়, এমন সময় "রামেশ্বরম্ এক্সপ্রেস্" নামে এক ট্রেণ ধরিবার জন্য মাদ্রাজের এগ্‌মোর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই ট্রেণ "সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে"র ট্রেণ; মিটার গেজ লাইন এবং গাড়িগুলি ছোট। কিন্তু একটা সুবিধা এই যে, ট্রেণের এক-দিক্ হইতে অপর দিকে শেষ পর্য্যন্ত চলাফেরা করিবার বারান্দা (corridor) আছে। ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া লাগিলেই আমরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া মালপত্র লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ষ্টেশনে তখন ভিড় ছিল না; আর দেখিলাম, মাদ্রাজ প্রদেশে অন্যান্য স্থানের ন্যায় স্বেচ্ছাসেবকের বাহুল্য নাই। বেলা দশ এগারটার সময় ভিল্লুপুরম্ পৌছিয়া দেখি, লোকের ভিড়ে ষ্টেশনে

সরিষাপাতেরও স্থান নাই। স্বেচ্ছাসেবকের অভাবে সেই ভীষণ জনতার মধ্যে সকলেই সকলকে শান্ত ও সংযত করিতে যাইয়া মহা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। কেহ "ওক্কা রুঙ্গা, ওক্কা রুঙ্গা" বলিয়া সম্মুখের লোকের ঘাড় ধরিয়া চাপিয়া বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বা তামিল ভাষায় "শত্তং পোড়াদে" "শত্তং পোড়াদে" বলিয়া শান্ত হইতে বলিতেছেন। এইরূপ একে অপরকে "শত্তং পোড়াদে" "শত্তং পোড়াদে" বলায় গোলমাল আরও বাড়িতে লাগিল।

এইরূপ চারিদিকের শব্দ, হৈ চৈ এবং গণ্ডগোলের মধ্যে মহাত্মাজী একবার ট্রেণ হইতে নামিয়া গিয়া তিলক-স্বরাজ্য ফণ্ডের জন্য একতোড়া টাকা লইয়া আসিলেন। আমরা যে নামিব, এমন সাধ্য কি? নামিলে আর ট্রেণে উঠিবার ভরসা নাই, লোকের ধাক্কাধাক্কিতে কোথায় যে চলিয়া যাইব তাহার ঠিক নাই। সেই ভয়ে যে যাহার স্থানে চুপ্‌চাপ্ বসিয়া রহিলাম। এদিকে অনেক ধাক্কাধাক্কি করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া একসঙ্গে দশ বিশজন লোক ট্রেণের জানালা দিয়া মাথা প্রবেশ করাইয়া বিস্ফারিত নয়নে আমাগকে দেখিতে লাগিল। তাহার পর পিছনের লোকের ধাক্কাতে তাহারা চলিয়া গেল; আবার ঐরূপ দশ বিশজন করিয়া এক সঙ্গে জানালার মধ্যে মাথা দিতে লাগিল, এবং যতক্ষণ না ট্রেণ ছাড়িল, এই প্রকারই চলিতে লাগিল। তামিলনাড়ুর লোকদিগের কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম এবং চলাফেরা—সমস্তই এত ক্ষিপ্রগতিতে হয় যে এরূপ আর কোন স্থানে দেখি নাই।

বেলা দেড়টার সময় পর্টোনভো পৌছিয়া, ষ্টেশন হইতে বহুদূরে মিস্ পেটারসন্ নাম্নী এক ডাচ্ (Dutch) মহিলার ভবনে আমরা অতিথি হইলাম। মিস্ পেটারসন্ খ্রীষ্টান মহিলা হইলেও দেশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় শাড়ী পরিয়া খালি পায়ে থাকেন, এবং তামিল বলিতে শিখিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে অনেক চরকা দেখিলাম, তাহার সাহায্যে তিনি স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগকে সূতাকাটা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার বাড়ীতে চরকার বাহুল্য হইতেই বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি মহাত্মাজীকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তিনি এখানে এক স্কুলগৃহ স্থাপন করিয়াছেন, এবং মহাত্মাজীর দ্বারা তাহার কার্য্য আরম্ভ করাইবেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। আতিথ্য-কার্য্যে মিস্ পেটারসনের সাহায্য করিবার জন্য আরও দুইজন ইউরোপীয় মহিলা এই সময় এখানে ছিলেন। সাধারণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় তাঁহাদের পোযাক। তাঁহারা সকলেই আমাদের খুব যত্ন করিতে লাগিলেন।

মিস্ পেটারসনের স্কুলের দ্বারোন্মোচন করিয়া মহাত্মাজী মোটরে করিয়া বিশ মাইল দূরে কডলুর সহরে গিয়া সভা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। সময় অল্প বলিয়া শীঘ্র প্রস্তুত হইবার জন্য তাড়া পড়িতে লাগিল। মহাত্মাজী আসিয়া পৌছামাত্র এখানকার খ্রীষ্টান স্ত্রী-পুরুষেরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নানারূপ ধর্ম্মকথার অবতারণা করিলেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত এমনভাবে মিশিতে লাগিলেন যেন তিনি তাঁহাদেরই একজন ধর্ম্ম-ভ্রাতা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার প্রধান প্রধান বন্ধুর মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টান ছিলেন, এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ইহাও বলিলেন যে তাঁহার নিজের জীবনে এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন তিনি প্রকাশ্য ভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন কি না এই কথা বিবেচনা করিতে-ছিলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ঐরূপ কিছু ঘটে নাই। এই কথা শুনিয়া একজন দেশীয় খ্রীষ্টান মহিলা বলিলেন যে এখনও তাঁহারা আশা করেন যে মহাত্মাজী একদিন খ্রীষ্টান হইবেন। কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস, খ্রীষ্টান না হইলে কাহারও পরিত্রাণের উপায় নাই; যীশুই Prince of Peace শান্তিরাজ্যের অধিপতি। তিনি ভিন্ন কাহারও শান্তি দিবার অধিকার নাই। মহাত্মাজী তাহাতে হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"একথা তুমি বিশ্বাস কর বটে, কিন্তু সেইরূপ হিন্দুরাও বিশ্বাস করেন যে, হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম অবলম্বনে মুক্তিলাভ হইতে পারে না। মুসলমানেরাও তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সেই প্রকার মত পোষণ করেন।" একজন সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের নাম করিয়া মহাত্মাজী বলিলেন—"আমি যখন সাউথ আফ্রিকায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যাই, আমাকে প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—"Have you got peace?" আপনি কি শান্তি পাইয়াছেন? আমি উত্তরে বলিলাম,—'হাঁ পাইয়াছি।' তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইলেন এবং খ্রীষ্টান না হইয়াও কিরূপে আমি শান্তি পাইলাম এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মাজী পুনরায় বলিতে

লাগিলেন—"বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মের গোড়ার কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলে ধর্ম্ম লইয়া জগতে যে দ্বন্দ্ব আছে, তাহা কখনই থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ মানুষকে পবিত্র করিবার চেষ্টা আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ scientific অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, এরূপ আর কোন ধর্ম্ম নহে। তাহাতেই আমি আমার ধর্ম্ম আঁকড়াইয়া আছি। আমার ইহা গোঁড়ামী নহে, আমি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়াই বলিতেছি।" খৃষ্টান-ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এক ব্যক্তির আকৃতি ও গালভরা দাড়ি দেখিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইতে লাগিল, কিন্তু মহাত্মাজী উঠিয়া স্নান করিতে গেলে তিনি যখন উচ্চৈঃস্বরে তামিল গান করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমার সেই সন্দেহ মিটিয়া গেল।

এখান হইতে বাহির হইয়া মহাত্মাজী প্রথমে মিস্ পেটারসনের স্কুলে গেলেন, তাহার পর জনসভায় চলিয়া গেলেন। আমি, প্রভুদাস এবং মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেবের ছাত্র ও সহচর আনোয়ারউদ্দিন আমরা এই তিন জনে বাড়ীতে রহিলাম। আনোয়ার তামিল দেশের ভাষা বুঝিতে না পারিয়া বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিল; তাহার উর্দ্দু কথা এখানকার লোকেরা বুঝিতে পারে না দেখিয়া মধ্যে মধ্যে সে ঘোর বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং মৌলানা তাহাকে এমন দেশে কেন আনিয়াছেন ইহাই তাহার বিশেষ দুঃখের কারণ হইল। মহাত্মাজী সভায় চলিয়া যাইলে পর আমাদের আবাসস্থলে

যে মহা সোরগোল উপস্থিত হইতেছিল তাহা এক মুহূর্ত্তে সমস্ত শান্ত হইয়া গেল। পর্টোনভো সহরে দেখিবার মত জিনিষ বিশেষ কিছুই নাই; কিন্তু স্থানের নাম হইতে ইহার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে বুঝা যায়। যোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা এই সহর প্রথমে স্থাপন করে। তাহার পর যখন যে পাশ্চাত্য জাতি দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, তাহাদেরই আধিপত্য এখানে স্থাপিত হইয়াছে। এখন ইহা ইংরাজদিগের অধীন। এই স্থানে মহীশূরের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ হায়দার আলির সহিত ইংরাজদিগের এক ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে যদি ইংরাজেরা সেই যুদ্ধে পরাজিত হইত, তাহা হইলে দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ-আধিপত্য বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিত না। সহরের পার্শ্ব দিয়া ভালুর নদী নিকটস্থ সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। এখানে কয়েক ঘর সমৃদ্ধিসম্পন্ন আরব-বণিক্-পরিবারের বসতি আছে। ভারত-সাগরে পাশ্চাত্য প্রভাবের বিস্তারের পূর্ব্বে আরব জাতির বহু শতাব্দীব্যাপী প্রাধান্য ছিল, তাহারই নিদর্শন যেন এই বণিকেরা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

মহাত্মাজীর কডলুর হইতে ফিরিয়া আসিতে রাত্রি ১টা বাজিয়া গেল। তাহার পরদিন ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় তল্পি-তল্পা লইয়া আমরা কুম্ভকোনম্ রওনা হইলাম। ষ্টেশনে আসিয়া দেখি, যে ট্রেণে যাইব বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে কেবল রেলের পার্শেল টানা হয়; যাত্রীর গাড়ী একখানাও নাই। কিন্তু ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা নিজ হইতেই

একখানা পার্শেল-টানা গাড়ী খালি করিয়া দিল, তাহাতে চড়িয়া বেলা ১১টার সময় আমরা কুম্ভকোনম্ পৌছিলাম। কুম্ভকোনমে এক 'মহামোক্ষম্' সরোবর আছে, তাহাতে দ্বাদশ বৎসর পরে এক দিন গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হয় বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। ঐ দিন লক্ষ লক্ষ লোক এই সরোবরে স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে। আমি সন্থ সন্থ বারাণসীর গঙ্গাতট হইতে আসিয়া এই নকল গঙ্গা মহামোক্ষমের মহিমা আর কি অনুভব করিব? সেই দিনই ৫টার সময় আমাদিগকে কুম্ভকোনম্ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। মহাত্মাজী কুম্ভকোনমে আসিয়াই বেলা দুইটা অবধি মৌন গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার পর প্রথমে তিনি তন্তুবায়দিগের সভায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সুরাপান বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়া খদ্দর বুনিতে উৎসাহ দিলেন। ইহার পর প্রকাশ্য সভা। সেই সভার বর্ণনা কিরূপে করিব? আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে থাকিয়াও শারীরিক শক্তির অভাবে সভায় প্রবেশ করিতে পারিলাম না।

মহাত্মাজী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়া চারিদিকের গোল-মালের জন্য তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব জনতাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। সভার সকলেই একে অপরকে শান্ত করিতে যাইয়া প্রাণপণে "শত্তং পোড়াদে" "শত্তং পোড়াদে" শব্দ করিতে থাকিলেও, শান্তি কিছুতেই স্থাপিত হইল না। তাহার পর পাঁচটার সময় ট্রেণে যাইবার জন্য তাঁহারা সভাস্থল হইতে চলিয়া আসিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ত্রিচিনপল্লী

১৮ই সেপ্টেম্বর বৈকাল পাঁচটার সময় কুম্ভকোনম্ ত্যাগ করিয়া রাত্রি আট্টার সময় আমরা ত্রিচিনপল্লী পৌঁছিলাম। সেদিন রবিবার বলিয়া সন্ধ্যার পরেই মহাত্মাজীর মৌনগ্রহণের সময় উপস্থিত হইয়াছিল। এতদিন আমি দেখিয়া আসিতে-ছিলাম যে রবিবারে সন্ধ্যা সাতটা হইতেই তিনি মৌন গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ঐ দিন ট্রেণে বসিয়া তিনি সকলের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। সাতটা বাজিয়া গেল দেখিয়া আমার মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে অনবধানবশতঃ তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যায়। সেই জন্য তাঁহাকে বলিলাম— সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহাকে মৌন গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার নিয়ম রক্ষার জন্য আমার ব্যস্ততা দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন এবং যে কথা বলিতেছিলেন তাহা সমাপ্ত করিয়া তখনই মৌনী হইলেন। পরে অন্যান্য রবিবারে দেখিলাম, সন্ধ্যা সাতটার সময়ই মৌন গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার এমন কোন নিয়ম ছিল না। রবিবার রাত্রির প্রথম ভাগে যে কোন সময় মৌন গ্রহণ করিয়া পরদিন ঠিক ঐ সময় তাহা ভঙ্গ করিলেই হইল। বহুদিন পরে সেই দিন মহাত্মাজীকে একটু মন খুলিয়া প্রফুল্লচিত্তে গল্প করিতে দেখিলাম; কিন্তু তাহাও তিনি আমার

অনভিজ্ঞতার ফলে অধিকক্ষণ করিতে পারিলেন না, ইহা স্মরণ করিয়া আমার বড় অনুতাপ বোধ হইতেছে।

ত্রিচিনপল্লী পৌঁছিয়া দেখি, তাঁহার মৌনবার বলিয়া সেই দিন ষ্টেশনে যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল সকলে গোলমাল না করিয়া নিঃশব্দে তাঁহাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া লইয়া গেল। গত দুই দিন জনতার বিশৃঙ্খলা ও সংঘট্টে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এখানকার লোকের সংযম এবং শান্তভাব দেখিয়া প্রাণে বড় আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। আমরা ষ্টেশনের নিকটেই প্রান্তীয় কংগ্রেস-কমিটীর সেক্রেটারী ডাক্তার রাজনের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। ডাক্তার রাজন তখন নিজের বাড়ীকে একটী আশ্রমে পরিণত করিয়াছেন। তিনি মহাত্মাজীকে বলিলেন যে তাঁহার বাড়ীতে এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে কাহারও জন্য পরিবার কাপড় কেনা হইবে না; সকলকে নিজ নিজ কাপড়ের সূতা কাটিয়া লইতে হইবে। সহরের কোলাহল হইতে দূরে, প্রকাণ্ড বাগিচার মধ্যে ডাক্তারের বাড়ী। আমরা অনেক ঝঞ্ঝাবাত ভোগ করিয়া এখানে আসিয়া কূল পাইয়া পথের শ্রান্তি অপনোদন করিতে লাগিলাম।

পরদিন সোমবার বলিয়া বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও মহাত্মাজীর নিকট আসিবার অধিকার ছিল না। অধিকাংশ সময় আমি তাঁহার নিকট বসিয়া পাহারা দিতেছিলাম। বোধ হইতেছিল, তাঁহার শরীর বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। গত রাত্রিতে শয়নের পর প্রভুদাসকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ

অবধি পা ডলাইয়াছিলেন। আজও দ্বিপ্রহরে হঠাৎ আমাকে লিখিয়া বলিলেন—"My legs require oiling and shampooing",—"অর্থাৎ আমার পায়ে তেল মালিস ও পা টিপিয়া দেওয়া দরকার হইয়াছে।" লেখা পাঠ করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তেল আনিয়া পায়ে মালিস করিয়া দিতে লাগিলাম। মালিসের সময় অল্পে অল্পে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

গত দুই দিন তাঁহাকে অনেক সময় ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার-সমস্যা-সম্বন্ধীয় জনৈক পণ্ডিতের একখানা পুস্তক খুব মনোযোগসহকারে পড়িতে দেখিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তা মহাত্মাজীকে বলিয়াছেন যে তিনি যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বর্ত্তমান আন্দোলন চালাইতেছেন, তিনিও পুস্তকে তাহারই পোষকতা করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার মত সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে আমার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, সেজন্য এখানে সময় পাইয়া কোথায় কোথায় মহাত্মাজীর মত এবং আদর্শের বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া এক সমালোচনা লিখিয়া আমি মহাত্মাজীর সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। তিনি তাহা পাঠ করিয়া দুইটী মন্তব্য লিখিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা সম্বন্ধে আমার সমালোচনা ঠিক হইয়াছে বলিয়াই লিখিয়াছিলেন; তবে এক স্থানে ভারতের unemployment (বেকার) সমস্যার কারণ সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম যে, ইহা বর্ত্তমান Capitalist (মহাজনী) জগতের unemployment (বেকার) সমস্যার অঙ্গীভূত এবং একই রোগের অভিব্যক্তি,—

সেই অংশটুকু চিহ্নিত করিয়া তাহার পার্শ্বে লিখিয়া দিলেন—Is that so ? "অর্থাৎ ইহাই কি প্রকৃত কথা ?" আমি তাঁহার এই প্রশ্নের মর্ম্মগ্রহণ প্রথমে করিতে পারি নাই। পরে ভাবিয়া দেখিলাম, তিনি ঠিকই বুঝিয়াছেন। আমাদের দেশের unemployment বা বেকার-সমস্যা অথবা দুর্ভিক্ষ এবং লোকের দুঃখ-কষ্ট, প্রধানতঃ পাশ্চাত্য-বাণিজ্য-ব্যবসাসূত্রে আমাদের ধন-দৌলতের শোষণ-ফল-স্বরূপ (exploitation)। পক্ষান্তরে বিলাতের unemployment বা বেকার-সমস্যা সাধারণের কষ্টলব্ধ অর্থের বণ্টনের (distribution) অসামঞ্জস্য দোষেই সংঘটিত হইয়াছে। এই পার্থক্য তখন আমার লক্ষ্যের মধ্যে আসে নাই। Capitalism বা মহাজন-তন্ত্রের প্রভাবে মানুষ নিজের পল্লী ও সমাজের মধ্যে অবস্থান করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেখানে চলিয়া যাইতেছে এবং দেশের চারিদিকে ধ্বংসের এক ভীষণ মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহাই প্রধানতঃ আমার লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। বিলাতেও একশত বৎসর পূর্ব্বে কল-কব্জার (machinery) আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থার সহিত আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার সাদৃশ্য আছে ভাবিয়া স্থূলতঃ Capitalism বা মহাজন-তন্ত্রকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু মহাত্মাজীর ঐরূপ প্রশ্ন হইতে আমাদের উপর নিষ্ঠুরভাবে যে exploitation বা শোষণনীতির অপ্রতিহত ক্রিয়া চলিয়াছে

তাহা আমার হুঁস হইল। সেই সমালোচনার শেষভাগে আমি লিখিয়াছিলাম—

"In India we do not require to build on any new basis, but only to revive by bringing life-blood into the dying or decaying parts of the social body politic. Therefore the mere insistence by the author on the need for the use of the hand or of manual labour for productive purposes does not prove that his plan of work is identical with the plan of resuscitation aimed at by the movement of Non-co-operation."

অনুবাদ—"ভারতে কোন নূতন প্রণালী উদ্‌ভাবন করিয়া আমাদিগের সমাজ-গঠনে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কেবল সমাজদেহের যে যে অংশ নিস্তেজ ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, জীবনী-শক্তি সঞ্চার দ্বারা তাহাকে সতেজ করিয়া তুলিতে হইবে। অতএব কেবল শারীরিক পরিশ্রম বা হাতের কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবার আদর্শ প্রচার করেন বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তার গঠনপ্রণালীর কার্য্য এবং মহাত্মাজীর অসহযোগ প্রণালীর কার্য্য এই দুইই সমশ্রেণীভুক্ত এইরূপ বলা ঠিক নহে।"

মহাত্মাজী আমার এই সমালোচনা সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিলেন না; তাহা হইতে বুঝিতেছি যে তিনি ইহা অনুমোদন করিয়াছিলেন।

এদিকে তখন সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যে, আলি-ভ্রাতাদিগকে কারাচিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং ভারতীয় সেনা মধ্যে অসন্তোষ বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সোপর্দ্দ করা হইতেছে। মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের সেক্রেটারী হায়াৎ সাহেব এই দিন ত্রিচিনপল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আলি-ভ্রাতাদের Statement (মন্তব্য লিপি) * লইয়া বড়লাট্ রেডিং সাহেবের সহিত মহাত্মাজীর যে চিঠি-পত্র লেখালেখি হইয়াছিল, তাহা হইতে যাহা দরকার নকল করিয়া সন্ধ্যার ট্রেণে তিনি মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন।

পরদিবস মহাত্মাজীর ত্রিচিনপল্লী হইতে চেত্তিনাদ নামে এক স্থানে মোটরে করিয়া যাইবার কথা ছিল। চেত্তিনাদ যাইবার পথের কিয়দংশ স্থানীয় পুডুকোটার রাজার রাজত্ব মধ্যে অবস্থিত। মহাত্মাজী সেই পথে যাইবেন শুনিয়া রাজ-দরবার হইতে এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাতে তাঁহাকে ঐ রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। ঐ রাস্তা যদিও পুডুকোটার সীমানার অন্তর্ব্বর্ত্তী, তথাপি সকলেই চিরকাল ইহা নির্ব্বিবাদে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এবং রাজ-দরবার পূর্ব্বে কখনও এই ভাবে কর্ত্তৃত্বের পরিচয় দেন নাই। আজ হঠাৎ এই প্রকার হুকুম

* আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের এই Statement বা মন্তব্যলিপি অসহযোগ আন্দোলনের একটি বিশেষ ঘটনা। বড়লাট্ রেডিং সাহেব ভারতে পদার্পণ করিয়াই ঐ ঘটনা অবলম্বনে রাজনৈতিক চতুরতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। এক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আসিতে দেখিয়া সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, ইহা সেখানকার ইংরাজ-রেসিডেণ্টের কার্য্য। স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারী ডাক্তার স্বামীনাথ শাস্ত্রী হাসিতে হাসিতে এক লম্ফ প্রদান করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, পুডুকোটার রাজ্য তিনি এক লাফে পার হইয়া যাইতে পারেন। যাহা হউক, মহাত্মাজীর নিকট রাজ-দরবারের পত্র পেশ করা হইল। তখন তিনি নম্রভাবে তাহার উত্তরে লিখিয়া দিলেন যে, তাঁহার ঐ পথে চেত্তিনাদ যাওয়া স্থগিত রহিল। সেই সময় ব্যাপারটি বুঝিবার জন্য তাঁহাকে লিখিয়া লিখিয়া যে সকল প্রশ্ন করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বহস্তের লেখাতেই সন্নিবিষ্ট আছে। পর পৃষ্ঠায় উক্ত লেখার প্রতিলিপি দেওয়া হইতেছে। সোমবারে মৌনাবস্থায় তিনি কি ভাবে কার্য্য করিতেন, তাহাও ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

সন্ধ্যার পর মহাত্মাজীর মৌনভঙ্গ হইলে জনসভায় যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। সভাস্থলে যাইবার পথে স্থানে স্থানে রাজপথ তোরণাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া ত্রিচিনপল্লীর অধিবাসিবর্গ মহাত্মাজীর যেরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছিল, সেইরূপ অভ্যর্থনা আর কোনও স্থানে হয় নাই। তাহার পর ত্রিচিনপল্লীর সভাস্থলে যে প্রকার শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা হইয়াছিল তাহাতেও মহাত্মাজী বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

মহাত্মার হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

What is it we
are supposed
really to do
What is chettinad
Therefore we have
to go there? How
far is Pudukottai
from here?
This has come
by post. ~~Where~~ ~~the man~~ Let him wait
for a reply.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ত্রিচিনপল্লী

(২)

স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি এবং কংগ্রেস-কমিটীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইলে মহাত্মাজী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। প্রথমেই তিনি আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিলেন। তাঁহারা ভারতীয় সৈন্যদিগের রাজভক্তি নষ্ট করিতেছিলেন, এই অভিযোগে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; এই মর্ম্মে বম্বে গবর্ণমেণ্টের এক মন্তব্য বাহির হইয়াছে। তাঁহারা কিরূপে এই রাজভক্তি নষ্ট করিতেছিলেন, তাহাও উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে। কারাচির খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সে আলি-ভ্রাতাদের সহযোগে একটি মন্তব্য পাশ হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, সকল মুসলমানের পক্ষেই সরকারী সৈন্য-বিভাগে চাকরী করা "হারাম"। মহাত্মাজী বলিলেন যে তিনি যদি কারাচি কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও উক্ত মন্তব্যের পোষকতা করিতেন। কোন্ কাজ মুসলমানদের ধর্ম্মানুমোদিত এবং কোন্ কাজ ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা কেবল মুসলমান ভ্রাতারাই বলিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু এবং সাধারণভাবে সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষ হইতে তিনি বলিতে পারেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় সৈনিক অথবা অপর কোন সরকারী বিভাগে চাকরী করা প্রত্যেক

ভারতীয়ের পক্ষেই "হারাম"। এই কথা প্রকাশ্যভাবে, এমন কি সৈনিকদিগের সম্মুখে যাইয়া বলাতে যদি কোন অপরাধ হয়, তাহা হইলে এইরূপ অপরাধ তিনি অসংখ্য বার করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইহা কোন নূতন অপরাধ নহে। ইহার ফলাফল সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই তিনি গত সেপ্টেম্বর মাসের কলিকাতা স্পেশ্যাল কংগ্রেসের সময় হইতেই এই অপরাধ করিতে স্থরু করিয়া নাগপুর কংগ্রেসে ইহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। আজ তিনি অথবা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সৈনিক অথবা সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কংগ্রেসের ঐ মন্তব্য অনুসারে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ প্রবৃত্তির ন্যূনতা নহে—শক্তির অভাব। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন অনশনক্লিষ্ট হইয়া দিনযাপন করিতেছে। তাহার উপর সৈনিকদিগকে চাকরী ত্যাগ করাইয়া তাহাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতে অসমর্থ বলিয়াই তিনি তাহাদিগের প্রত্যেককে সরকারী চাকরী ত্যাগ করিতে বলিতে পারিতেছেন না। মহাত্মাজী বলিলেন,—"আমি গবর্ণমেণ্টকে পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া দিতেছি, যে মুহূর্ত্তে বুঝিব, যে লোকে চরকা এবং তাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে শিখিয়াছে এবং খদ্দরের প্রতি সাধারণের অনুরাগ জন্মিয়াছে; আর যখন বুঝিব যে, সৈনিকেরা এবং অপরাপর সরকারী কর্ম্মচারীরা চাকরী ত্যাগ করিয়া সহজেই চরকা এবং তাঁত অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইবে, তখন

যদি গবর্ণমেণ্ট আমার স্বাধীনতা হরণ না করে, এবং আমার দেহে শক্তি থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক সিপাহী এবং সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া আমি তাহাদিগকে সরকারী চাকরী ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিব।"

ইহার পর আলি-ভ্রাতাদের গ্রেপ্তার সত্ত্বেও দেশের চতুর্দ্দিকে শান্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে দেখিয়া মহাত্মাজী আনন্দ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, এই শান্তি (Divine peace) স্বর্গীয় শান্তি; ইহা গবর্ণমেণ্টের গোলাগুলির ভয়-প্রসূত শান্তি নহে। তাঁহার বিশ্বাস, ক্রমশঃই দেশের লোকের হৃদয়ে বলসঞ্চার হইতেছে, এবং সেই বল বা তেজের প্রভাবেই তাহারা শান্তি রক্ষা করিতে পারিতেছে। গবর্ণমেণ্টের নানারূপ নির্য্যাতন ও অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া যদি দেশের লোক এইরূপ শান্তি শেষ অবধি রক্ষা করিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, অদূর ভবিষ্যতে পাঞ্জাব এবং খিলাফতের অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর নিকট অনুতাপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু দেশের স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেরই একটী বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। তাহাদের যত কিছু উৎকৃষ্ট বিলাতী কাপড় ও পোষাক আছে, সমস্তই বিষবৎ বোধে বর্জ্জন করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি খদ্দরের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে মালাবারের মোপ্‌লা বিদ্রোহের বিষয় উল্লেখ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের একতার প্রয়োজনীয়তা পুনরায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব এবং মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব ব্যারিষ্টার ও অন্যতম খিলাফৎ-নেতা, ইয়াকুব হোসেন সাহেব বক্তৃতা করিলেন। রাত্রি এগারটার পর সভা ভঙ্গ হইলে আমরা ডাক্তার রাজনের বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিবস ২০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে নিকটস্থ শ্রীরঙ্গম সহর হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া মহাত্মাজীকে সেখানে লইয়া গেলেন। ত্রিচিনপল্লীর নিকটেই কাবেরী নদী। এই নদীর দুই ভাগের মধ্যস্থলে একটী সুন্দর দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দ্বীপের উপর শ্রীরঙ্গম সহর। শ্রীরঙ্গমের সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির ভারতবিশ্রুত। ত্রিচিনপল্লী (বা ত্রি-শির-পল্লী) দশস্কন্ধ রাবণের এক ভ্রাতা তিনস্কন্ধ রাবণের রাজধানী ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। সেইজন্য ইহার নাম ত্রি-শির-পল্লী বা চলিত কথায় ত্রিচিনপল্লী হইয়াছে। তিনস্কন্ধ রাবণের নাম আমাদের রামায়ণে কি কারণে উল্লিখিত হয় নাই, অথবা উহা অপর কোন নামের ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া গিয়াছে, ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা গবেষণা করিয়া দেখিতে পারেন। রাবণের উপর শ্রীরামচন্দ্রের আধিপত্য বিস্তারের চিহ্নস্বরূপ ত্রিচিনপল্লীর পার্শ্বে শ্রীরঙ্গম সহর ও বিষ্ণুমূর্ত্তি রঙ্গনাথের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। তাহা হইতে শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি সহজেই লোকের মনে জাগরিত হইতে পারে। কিন্তু ত্রিচিনপল্লীতে তিনস্কন্ধ রাবণের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। তবে শ্রীরঙ্গম যাইবার পথে

মোটার হইতে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। এই অঞ্চলের সমস্তই সমতলভূমি। এই দিগন্তবিস্তৃত সমভূমির মধ্যে ত্রিচিনপল্লীর এক অংশে দুইটী অদ্ভুত গিরিশৃঙ্গ শূন্যে বহুদূর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সমভূমিতে সহসা প্রস্তর স্তূপের আবির্ভাব অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়; অথচ শৃঙ্গ দুইটীর নীল প্রস্তরদেহ দূর হইতেই আমাদিগকে পরিচয় দিতেছিল যে, তাহারা নিখুঁত পর্ব্বতবংশ হইতে উদ্ভূত। যাহা হউক, কেহ যদি মনে করেন যে, ত্রি-শির-পল্লীর শিরের সহিত এই দুই পর্ব্বতশৃঙ্গের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাদের অনুমানকে সম্ভাবিত করিবার জন্য ত্রি-শির-পল্লীকে কোনরূপে দ্বি-শির-পল্লীতে পরিবর্ত্তিত করিবার পন্থা দেখিতে হয়। কিন্তু তাহাতে এক অসুবিধা এই যে, তিনস্কন্ধ রাবণের স্মৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়।

ত্রিচিনপল্লীর শেষ সীমায় আসিয়া কাবেরী অতিক্রম করিবার জন্য প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত এক সেতু পাইলাম। তাহার পরেই শ্রীরঙ্গম সহর। সহরটীকে নারিকেল বৃক্ষের বন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই ঘন বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শ্রীরঙ্গমের মিউনিসিপ্যাল আফিসের সম্মুখে মহাত্মাজীকে অবতরণ করিতে হইল। এখানকার মিউনিসিপ্যাল অভিনন্দন-পত্র একটী রৌপ্যপাত্রে তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। মহাত্মাজী তাহা পাইয়া বলিলেন যে, এই পাত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারে জমা হইবে, কারণ এরূপ সুন্দর ও বহুমূল্য উপহার রাখিবার উপযুক্ত কোন বাক্স পেঁটারা তাঁহার নাই। তিনি আরও

বলিলেন যে, শ্রীরঙ্গম মিউনিসিপ্যালিটির এবং ভারতের অপর সকল মিউনিসিপ্যালিটির তিনটি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। প্রথম, মিউনিসিপ্যাল সীমানার মধ্যে যাহাতে বিলাতী কাপড় না আসে, এবং সকলে খদ্দর ব্যবহার করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—মদ ও গাঁজার চলন বন্ধ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ—অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করিতে হইবে। এইরূপে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা শেষ হইলে পর সহরের গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা মহাত্মাজীকে লইয়া নিকটস্থ একটী কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই কুঞ্জে দিবসেও সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। কুঞ্জের মধ্যে একটী চালা ঘর; তাহাতে মহাত্মাজীকে উপবেশন করাইয়া শ্রীরঙ্গমের এক অন্ধ পণ্ডিত সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় মহাত্মাজীর স্তুতিগান করিতে লাগিলেন। কুঞ্জের দক্ষিণ পার্শ্বে খোলা ময়দানে শ্রীরঙ্গমের জনমণ্ডলী মহাত্মাজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। মহাত্মাজী পণ্ডিত-মণ্ডলীর মালা, চন্দন ও অর্ঘ্য সহাস্যবদনে গ্রহণ করিয়া কুঞ্জের বাহিরে প্রকাশ্য সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখানে সাধারণের পক্ষ হইতে তালপাতার পুঁথির আকারে ছাপাইয়া একটী ইংরাজী অভিনন্দন-পত্র মহাত্মাজীকে প্রদত্ত হইল। তালপাতার উপর ছাপার অক্ষরের প্রশংসা করিয়া মহাত্মাজী বলিলেন যে, উহা যদি তামিল ভাষা অথবা ভারতের সার্ব্বজনীন হিন্দুস্থানী ভাষাতে ছাপা হইত, তাহা হইলে উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আমাদিগের নিজেদের

মধ্যে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার শোভা পায় না। পরদেশের সহিত ভাবের আদান প্রদানের জন্য ইংরাজীর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি নিজে ইংরাজী ভাষার অনুরাগী, এবং ইংরাজী হইতে আমাদিগের অনেক শিখিবার আছে, ইহা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু স্থানভেদে শোভন বস্তুও যেমন অশোভন হয়, সেইরূপ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংরাজীর ব্যবহার বিসদৃশ হইয়াছে। তিনি নিজে অনেক স্থলে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার করেন বলিয়া কেহ ভ্রমে পতিত না হ'ন। বস্তুতঃ যখন নিজেদের কথাবার্ত্তার জন্য তাঁহাকে ইংরাজীর সাহায্য লইতে হয়, তখন তিনি দেশের দুর্গতি স্মরণ করিয়া প্রাণে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। সেই কারণ মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দী প্রচলনের জন্য তিনি মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভের বৃথা প্রয়াস না করিয়া, তিনি সকলকে হিন্দী শিক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ইহার পর খদ্দর গ্রহণ এবং অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য সমাপ্ত করিলেন। মাদ্রাজের সর্ব্বত্রই তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন বিষয়ে বারংবার উপদেশ দিতে লাগিলেন ; কারণ, অস্পৃশ্যতা দোষ মাদ্রাজ অঞ্চলে যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা, আর দক্ষিণ-ভারতের অস্পৃশ্যতা-সমস্যা, এই দুই সমস্যা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান অন্তরায়।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে মহাত্মাজী যাহা যাহা বলিতেছেন, তাহা বিশেষভাবে দক্ষিণ-ভারতের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, ইহাই আমার বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে আমরা বেলা ১০টার সময় ত্রিচিনপল্লীতে প্রত্যাগত হইলাম।

মেরী সারী আত্মা বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীকে বিরুদ্ধ উদ্বিগ্ন হো উঠী হৈ কৈঁউকি মেরা বিশ্বাস হৈ কি জব তক অংগ্রেজ অপনী শ্রেষ্ঠতাকা ভাব ন ত্যাগ দেংগে তব তক বৃটিশ সাম্রাজ্যসে সম্বন্ধ রখতে হুয়ে ভারত কদাপি স্বতন্ত্রতাকা অনুভব নহীং কর সকতা।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

ফকিরের বেশে

২১শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ত্রিচিনপল্লী ত্যাগ করিয়া আরও দক্ষিণে মাদুরা যাত্রা করিলাম। পথে দিণ্ডিগল নামক স্থানে কয়েক ঘণ্টা থাকিতে হইবে। বেলা এগারটার সময় আমাদের ট্রেণ দিণ্ডিগল পৌঁছিল। সহরের সমস্ত লোক ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা করিল। মহাত্মাজী বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌঁছিয়া প্রথমেই একটি চরকা লইয়া সূতা কাটিতে লাগিলেন। তৎপরে আমাকে ডাকিয়া ট্রেণে বসিয়া লিখিত তাঁহার একটি প্রবন্ধ নকল করিতে দিলেন। তাহার পর দ্বিপ্রহরের আহার গ্রহণ করিয়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল অভিনন্দন-পত্র গ্রহণ করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরিয়া আসিলে জনসভায় যাইবার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে স্থানীয় তিনটি বৃদ্ধা তাঁহাদের সূতা কাটিবার অদ্ভুত কৌশল ম[illegible]জীকে দেখাইতে লাগিলেন। আমাদিগকে সভাস্থল হ[illegible] মাদুরা যাত্রা করিতে হইবে। চারিটা নাগাদ ট্রেণ ধরি[illegible] পূর্ব্বে মাদুরা পৌঁছিতে হইবে।

দি[illegible]লের সভায় কুম্ভকোনমের সভার মতই গোলমাল হইল। [illegible]আত্মাজীর উপদেশ শুনিতে কেহই ব্যস্ত নহে; সকলে

কেবল তাঁহাকে দেখিতেই ব্যস্ত। সেই জন্য সভাস্থলের লোকেরা নিজেদের কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন রহিল, মহাত্মাজী সেই গোলমালের মধ্যেই নিজের বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। মহাত্মাজীর পর মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে, আমি সভাস্থলের বাহিরে আসিয়া একজন স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম।

সেখানে দেখি, একজন গোরা সৈন্যের অধীনে বহু তেলেঙ্গি-সেনা ষ্টেশনের প্লাটফরমে চলা-ফেরা করিতেছে। ওয়ালটেয়ারে মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের গ্রেপ্তারের সময় এইরূপ তেলেঙ্গি-সেনার সমাবেশ দেখিয়াছিলাম; সেইজন্য ভাবিতে লাগিলাম, মহাত্মাজীকেও কি এখানে গ্রেপ্তার করা হইবে? কিন্তু সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ সাহেবটির প্রফুল্ল বদন এবং আমাদের প্রতি তাহার ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।

কিছুক্ষণ পরে অসংখ্য লোক পরিবেষ্টিত হইয়া মহাত্মাজী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ট্রেণ আসিয়া পৌছিলে তিনি তাহাতে উঠিয়া ব্যস্ততার সহিত কাগজ পেন্সিল লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন এবং লেখা সমাপ্ত হইলে তাহা রাজ-গোপালাচারী মহাশয়কে পড়িতে দিলেন। তাঁহার গাড়ীর নিকট অত্যন্ত ভিড় দেখিয়া আমি একটু দূরে নিজের বসি[illegible] স্থান করিয়া লইলাম। পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে অসংখ্য লো[illegible] এবং তাহাদের অদম্য উৎসাহ দেখিতে দেখিতে চলি[illegible] মাদুরা ষ্টেশনে মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার জন্য এত [illegible]

হইয়াছিল যে, যতক্ষণ না তিনি চলিয়া গেলেন, ততক্ষণ আর অন্য কাহারও নামিবার সাধ্য হইল না। তিনি চলিয়া যাইলে প্ল্যাট্‌ফরমের ভিড় কমিতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সময় লাগিল। ষ্টেশন হইতেই মহাত্মাজী সভাস্থলে গেলেন; আমরা বাসায় চলিয়া গেলাম। সহরের পথে-ঘাটে দেখিলাম, মহাত্মাজীর শুভাগমনে সর্ব্বত্র লোকেরা আনন্দ করিতেছে, এবং আজ যেন একটা বিশেষ পর্ব্ব বা উৎসবের দিন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

আমি বাসায় পৌঁছিবার একটু পরেই মহাত্মাজী সভাস্থল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মাদুরাতেও কুম্ভকোনম্‌ ও দিণ্ডি-গলের ন্যায় সভার গোলমাল নিবারিত হইতেছিল না বলিয়া তিনি বক্তৃতা না দিয়াই সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বাসায় আসিয়া প্রথমেই তিনি আমাকে বলিলেন যে, দিণ্ডিগলে ট্রেণে বসিয়া যাহা তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহার তিনটি নকল করিয়া একটি নকল মাদ্রাজের 'হিন্দু' দৈনিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কস্তুরিরঙ্গ আয়াঙ্গার, দ্বিতীয়টি 'Bombay Chronicle' (বম্বে ক্রণিক্ল) এবং তৃতীয়টি 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' কাগজে শীঘ্রই পাঠান দরকার। সেখানে Associated Pressএর্‌ (এসোসিয়েটেড প্রেসের) কোন রিপোর্টার আছে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কাহাকেও পাওয়া গেল না। নকল শেষ করিতে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল এবং তাহা তখনই লোক দিয়া ষ্টেশনের ডাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল। আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং কারাচির মোকদ্দমার অন্যান্য আসামীগণের বিরুদ্ধে সরকারী তরফ হইতে যে মোকদ্দমা

চালান হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য মহাত্মাজী নিজের পন্থা সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ভারতের সকল প্রান্তের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে বম্বেতে সমবেত হইবার জন্য এখান হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তদ্ব্যতীত, 'Tampering with Loyalty' বা 'রাজভক্তিতে হস্তক্ষেপ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে তাঁহার ত্রিচিনপল্লীর বক্তৃতার ভাব লইয়া লিখিলেন যে, সরকারী সিপাহীগণের আনুগত্য নষ্ট করিতেছিলেন বলিয়া আলী-ভ্রাতৃদ্বয়কে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা হইতেছে; কিন্তু ইহা নূতন কোন অপরাধ নহে। কলিকাতার ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসের কংগ্রেসের সময়েই প্রকাশ্য ভাবে এই অপরাধ করা হইয়া গিয়াছে, খিলাফৎ-কমিটি তাহার পূর্ব্বেও ইহা করিয়াছে; এবং তিনি নিজে সর্ব্বপ্রথমে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আরও তিনি লিখিলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে যদি সিপাহী-দিগকে ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক সিপাহীর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাকে সরকারী সম্পর্ক ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন। এতদ্ব্যতীত, কারাচির মোকদ্দমায় গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ বিস্তারের যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তদুত্তরে তিনি লিখিলেন যে, ঐরূপ অসন্তোষ প্রচার কংগ্রেসের ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইবে। অতএব দেশের সর্ব্বত্র শত সহস্র সভা করিয়া প্রকাশ্যভাবে কারাচির

সুপ্রসিদ্ধ ফতোয়ার আবৃত্তি করিবার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধের এই অংশ সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করিলেন এবং দেশের সর্ব্বত্র ইহা লইয়া গোলমাল উপস্থিত হইবে, এই ভয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাত্মাজী তাঁহাদের প্রত্যেক যুক্তি খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, ফতোয়া লইয়া ধর-পাকড় করিতে যাইয়া—"The Government has really played into our hands," অর্থাৎ—'গভর্ণমেণ্ট আমাদের ফাঁদে পা দিয়াছে'। এবং বস্তুতঃ পরে যখন তাঁহার পরামর্শানুসারে দেশের সর্ব্বত্র ঐ ফতোয়ার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ফতোয়ার উপদেশ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু এদিকে খদ্দরের সর্ত্ত পূর্ণ করিবার জন্য তিনি দেশের নিকট যেরূপ আগ্রহ, উদ্যম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রত্যাশা করিতে-ছিলেন, সেপ্টেম্বর মাস যতই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, ততই তিনি তাহাতে বিফল হইলেন, এই ধারণা তাঁহার হইতে লাগিল। তাহার উপর তামিলনাডুর অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিলেন যে, এখনও আমাদের সভাসমিতিতে যেরূপ বিশৃঙ্খলার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা দূর করিয়া লোকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার শিক্ষা দিতে না পারিলে, আইন-ভঙ্গ করিয়া শান্তিময় বিদ্রোহের আন্দোলন আরম্ভ করা সম্ভবপর হইবে না। জনতাকে শিক্ষা দিয়া সংযত করিতে হইলে খদ্দর-মন্ত্রের দীক্ষা ব্যতীত অপর

কিছুই নাই, এইরূপ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। সেই জন্য খদ্দরের এত প্রয়োজনীয়তা, এবং ইহাতেই খদ্দরের সহিত সবিনয় আইন-ভঙ্গের বা civil disobedienceএর এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহা হউক, দেশের এই অকৃতকার্য্যতার আংশিক প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ, এবং পথ-প্রদর্শকরূপে নিজের প্রতিও এক দণ্ডের বিধান করিলেন।

দিণ্ডিগলের সভা হইতে আসিয়াই ট্রেণে মহাত্মাজী যাহা রচনা করিয়াছিলেন এবং যাহা নকল করিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইবার জন্য মাদুরাতে আসিয়া আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার একটি নিবেদন-পত্র। তাহাতে তিনি প্রচার করিলেন যে, এক মাসের জন্য তিনি শোকের বেশ গ্রহণ করিবেন এবং সেই জন্য জামা, কাপড় ও টুপি ত্যাগ করিলেন। ঐ একমাসকাল তিনি কেবল জানু পরিমাণ একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সময় সময় চাদর ব্যবহার করিবেন। যাহারা অর্থাভাবে খদ্দর গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার মত ফকিরের বেশ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং দেশের সর্ব্বত্র সকল দেশসেবীকে অপর সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া একমাসকাল কেবল খদ্দর প্রস্তুত ও খদ্দর-প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্বদেশীব্রত পূর্ণ করিতে উৎসাহ দিলেন। সেই রাত্রিতে দলে দলে মাদুরার নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন কিন্তু তিনি সকলের সহিতই কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত

থাকিলেও, আজ যেন তাঁহাকে গম্ভীর ও সমধিক চিন্তান্বিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একদল বিদুষী স্ত্রীলোক এই সময় আসিয়া সংস্কৃতভাষায় তাঁহার গুণগান করিয়া গেলেন। তাহার পর রাত্রি দশটার সময় একজন নাপিত আনাইয়া তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিতে বলিলেন। নাপিত আসিয়া প্রথমে তাঁহার পদ-বন্দনা করিল, তাহার পর অতি সন্তর্পণে মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল। তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই সে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল, সেই জন্য আমরা বারম্বার পারিশ্রমিক দিতে চাহিলেও কিছুতেই তাহা সে গ্রহণ করিল না। মহাত্মাজীর গাম্ভীর্য্য ও আচরণ দেখিয়া, এবং ঐ নিবেদন-পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার সহচর ও সহকর্ম্মী সকলের প্রাণে কেমন একটা ত্রাসের উদয় হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন, এই বেশ পরিবর্ত্তন যে কেবল এক মাসের জন্য হইতেছে তাহা নহে। কেহ কেহ বা এই ভয় করিতে লাগিলেন যে তিনি বোধ হয় সন্ন্যাসী হইতে চলিলেন। সেইজন্য সকলের প্রাণে উদ্বেগ ও মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। সকলেই প্রাণের আবেগে অনেক রাত্রি অবধি তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক কথা দ্বারা তাঁহার মনের গতি ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে মোটারে করিয়া মাদুরা হইতে ষাট মাইল দূরে কড়াইকুডি নামক স্থানে যাইবার কথা। মহাত্মাজী প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। টুপি এবং জামা একেবারে ত্যাগ করিলেন। জামার

পকেটে যে সকল জিনিস রাখিতেন, তাহার জন্য একটি ছোট খদ্দরের ঝোলা করিয়া লইলেন। কাপড় ত্যাগ করিয়া এক হাত বহরের সামান্য একখণ্ড খদ্দর পরিধান করিলেন। ডাক্তার রাজন্ ও রাজা গোপালাচারী-জী এই সময় আসিয়া নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য করিতে মহাত্মাজীকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী মিষ্ট কথায় প্রাণের জ্বালা ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইতেছেন না, বলিলেন। তিনি যে বেশ গ্রহণ করিতেছেন তাহা মাদ্রাজের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে, কারণ মাদ্রাজ-অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই নগ্ন শরীরে থাকে। সেই মাদ্রাজেও খদ্দর নাই। ভারতের অন্যান্য প্রান্ত অপেক্ষা এখানে খদ্দরের প্রভাব অত্যল্প এবং সাধারণের মধ্যে আদৌ শৃঙ্খলা বা discipline (নিয়ম-সংযম) নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়া মহাত্মাজী বলিলেন—"মাদ্রাজ আমাকে প্রাণান্তকর ক্লেশের ভিতর ফেলিয়াছে।" তাঁহার এই নূতন বেশ দেখিয়া গুজরাটবাসীরা কি প্রকার ক্লেশ পাইবে, তাহা এই সময় তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কারণ তাহারা নগ্নদেহে থাকিতে অভ্যস্ত নয়। বলিলেন—"আমি গুজরাট্‌কে আজ বিষম পরীক্ষায় ফেলিতেছি।" সেই জন্য নিজের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছে। রাজা গোপালাচারীকে হাসিয়া বলিলেন—"I may not be

able to convince you, but I am absolutely certain about the correctness of the step I have taken." 'আমি এ বিষয়ে আপনাকে নিঃসন্দেহ করিতে না পারিলেও, আমি যে ঠিক্‌ করিয়াছি তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বরাত্রিতে তিনটা হইতে তিনি এই বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, বলিলেন। সেই সুগভীর রাত্রিতে চতুর্দ্দিক্‌ কিরূপ নিস্তব্ধ ছিল এবং পাখী সকল কেমন সুমিষ্ট গান করিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিলেন। তাহার পর আরও কি বলিতে যাইয়া সহসা বিরত হইলেন। কাল রাত্রিতে কেবল আমিই তাঁহার কক্ষে শুইয়াছিলাম। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তখন বোধ হইয়াছিল যে তিনি নিদ্রিত। এদিকে পথশ্রমে শরীর অবসন্ন থাকায় এবং শরীরের নানাস্থানে বেদনা বোধ হওয়ায়, আমি পুনরায় শুইয়া পড়িয়াছিলাম।

বেশ-পরিবর্ত্তন-কার্য্য শেষ করিয়া মহাত্মাজী কড়াইকুড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। চারিখানা মোটার সজ্জিত হইয়া বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মাদুরার লোকেরা প্রাতে আবার তাঁহার দর্শনের জন্য রাজপথে আসিয়া সমবেত হইল। তিনি যখন এই নূতন বেশে মোটারে বসিলেন, তখন দুঃখে সকলে অবনত মস্তক হইয়া রহিল। মোটার চলিতে আরম্ভ করিলে প্রাতঃকালীন সূর্য্যের রক্তিম আভা তাঁহাকে এক উজ্জ্বল তেজঃপিণ্ডাকারে প্রকাশ করিল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

টিনিভেলি

পূর্ব্ব রাত্রিতে মহাত্মাজী বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে আমাদের মধ্যে কেহ একজন তাঁহার সঙ্গে কড়াইকুডি গেলেই চলিবে। সেজন্য কেবল প্রভুদাস তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। এদিকে আমার শরীরের বেদনা বাড়িতে বাড়িতে জ্বর হইয়া পড়িল। মাদুরার যে বাড়ীতে আমরা উঠিয়াছি, তাহার সন্নিকটে মাদুরার প্রসিদ্ধ মন্দির "গোপুরম্" দেখা যাইতে লাগিল। কত পর্য্যটক এই মন্দির দেখিতে দেশ-বিদেশ হইতে এখানে আসিয়া থাকেন। যমুনাদাসজী মন্দিরের সুন্দর কারুকার্য্য দেখিয়া আসিয়া শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং হিন্দু-স্থাপত্যের সেই অদ্ভুত নিদর্শন একবার দেখিয়া আসিবার জন্য আমাকেও পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমার কিন্তু যাইতে ইচ্ছা হইল না। ইতিপূর্ব্বে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরও এইরূপ দূর হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। দেবতার নিকট উপস্থিত হইতে হইলে হৃদয়ে যেরূপ সরল ভাব থাকা দরকার, তখন তাহা ছিল না। আর এখানে মহাত্মাজীর ফকিরের বেশ গ্রহণের পর হইতে সেই ধ্যান, সেই চিন্তাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া আছে। তদুপরি ভাবিলাম, জাতীয়

জীবনের পুরাতন ঘটনা ও ইতিহাস বুঝিবার ও শিখিবার, অথবা পুরাতন শিল্পনৈপুণ্যের পরীক্ষা এবং তাহার রসানুভূতির সময় ইহা নহে।

মহাত্মাজী চলিয়া যাইবার পর সমস্ত দিন আমি কেবল নিজের কর্ত্তব্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি এখন কি করি? তিনি আজ যে বেশ গ্রহণ করিলেন, ইহা কেবল তাঁহারই পক্ষে শোভনীয়। কারণ ইহার ভিতর বাহ্য লোকদেখান ব্যাপার কিছুই নাই। দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য অনুভব করিয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছে, সেই আগুনের জ্বালা নিবারণের জন্য তিনি যাহা কিছু করিবেন, তাহা তাঁহার প্রাণের সরল অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। অপরে সেই জ্বালা জীবন্তভাবে অনুভব না করিয়া যদি সেইরূপ কিছু অনুষ্ঠান করে, তাহা জীবনহীন অন্ধ অনুকরণে পর্য্যবসিত হইবে। আমি আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম —দেশের দুঃস্থ ও নিপীড়িত লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার প্রাণে এরূপ কোন উদ্বেগ ও অশান্তির সৃষ্টি হয় নাই, যে তাহার ফলে আমি মহাত্মাজীর ন্যায় ব্রত গ্রহণ করিতে পারি। অথচ আমি তাঁহার সেবক ও নিত্য-সহচর। কোন্ প্রাণে আমি তাঁহার শারীরিক ক্লেশ দেখিয়া নিজে সেই ক্লেশের অংশ গ্রহণ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? এই দুই বিরুদ্ধ চিন্তার তাড়নায় আমি বড়ই যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। পরে ভাবিলাম, মহাত্মাজীর যে প্রকার পবিত্রতা, সরলতা এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগ, তাহার তুলনা জগতে কোথায় পাইব? সেই দিক দিয়া তাঁহার

ছায়া স্পর্শ করিতে যাওয়াও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু তাঁহার সঙ্গলাভের ফলে দিন দিন তাঁহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আকর্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা চরিতার্থের জন্য আমি যদি কিছু করি, তবে তাহা কৃত্রিম বা অসত্য হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি জামার ব্যবহার অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ত্যাগ করিব সঙ্কল্প করিলাম; কিন্তু তাঁহার ন্যায় 'রামধুতি' বা Loin cloth গ্রহণ করিলাম না।

এদিকে ২৪ ঘণ্টা জ্বরভোগ করিয়া পরদিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) প্রাতে উঠিয়া দেখি, আমার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। সেই দিনই বেলা ১২টার সময় আমাদের মাদুরা হইতে টিনিভেলি যাইবার কথা আছে। কিন্তু যে সময় মহাত্মাজী কড়াইকুড়ি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন বলিয়া স্থির ছিল, তাহা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল। যমুনাদাস বলিলেন, তিনি হয়ত একেবারে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইবেন। আমরা সেইজন্য মাল-পত্র লইয়া ষ্টেশনে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় মহাত্মাজী দলবল সহ আসিয়া পড়িলেন। তখন ট্রেণের অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র সময় আছে। ঐ সময়ের মধ্যেই সকলকে ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা গিয়াছিলেন, সকলেরই আকৃতি এত মলিন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহা দেখিয়া আমাদের ভয় হইতে লাগিল। প্রভুদাস আমাকে বলিল যে, আমি সঙ্গে না গিয়া ভাল করিয়াছি, যাইলে মারা পড়িতাম। পথে তাহাদিগকে রৌদ্র, ধূলা ও স্থানে স্থানে লোকের ভিড়ে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে যে, তাহা

বলিবার নহে। যাহা হউক, অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই আবার সকলে প্রস্তুত হইয়া টিনিভেলির ট্রেণ ধরিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সন্ধ্যার সময় টিনিভেলির নেতৃবর্গ টিনিভেলির পূর্ব্বের এক ষ্টেশনে মহাত্মাজীকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া মোটারে করিয়া লইয়া গেলেন। ষ্টেশনে ভিড় হইতে নিষ্কৃতির জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা সন্ধ্যার অল্প পরে ট্রেণে করিয়া টিনিভেলি পৌছিয়া বাসায় যাইয়া দেখি, মহাত্মাজী পূর্ব্বেই সেখানে পৌছিয়া গিয়াছেন, এবং স্থানীয় লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত আছেন। আমাকে কিছুক্ষণ পরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণদাস, কাল তাপ্ আয়াথা?" গুজরাটী "তাপ্" অর্থ জ্বর, তাহা আমি তখনও জানিতাম না; তথাপি আন্দাজে মনে করিলাম, তিনি আমার জ্বরের সংবাদ পাইয়া তাহার কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাহার পর জ্বরের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, দিণ্ডিগলে ভয়ানক রৌদ্র ভোগ করিতে হইয়াছিল; তাহার উপর মাদুরা আসিয়া দুধ-রুটীর অভাবে মাদ্রাজী খানা খাইতে হইয়াছিল, তাহাতে অপর্য্যাপ্ত লঙ্কার ঝাল ছিল, ইহাই বোধ হয় জ্বরের কারণ। তাহা শুনিয়া বলিলেন —"মাদ্রাজী খানা আর খাইও না। কিন্তু রৌদ্র সহ্য করিবার মত শরীরকে মজ্‌বুত্ করিতে হইবে।" তাহার পর বলিলেন—"যদি দুই একদিন কোথায়ও বিশ্রাম করা দরকার মনে কর, তাহা অনায়াসে করিতে পার; দুইদিন পরে আমি যেখানে থাকি,

সেইখানে যাইয়া আমার সহিত পুনরায় মিলিত হইলেই চলিবে।" আমার তাহা দরকার নাই বলিলাম, কারণ শরীরের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে। অনবরত ট্রেণে চলাফেরা করিয়া কষ্ট হইতেছে কিনা মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, এখন আর পূর্ব্বের মত কষ্ট হয় না এবং লোকের ভিড় ক্রমশঃই সহ্য হইয়া আসিতেছে। এই কথা শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

ইহার পর জনসভায় যাইবার জন্য উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। মহাত্মাজীর আগমনে সহরে এত লোকবৃদ্ধি হইয়াছে যে তাহা বলিবার নহে। শুনিলাম, তিন চারিদিন পূর্ব্ব হইতে তীর্থের যাত্রীর মত গ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিয়া সহর পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু জনতার তেমন গোলমাল নাই। সভাস্থলে শৃঙ্খলা এবং শান্তি দেখিয়া মহাত্মাজী অতিশয় প্রীত হইলেন। বহু গ্রাম্য লোক উপস্থিত হইলেও তাহাদিগকে নিয়ম প্রতিপালন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া চলিবার কৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে কত সহজে আমাদের জনসাধারণকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া গেল। মহাত্মাজী তাঁহার বক্তৃতায় এই শান্তি ও শৃঙ্খলার বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—সমগ্র ভারতে যখন এই আদর্শের শিক্ষা লোকের মজ্জাগত হইয়া যাইবে, তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে যে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইয়াছে, বা তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের জন্য যে অর্থ

প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে তিনি যত না তৃপ্ত হইয়াছেন, জনতার শৃঙ্খলা এবং শান্তভাব দর্শনে তিনি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। যেখানে অধিক হৈ চৈ, চীৎকার ও উত্তেজনা দেখা যায়, সেখানেই মহাত্মাজীর মতে শান্তিময় অসহযোগের প্রকৃত ভাবের সেইরূপ বিকাশ হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে; সেখানেই অহিংসভাবের অভাব আছে। অসহযোগের মূলে যে এই শান্তির আদর্শ আছে, তাহা দেশে কি পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিতেছে তাহা চরকা এবং তাঁতের বিস্তৃতির দ্বারাই তিনি পরীক্ষা করিবেন; এই সমস্ত কথা বলিয়া তিনি বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময় সভা ভঙ্গ হইলে আমরা বাসায় আসিলাম।

মহাত্মাজীকে মাদুরায় ফকিরের বেশ গ্রহণ করিতে দেখিয়া মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেবও টিনিভেলি আসিয়া নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলেন, এবং সরিয়তের আদেশ মত মুসলমানের পক্ষে যতটুকু অঙ্গাবরণ না লইলে নহে, কেবল ততটুকু অঙ্গাবরণ গ্রহণ করিলেন। জামা ফেলিয়া এক ফতুয়া গায়ে দিলেন এবং মাথার টুপি কেবল নমাজের সময় ব্যবহার করিলেন। পা-জামার পরিবর্ত্তে জানু অবধি এক লুঙ্গি পরিধান করিলেন। তিনি এই পোষাকে মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, মাদুরাতে মহাত্মাজীর বেশ-পরিবর্ত্তনের পর হইতে তিনি অনেক চিন্তা করিয়া এইরূপ করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই নূতন পোষাকে মৌলানা

সাহেবকে ফকিরের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। পরদিন ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাতে যখন দলে দলে লোক মহাত্মাজীকে দেখিতে আসিতেছিল, তখন মৌলানা সাহেব এই নূতন বেশে বাটীর দ্বারে আসিয়া বসিলেন, এবং তীর্থের পাণ্ডার মত সকল লোককে ধরিয়া তাহাদের বিলাতী জামা-কাপড় ত্যাগ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উর্দ্দু ভাষা এখানকার লোকে কি বুঝিবে? আকার-ইঙ্গিতে যতটা পারেন তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার অনুরোধে অধিকাংশ লোকই বিলাতী চাদর ও জামা ত্যাগ করিল, তাহাতে সেখানে এক বস্ত্রের স্তূপ হইল। আর যাহাদের পক্ষে কাপড়ের মায়া ত্যাগ কঠিন বোধ হইল, তাহারা এই ব্যাপার দেখিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল।

এদিকে একজন অন্ত্যজ-জাতির নেতা পূর্ব্ব কথামত মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইনি অন্ত্যজ-জাতির উন্নতিকল্পে এবং হিন্দু-সমাজে তাহাদের উপযুক্ত অধিকার লাভের জন্য কি প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন তাহা বর্ণনা করিলেন। এই কথাবার্ত্তা হইতে দেখা গেল—বহু হিন্দু-সম্প্রদায়ের মন্দিরে অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকার নাই এবং উহা লইয়া সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও বিবাদ-বিসম্বাদ চলিয়াছে। যিনি মহাত্মাজীর সহিত কথা কহিতে আসিয়াছেন, ইনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রজা, সেখানকার আইনমত তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন না; অথচ ইহাদের সমান পদবীয় অন্য সম্প্রদায়ের সেই অধিকার আছে। এই জন্য ইহারা স্থির করিয়াছেন

যে, আগামী উৎসবের সময় দশ সহস্র লোক এক সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করিবেন। তাহাতে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হইলে যে রাজকীয় শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহা ভোগ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। মহাত্মাজী ইহা শুনিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের মন্দির প্রবেশের দাবী খুবই সঙ্গত; অথচ দশ সহস্র লোক এক সঙ্গে বলপূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না। তাহাতে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই জেলে যাইতে হইবে। দাঙ্গা করিয়া যদি রাজকীয়-শক্তির নিকট তাঁহারা পরাজিত হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইন যেমন আছে তেমনই থাকিবে। কিন্তু যদি সত্যসত্যই তাঁহাদের জেলের ভয় দূর হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক সঙ্গে দুইজন বা চারিজন করিয়া আইন ভঙ্গ করিয়া ক্রমশঃ জেল ভর্ত্তি করিতে থাকিলে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য নিশ্চয়ই ঐ আইন পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। অতএব যদ্যপি মন্দির-প্রবেশের আইন পরিবর্ত্তন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি যে পন্থা বলিয়া দিলেন, তদ্দ্বারা উহা যত সহজ হইবে, মারামারি করিয়া তত সহজ হইবে না।

সেই ব্যক্তি তখন বলিলেন যে, কেবল মন্দির-প্রবেশের আইন রদ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা আহার করেন না এবং তাঁহাদের সহিত বিবাহাদি বিষয়ে আদান-প্রদান করেন না। এইরূপ পার্থক্য তাঁহারা আর সহ্য করিবেন না। এই কথায় মহাত্মাজী একটু বিরক্ত হইলেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন,

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের অর্থ ইহা নহে যে আহার ও বিবাহাদি বিষয়ে সব একাকার হইয়া যাইবে। একে অপরকে স্পর্শ করিতে যে ঘৃণাবোধ করে, তিনি কেবল তাহা দূর করিতে চাহেন এবং অস্পৃশ্য জাতিরা যাহাতে সমাজে মানুষের উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করে, তিনি তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই আন্দোলন-সূত্রে কেহ যদি অপরের আহার কিম্বা বিবাহ-সম্বন্ধীয় নিয়ম নষ্ট করিতে উদ্যত হ'ন, তবে তিনি তাহাতে সাহায্য বা সহানুভূতি করিতে পারেন না। তাঁহার এই কথায় সেই ব্যক্তি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—এইরূপ হইলে ত সমাজে অস্পৃশ্যতা রহিয়াই গেল। মহাত্মাজী বলিলেন, আহার শারীরিক-ক্রিয়া মাত্র, ইহা এমন কিছু সাধু বা পবিত্র কার্য্য নহে যে দশজনকে উহা দেখাইয়া করিতে হইবে। তিনি মনে করেন, পুত্রের হাতেও পিতা খাইতে বাধ্য নহেন। মল-মূত্রাদি-ত্যাগ যেমন লোকে গোপনে সম্পাদন করিয়া থাকে, আহারও সেইরূপ গোপনে করা ভাল। সেইরূপ বিবাহ ব্যাপারটি ভোগের ব্যাপার নহে। বিবাহ দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা লইয়া যথেচ্ছাচার করিলে ভবিষ্যৎ বংশের অমঙ্গল হইবে। সেই জন্য বহু অভিজ্ঞতার ফলে বিবাহ-সম্বন্ধে সমাজে যে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কখনই না বুঝিয়া পরিবর্ত্তন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। মহাত্মাজীর এই মত শুনিয়া সেই ব্যক্তি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের সূত্রে আহার ও বিবাহাদির সমস্ত বাঁধাবাঁধি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে

প্রস্তুত, কিন্তু এখন অন্যরূপ মত শুনিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সকাল হইতেই আমাদের যাইবার ধূমধাম পড়িয়া গেল। নয়টার সময় ট্রেণ। শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি সমাপন করিয়া কিছু জলযোগ করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ব রাত্রিতে কিছুমাত্র নিদ্রা হয় নাই, ভাবিলাম ট্রেণে উঠিয়া নিশ্চিন্ত-মনে নিদ্রা যাইব। সেই জন্য মহাত্মাজীর গাড়ী হইতে দূরে অন্য এক কামরায় সুবিধামত একটু স্থান করিয়া লইলাম। কিছুক্ষণ পরে প্রভুদাস আমার খোঁজ করিতে আসিয়া ব্যগ্র-ভাবে বলিল,—"বাপুজী অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমাকে খুঁজিতে-ছেন; যাও, শীঘ্র যাও।" ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখি, মহাত্মাজী Waiting roomএ [ওয়েটিং রুমে] বসিয়া আছেন। অতিকষ্টে জনতা ভেদ করিয়া আমি সেখানে উপস্থিত হইলে তিনি আমার হাতে কতকগুলি কাগজ দিয়া বলিলেন,—"এইগুলি শীঘ্র নকল করা দরকার, কখন শেষ করিতে পারিবে?" আমি উত্তর করিলাম,—"চলন্ত ট্রেণে নকল করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না; তবে ষ্টেশনে যখন গাড়ী থামিবে, সেই অবসরে কিছু কিছু লিখিয়া যত শীঘ্র পারি শেষ করিয়া ফেলিব।" তিনি মাথা নাড়িয়া তাহাই করিতে বলিলেন। তাহার পর নিদ্রার চিন্তা দূর করিয়া কাগজ কলম হাতে লইয়া এক এক ষ্টেশনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম, এবং ট্রেণ ৪।৫ মিনিটের জন্য থামিলেই কয়েক লাইন করিয়া

নকল করিয়া যাইতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় ২টার সময় নকল করা শেষ হইল। কাগজগুলি পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন বলিয়া বোধ হইল।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

এরোড, কয়ম্বেটোর ও সেলম্

(১)

এখন আমরা ভারতের দক্ষিণ সীমা টিনেভেলি হইয়া আবার উত্তর দিকে চলিয়াছি। বেলা তিনটার সময় মাত্বরা ষ্টেশনে আসিয়া মেল ট্রেণ ধরিলাম, এবং আটটার সময় ত্রিচিনপল্লী আসিয়া সেখান হইতে অপর এক ট্রেণে রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় এরোড সহরে পৌছিলাম। এরোড হইতে কয়ম্বেটোর এবং কয়ম্বেটোরের পর সেলম্ যাইয়া মহাত্মাজী তাঁহার তামিলনাড়ু পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিবেন।

রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় এরোড ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি, সহস্র সহস্র লোক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া মহাত্মাজীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে এবং আমাদের ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইলেই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। রাত্রিতে মহাত্মাজীর বিশ্রামের প্রয়োজন। তিনি যে গাড়ীতে ছিলেন তাহা প্ল্যাটফরম্ হইতে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা হইল, এবং তাহাতেই তিনি রাত্রির অবশিষ্টাংশ যাপন করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। ষ্টেশনে উপস্থিত জনতাকে তাহা বলা হইল এবং সকলেই ইহার

প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া কোনরূপ গোলমাল না করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

প্রভুদাস ও যমুনাদাসজী মহাত্মাজীর নিকট রহিলেন। আমি অপরাপর সঙ্গীদের সহিত এরোডের নেতা শ্রীযুক্ত রামস্বামী নাইকার মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং প্রত্যুষে স্নানাদি সমাপন করিয়া মহাত্মাজীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বোধ হয়, ষ্টেশনে বসিয়াই তিনি কিছু লেখাপড়ার কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার বাসায় আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

এরোডে মহাত্মাজীর নামে অনেক চিঠিপত্র আসিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রায় এক মাস পূর্ব্বের একখানা পত্র ভারতের নানা প্রদেশ ও নানা সহর পরিভ্রমণ করিয়া এখানে মহাত্মাজীর হস্তগত হইল। অপর এক পত্র কংগ্রেসের একজন বিশেষ খ্যাতনামা নেতা লিখিয়াছেন। তাহাতে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ভারতের সকল প্রান্তের প্রধান ব্যক্তিগণকে বম্বে সহরে সমবেত হইবার জন্য মহাত্মাজী যে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বিরুদ্ধ-মত প্রকাশ করিয়া লেখক মহাত্মাজীর প্রতি তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। এই পত্র লইয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ রহস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাত্মাজীর নিকট যখন উহা পঠিত হইল, তখন তিনি নিবিষ্ট-চিত্তে তাহা শুনিতে লাগিলেন। সেই সময় দেখিলাম, পত্রে কঠোর ভাষা ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁহার মুখে কোনরূপ বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইল না,

অথবা ঐ তীব্র সমালোচনা শুনিয়া তিনি নিজের পরিজনবর্গের নিকটও তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিলেন না। বরং তাঁহাকে দেখিয়া তখন মনে হইতে লাগিল যে লেখক যে প্রকার ক্লেশ অনুভব করিয়া ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই ক্লেশ যেন মহাত্মাজীর প্রাণ স্পর্শ করিয়া সহানুভূতির উদ্রেক করিল। এই বিষয় লইয়া কোনরূপ চিন্তায় ক্ষণমাত্র ব্যয় না করিয়া তিনি তখনই প্রথম পত্রের উত্তর লিখিতে বসিয়া গেলেন। দ্বিতীয় পত্রখানির সেই রুদ্র রসের প্রতিক্রিয়া তাঁহার প্রাণে মুহূর্ত্ত মাত্র স্থান পাইল না; কারণ সেইরূপ হইলে তন্মুহূর্ত্তেই মধুর রসে আপ্লুত হইয়া ডাক্তার রায় মহাশয়কে তিনি কখনই পত্র লিখিতে পারিতেন না। বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া ডাক্তার রায় মহাশয়কে লিখিলেন যে ঐ সময়ে তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা তখনও তাঁহার মনে আছে, এবং আবার ডাক্তার রায়ের সহিত দেখা হইলে কয়েক ঘণ্টা নির্জ্জনে মন খুলিয়া আলাপ করিবার জন্য তিনি উৎসুক। পুনরায় এই বিশ বৎসরে তাঁহার নিজের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস এবং পূর্ব্বের মত একই অবস্থায় ডাক্তার রায় মহাশয়কে তিনি দেখিতে পাইবেন আশা করেন। পত্রের শিরোনামায় লিখিলেন—ডাক্তার পি, সি, রায়। আমি ইহা দেখিয়া মহাত্মাজীকে বলিলাম—ডাক্তার রায় এখন 'স্যর' হইয়াছেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"আমার নিকট তিনি এখনও ডাক্তার রায়ই রহিয়াছেন।"

তাহার পর এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীরে প্রকাণ্ড এক বট বৃক্ষের নিম্নে এরোডের সভা হইল। সভার প্রারম্ভে ঐ এরোডের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ সুন্দর কারুকার্য্যখচিত নানারূপ রৌপ্যপাত্র মহাত্মাজীকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত পাত্র সভাস্থলে নিলাম করিয়া বিনিময়-লব্ধ অর্থ স্থানীয় তিলক-স্বরাজভাণ্ডারে প্রদত্ত হইল। সভাতে মহাত্মাজী তাঁহার বর্ত্তমান প্রচারের বিষয়—খদ্দর, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্পাদন এবং অহিংসনীতির ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন, এবং বেলা ২টার সময় কয়ম্বেটোর যাত্রা করিলেন।

(২)

সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্ব্বে কয়ম্বেটোরের দুই ষ্টেশন অগ্রবর্ত্তী এক স্থান হইতে মহাত্মাজীকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া মোটারে করিয়া কয়ম্বেটোর লইয়া যাওয়া হইল। মহাত্মাজীর সঙ্গে মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব এবং আমি চলিলাম।

কয়ম্বেটোরের নিকটেই নীলগিরির পর্ব্বতমালা। তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া গিরিশিখরের অন্তরালে অদৃশ্য হইতেছিলেন এবং পর্ব্বতের ছায়া সমগ্র উপত্যকা-ভূমি আবৃত করিয়া ফেলিতে লাগিল। এখানে আসিয়াই আমরা বেশ শীতবোধ করিতে লাগিলাম। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইতে যে আট দশ মাইল পথ মোটারে অতিক্রম করিতে হয়, তাহার স্থানে স্থানে বহু গ্রামবাসী সমবেত হইয়া মাল্য-

চন্দনাদির দ্বারা মহাত্মাজীর সম্বর্দ্ধনা করিল। কয়েম্বেটোরে খুব কাপাসের চাষ হয়; কিন্তু কৃষিজীবীদিগের অধিকাংশ সুরাপায়ী বলিয়া এতদিন তাহাদের দুর্গতির অবধি ছিল না। মহাত্মাজীর এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কি এক ঐশী শক্তি আসিয়া তাহাদের মতিগতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, তাহার ফলে তাহারা একযোগে সুরাপান বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহাতে কৃষকের ঘরে আবার লক্ষ্মী-শ্রী ফুটিয়া উঠিতেছে। কৃষক-পত্নীরা দুই হাত তুলিয়া মহাত্মাজীর জয়গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদিও এখন চরকার বহুল প্রচলন হয় নাই, তথাপি তদুপযোগী অবস্থা প্রতিষ্ঠাপিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

এইরূপ স্থানীয় লোকদিগের সুখ-দুঃখ এবং আশা-ভরসার কথা শুনিতে শুনিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইলে আমরা কয়েম্বেটোর পৌছিলাম। বাসায় যাইবার পথে এক সুবিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে একটা উচ্চ মঞ্চের চারিদিকে সহস্র সহস্র লোক বসিয়া মহাত্মাজীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। শুনিলাম, এখানে তাঁহাকে মিউনিসিপ্যাল অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইবে। সভার লোক এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে বসিয়াছিল যে মঞ্চে যাইবার পথ ছিল না এবং মহাত্মাজীকে কি করিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া হইবে ইহাই এক বিষম সমস্যা হইল। কিছুক্ষণ পরে ভিড়ের মধ্য দিয়া মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে মোটার চালান হইতে লাগিল, তাহাতে মোটারের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের মধ্যে অসাধারণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং মহাত্মাজীকে নিকটে পাইয়া সকলে প্রাণপণে

অস্বাভাবিকরূপে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। এই গোলমালের মধ্যে কোন প্রকারে মহাত্মাজীকে মঞ্চে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া, সভার কর্ম্মকর্ত্তাদিগের মধ্যে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে উপস্থিত হইয়া মহাত্মাজীকে তাহার স্কন্ধে চড়িয়া বসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; উদ্দেশ্য—তাঁহাকে ঐভাবে তিনি মঞ্চে লইয়া যাইবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ ঐরূপ বলিতে না বলিতে, তিনি নিজেই ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। মহাত্মাজী মোটারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গোলমাল থামাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। তখন—"Now this is horrible ; I must get into the crowd" (একি ভয়ানক, এই ভিড়ের মধ্যে আমার যাওয়াই দরকার)—এই কথা বলিয়া হাতের ঝোলা * এবং গায়ের চাদর আমার হাতে দিয়া সেই ভিড়ের মধ্যে তিনি লাফাইয়া পড়িলেন। শুনিয়াছি, সমুদ্রে তুফান উঠিলে যদি তেল ঢালা হয়, তুফানের সময়ও সমুদ্রের জল শান্ত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও অনেকটা সেইরূপ হইল। মহাত্মাজীকে মোটার হইতে নামিতে দেখিয়াই সকল লোক সরিয়া সরিয়া তাঁহার যাইবার পথ করিয়া দিল। তিনি সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ত্বরিত-গতিতে মঞ্চে গিয়া উঠিয়া বসিলেন।

মিউনিসিপ্যালিটী যে অভিনন্দন-পত্র তাঁহাকে প্রদান করিল,

* মহাত্মাজী মাদুরাতে জামা ত্যাগ করা অবধি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র রাখিবার জন্য একটী ঝোলা সঙ্গে রাখিতেন।

তাহাতে তাঁহার ত্যাগ এবং দেশ-সেবা প্রভৃতি বিষয়ক বিস্তর প্রশংসা থাকিলেও, বর্ত্তমান আন্দোলনের যে প্রধান বিষয় স্কুল, কলেজ, আইন, আদালত, কাউন্সিল ইত্যাদি বর্জ্জনের উপকরণ ব্যবস্থা, তাহার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছিল। অভিনন্দন-পত্র পাঠ সমাপ্ত হইবার পরই তিনি তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মিউনিসিপ্যাল সদস্যদিগকে তাঁহাদের স্পষ্টবাদি-তার প্রশংসা করিতে গিয়া বলিলেন যে, স্পষ্টবাদিতা দেখিলে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন, কারণ আমাদিগের মধ্যে সত্যভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতার বৃদ্ধি না হইলে আমরা স্বরাজের অধিকারী হইতে পারিব না। এইরূপে প্রথমে অভিনন্দন-পত্রের প্রশংসা করিয়া তাহার পর তিনি তেজস্বিতার সহিত বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত কার্য্য-প্রণালীর যেরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে তাহার কোন মূল্য নাই, এবং তাহা দ্বারা একটা ভ্রান্ত মতের পোষকতা করা হইয়াছে। তিনি নিশ্চয়রূপে বুঝিয়া-ছেন যে সরকারি স্কুল, কলেজ, আইন, আদালত ও কাউন্সিলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে কখনই দেশে স্বরাজ আসিতে পারে না, সেইজন্য তিনি এই সমুদয় বর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন। এই সামান্য ত্যাগ-স্বীকার করিবার ক্ষমতা যদি দেশের না হয়, তাহা হইলে স্বরাজ-লাভের আশা বৃথা। এইরূপে অল্প কথায় মিউনিসিপ্যালিটির উত্তর শেষ করিয়াই তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং পুনরায় সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মোটারে উঠিয়া বসিলেন। তখন আবার তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া

চারিদিকে ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ হইয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সেই জনসমুদ্র পার হইয়া আবাসস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দ্বিতীয় এক সভাতে শত শত লোক সুসজ্জিত এক বেদীর সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে দেখিলাম। ইহা কয়েম্বেটোরের শ্রমজীবীদিগের সভা। মহাত্মাজীকে দেখিয়াও এই সভার লোকেরা কোনরূপ গোলমাল বা হর্ষধ্বনি না করিয়া নিজ নিজ স্থানে বসিয়া রহিল। পূর্ব্বের সভার অভিজ্ঞতার পর ইহা তখন আশ্চর্য্য বোধ হইল, কিন্তু একটু শিক্ষা ও বন্দোবস্ত দ্বারা সভার শৃঙ্খলা কেমন সুন্দররূপে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহাও লক্ষ্য করিলাম। মহাত্মাজী ও মৌলানা সাহেব উভয়েই সভার বেদীতে গিয়া বসিলেন, এবং অল্প সময়ে এই সভার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া দুইজনেই জনসাধারণের সভায় চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাদের সহিত আর কোথাও না গিয়া বাসায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

পরদিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) সোমবার, মহাত্মাজীর বিশ্রামের ও মৌনের দিন বলিয়া তাঁহার নিকট লোকের ভিড় ছিল না। ত্রিচিনপল্লী অবস্থানের সময় মহাত্মাজী আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যেখানে যখন থাকি প্রতিদিন যেন কিছুক্ষণ চরকা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করি; তাহাতে কোন্ দেশের চরকা কিরূপ, এবং কোন্ চরকা ভাল ও কোন্ চরকা মন্দ, তাহার অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। তদবধি আমি প্রত্যহ কিছু সময় চরকা অভ্যাস করিতেছিলাম। এবং দেখিলাম, তিনি নিজেও

প্রতিদিন অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা চরকা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় আরও বলিয়াছিলেন—"সোমবারে ত আমাদের চরকা চালাইবার বিশেষ সুবিধা।" ক্রমে ক্রমে মহাত্মাজী প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের আহারের পূর্ব্বে নিয়ম করিয়া আধ ঘণ্টা চরকা চালাইতে লাগিলেন; যে দিন ঐ নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতেন না, সেই দিন আর আহার করিতেন না। কেবল যখন ট্রেণে চলিতেন তখন এই নিয়ম প্রতিপালিত হইত না। এই বিষয়ে এক দিন তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"শরীর রক্ষার জন্য আমরা প্রত্যহ জগৎ হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার প্রতিদান-স্বরূপ প্রত্যহ কিছু সময় শরীরের দ্বারা জগতের সেবা করা দরকার। জগতের কল্যাণ উদ্দেশ্যে সকলেই কিছু সময় চরকার ব্যবহার দ্বারা ঐ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন। এইরূপ শারীরিক কার্য্য দ্বারা কিছু প্রতিদান না করিয়া শরীরের জন্য আহার গ্রহণ করিলে, তাহা চুরি করা হয়, এবং ইহাতে জগতের সাম্য নষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খলা উৎপত্তি হইয়া থাকে।"

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ৩।১২

[দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন। দেবতাদের প্রসাদ-লব্ধ এই ভোগ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করে সে চোর]।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের এই শ্লোকে যে দেবযজ্ঞের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, মহাত্মাজী মনে করেন যে তাহার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, আমরা যে সমস্ত ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করি, তাহার বিনিময়ে জগতের কল্যাণ উদ্দেশ্যে কিছু সেবা প্রদান আমাদিগের কর্ত্তব্য। তিনি মনে করেন, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র চরকার ব্যবহার ও চরকার প্রতিষ্ঠার দ্বারা জনসাধারণের যে কল্যাণ হইবে, এরূপ আর কিছুতেই হইবে না। সেই জন্য তিনি প্রাত্যহিক ধর্ম্ম-সাধনার অঙ্গরূপে অর্দ্ধঘণ্টাকাল চরকা চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিচিনপল্লী হইতে চলিয়া আসিবার পর আজ প্রথম সোমবার আমি মহাত্মাজীর নিকটে বসিয়া একটী চরকাতে বহুক্ষণ সূতা কাটিলাম। এদিকে তিনি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া "Hinduism" (হিন্দুত্ব) নাম দিয়া "ইয়াং ইণ্ডিয়া"র জন্য এক প্রবন্ধ লিখিলেন, এবং লেখা শেষ করিয়া আমাকে তাহা পড়িতে দিলেন। অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে—ইহা প্রতিপাদন করাই তাঁহার প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা বলিতে গিয়া হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণভাবে তিনি অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন ; এবং নিজেকে একজন সনাতনী হিন্দু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ লইয়া পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সংস্কারকমণ্ডলী এবং হিন্দু-সনাতনপন্থী উভয় দলের মধ্যেই একটী ক্ষুদ্ররূপ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের নিতান্ত পক্ষপাতী হইলেও অবাধ বিবাহ এবং অবাধ আহার-বিহার অনুমোদন করেন না

বলিয়া সংস্কারকেরা আপত্তি করিতে লাগিলেন। আর হিন্দুধর্ম্মের মূল গ্রন্থ বেদকে তিনি বাইবেল, কোরাণ, জেন্দ-এভেস্তা প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের সমান পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া বর্ণনা করাতে তিনি হিন্দু সনাতনপন্থী প্রচারকদিগের কোন কোন শ্রেণীর অসন্তোষভাজন হইলেন। তাঁহার মতে বেদ যে প্রকারে অপৌরুষেয়,—বাইবেল কোরাণ ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থও সেইরূপ অপৌরুষেয়। মহাত্মাজীর শিক্ষার মূল-তত্ত্ব অহিংসা; ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য—ইহা লইয়া কোন সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধর্ম্মগুরু বা ধর্ম্মের উপদেষ্টা (আচার্য্য) হইবার অধিকার কাহার নাই, এই বিষয়ে কোন ধর্ম্মজ্ঞানী হিন্দু তাঁহার মতে আপত্তি করিবে না। ত্যাগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ও সত্য, আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন জীবন গঠন করিতে পারিলে ধর্ম্মের সকল তথ্যই স্বাভাবিক নিয়মে লাভ হইবে। পক্ষান্তরে ঐরূপ অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবল নানারূপ মতবাদের আলোচনা করিলে বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে পারে বটে, কিন্তু ধর্ম্মলাভ সুকঠিন হইবে, ইহাও সকল ধার্ম্মিক লোকেই স্বীকার করিবেন। এই নিমিত্ত তাঁহার এই "Hinduism" (হিন্দুত্ব) প্রবন্ধ সম্পর্কে নানাপ্রকার সমালোচনা ও বহু পত্রাদি মহাত্মাজীর নিকটে উপস্থিত হইলেও তিনি ঐ বিষয়ের বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন না।

(৩)

২৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৮টার সময় কয়ম্বেটোর ত্যাগ করিয়া রাত্রি দেড়টার সময় আমরা সেলম্ (Salem) পৌঁছিলাম।

সেলম্ ষ্টেশন হইতে বাসায় যাইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। প্রাতে উঠিয়া দেখি, মহাত্মাজী এখানকার সভা-সমিতির কাজে চলিয়া গিয়াছেন। আমার জন্য একটু কাজ তিনি যমুনাদাসের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। ভক্তিভাজন স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় "অসহযোগ আন্দোলনে অহিংসা" এই নাম দিয়া বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত বঙ্গভাষায় লিখিয়া ও ছাপাইয়া বরিশালের সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। সেই নিবেদন-পত্রের একখণ্ড মহাত্মাজীর নিকট তিনি পাঠাইয়াছেন। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলেই যমুনাদাস তাহা আমার হাতে দিয়া মহাত্মাজীর জন্য তাহার একটী ইংরাজী অনুবাদ করিয়া রাখিতে বলিলেন। আমি সকালেই তাহা করিয়া রাখিলাম। তিনি সভা হইতে আসিলেই সেই অনুবাদ পাঠ করিলেন এবং তাহা হইতে স্বর্গীয় অশ্বিনীবাবুর মন্তব্যের ভাব গ্রহণ করিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। সেই নিবেদন-পত্রের শেষভাগে মহাভারতের বনপর্ব্ব হইতে একটী সুন্দর এবং বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী শ্লোক উদ্ধৃত করা ছিল—

"মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্ত্যদারুণং।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিত্তস্মাত্তীব্রতরং মৃদু ॥"

মহাভারত বনপর্ব্ব ২৮।৩২ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ—১৯০৮)

ইংরাজী অনুবাদ হইতে সেই শ্লোকের ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি আমাকে মূল শ্লোকটী পড়িতে বলিলেন এবং স্বহস্তে নাগরী অক্ষরে তাহা লিখিয়া লইলেন। শ্লোকটী তিনি এই প্রথম

শুনিলেন এবং উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেলমে সমস্ত দিন তাঁহাকে কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইল। কংগ্রেসের বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট বিজয়রাঘবচারী মহাশয় সেলমের প্রধান অধিবাসী। একবার মহাত্মাজী তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিলেন।

সেলমে মহাত্মাজীকে এক মিউনিসিপ্যাল অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইল। তাহা রাখিবার সুন্দর চন্দনকাষ্ঠের পাত্রটী রাজাগোপালচারীজী হাতে করিয়া আনিলেন। আমাদিগকে উহার কারুকার্য্য দেখাইয়া তিনি বলিলেন যে উহা মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড উলিংডনের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল; কিন্তু লাট্ সাহেবকে না দিয়া উহা মহাত্মাজীকে অর্পণ করাই মিউনিসিপ্যালিটী সমীচীন মনে করিল।

সন্ধ্যার পরে আমরা সেলম্ ত্যাগ করিলাম। তাহার পূর্ব্বে বৈকালে সেলমের অন্যতম নেতা ডাক্তার বরদারাজুলু তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা সঙ্গে করিয়া মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কন্যাটীর হাতে কিছু সোণার অলঙ্কার দেখিয়া মহাত্মাজী রহস্য করিয়া বলিলেন যে, তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের কার্য্য পূর্ণ না হইতে সে অলঙ্কার পরিয়াছে কেন? কন্যার পিতা তামিল ভাষায় বুঝাইয়া বলিলে বালিকা তখনই অলঙ্কার খুলিয়া মহাত্মাজীর হাতে তুলিয়া দিল। মহাত্মাজী পরে অনেক করিয়া বলিলেন, তথাপি সেই ৭।৮ বৎসরের বালিকা কিছুতেই আর অলঙ্কার ফিরাইয়া লইল না।

নিকটবর্ত্তী বহু স্থান হইতে বহু দেশ-সেবক মহাত্মাজীর সহিত সেলমে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের একজনকে তিনি বলিলেন যে, এখন আর সভা বা বক্তৃতা করার প্রয়োজন নাই। ঐরূপ দেশ-সেবা আর তিনি ইচ্ছা করেন না। এখন তিনি এরূপ লোক চাহেন, যাহারা মুখে একটী কথা না বলিয়া কেবল কাজ করিয়া যাইতে পারিবে, এবং হৃদয়ে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষের বিষ পোষণ না করিয়া আবশ্যক হইলে হাসিতে হাসিতে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত। অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, বাকি তিন মাস তিনি গুজরাত ত্যাগ করিয়া অন্য কোন প্রান্তে প্রচারে যাইতে ইচ্ছা করেন না। এই তিন মাস গুজরাতকেই কেন্দ্র করিয়া তিনি কাজ করিবেন এবং দরকার হইলে গুজরাত হইতেই স্বরাজ-স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত শেষ বোঝাপড়া করিতে যাহা প্রয়োজন তাহা করিবেন।

উনত্রিংশ অধ্যায়

অন্ধ্র পরিভ্রমণ

তামিল নাডু ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া অন্ধ্র প্রদেশের সীডেড্ ডিষ্ট্রিক্টের (Ceded Districts) সহর পরিদর্শনের জন্য ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে সেলম্ (Salem) হইতে যাত্রা করা হইল। পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে পাঁচ দিন অন্ধ্র প্রদেশে অতিবাহিত করা হইবে। কিন্তু পরে মহাত্মাজী যত শীঘ্র সম্ভব বম্বে যাইবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে পাঁচ দিনের পরিবর্ত্তে তিন দিনে পরিভ্রমণ শেষ করিতে হইল। সেই জন্য ২৮শে হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এই তিন দিন দিবারাত্রি আমাদিগকে ট্রেণে ও ষ্টেশনে ষ্টেশনে যাপন করিতে হইয়াছিল। এই তিন দিনের মধ্যে প্রথম দিনের বিবরণ আমার দিন-লিপি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"রেনিগুণ্টা জাংসান, ২৮।৯।২১—কাল রাত্রিতে সেলম্ ত্যাগ করিয়া এখন ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিয়াছি। মহাত্মাজী প্রাতে তিরুপতি নামক স্থানে নামিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যমুনাদাস ও মৌলানা সাহেব গিয়াছেন। তিরুপতিতে এক প্রসিদ্ধ মন্দির আছে, দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র ঐ মন্দিরের অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতি-পত্তি। শুনিলাম, এই মন্দিরের ন্যায় সমৃদ্ধ মন্দির ভারতে অতি অল্পই আছে। তিরুপতি হইতে মহাত্মাজী মোটারে রেনিগুণ্টা

আসিবেন। এখান হইতে বেলা সাড়ে এগারটার সময় স্পেশ্যাল্ ট্রেণে রাজম্‌পেট্ যাওয়া হইবে। মোটারে মালপত্র লইয়া আসিবার অসুবিধা বলিয়া প্রভুদাস ও আমি সকালে ৯টার সময় ট্রেণে করিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছি। গত তিন রাত্রি ট্রেণে চলিতেছি, থার্ড ক্লাশে লোকের ভিড়ে বসিবার স্থান পাওয়া কঠিন। এই জন্য তিন রাত্রিই ঘুমের সুবিধা পাই নাই। কাল রাত্রি তিনটা অবধি একেবারে সোজা বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, আজ আর শরীর নাড়িতে পারিব না; কিন্তু সকালে ৪টা হইতে ৬টা অবধি একটু নিদ্রা গিয়া এখন আর কোন অবসাদ নাই।

কুডাপ্পা,—"রেনিগুণ্টা হইতে ১২টার সময় স্পেশ্যাল্ ট্রেণ ছাড়িয়াছিল এবং পথে ৪০ মিনিট রাজম্‌পেট্ সহরে অপেক্ষা করিয়া বৈকাল ৫টার সময় আমাদিগকে কুডাপ্পা সহরে পৌঁছাইয়া দিল। রাজম্‌পেটে যেরূপ লোকের জনতা হইয়াছিল তাহা কখনও ভুলিব না; মনে হইতে লাগিল যেন ট্রেণখানা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। ট্রেণে বসিয়াই আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। মহাত্মাজী সেই ভিড়ের মধ্যে নামিয়া গেলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৌলানা সাহেব লোক ঠেলিতে ঠেলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ষ্টেশনের পার্শ্বেই সভা। মহাত্মাজী যখন সেই সভা হইতে ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলাম—জনতার গরমে তাঁহার আকৃতি নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার বিরক্তি নাই। ট্রেণে উঠিয়াই তিনি কিছু কলা ও কমলা লেবু

লইয়া ছোট ছোট ছেলেদিগকে নিজ হাতে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত হইতে প্রসাদ-স্বরূপ ঐ সমস্ত ফল গ্রহণ করিতে শত শত লোক এক সঙ্গে হাত বাড়াইয়া দিল, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও তিনি কিছু দিলেন না। কেবল যাহারা নিতান্ত বালক, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদিগকে তিনি ফল দিতে লাগিলেন ; তাহার পরে তিনি এমন প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন যে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি ঐরূপ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছেন। সেই সঙ্গে তাঁহার আকৃতির মলিনতা দূর হইয়া গেল, এবং তিনি তখনই 'দপ্তর' খুলিয়া কাগজপত্র লইয়া কাজে বসিয়া গেলেন।

"গত রাত্রি এবং আজ সমস্ত দিন আমাদিগকে ট্রেণে যাপন করিতে হইল। স্নান হয় নাই বলিয়া মাথা বড় গরম বোধ হইতেছে। কুডাপ্পায় নামিয়া আমরা রাত্রি ৩টা অবধি ওয়েটিং রুমে (Waiting room) বাস করিলাম। ষ্টেশন হইতে সহর তিন মাইল দূরে। মহাত্মাজী কেবল মৌলানা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সহরের সভায় গিয়াছিলেন, এবং কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ফিরিয়া আসিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে এক খাটিয়ার উপর শয়ন করিলেন। আমাকে নিকটে দেখিয়া বলিলেন, "এখন যাইয়া শোও।" বলিলেন বটে, কিন্তু ঘুমের নাম নাই, একটা আরাম-কেদারায় পড়িয়া রহিলাম। কুডাপ্পাতে স্বরাজ-ভাণ্ডারে জমার জন্য এক বাক্স টাকা পাওয়া গিয়াছে। মহাত্মাজী টাকাগুলির দিকে নজর রাখিতে বলিলেন। এই দেশ অত্যন্ত গরীবের দেশ, এবং খুব চোরের উপদ্রব আছে

বলিয়া ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা সন্ধ্যার সময় আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। সেই জন্য টাকার দায়িত্ব লইয়া ঘুম আরও বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর রাত্রি সাড়ে বারটার সময় একটা ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। পাছে তিনি এই ট্রেণেই আমাদিগকে যাইতে হইবে মনে করিয়া উঠিয়া পড়েন, সেই জন্য তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ট্রেণ আসিতেই তিনি চক্ষু মেলিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, একটা ট্রেণ আসিয়াছে; ইহা আমাদের ট্রেণ নহে। ইহা শুনিয়াই আবার চক্ষু বুজিলেন, এবং আমাকে যাইয়া শুইতে বলিলেন। আমি আবার সেই আরাম-কেদারায় পড়িয়া রহিলাম, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। তাহার পর রাত্রি তিনটার সময় আমাদের ট্রেণ আসিলে সকলে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ট্রেণে ভয়ানক ভিড়; অতি কষ্টে একটু বসিবার স্থান পাইলাম।

রাত্রি তিনটার পর ট্রেণ ধরিয়া (২৯শে সেপ্টেম্বর) প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা তাড্‌পত্রি পৌঁছিলাম এবং বেলা একটা অবধি সেখানে থাকিয়া সেই দিনই ২টার সময় কর্‌নুল যাত্রা করিলাম। এত দিন মাদ্রাজ-প্রদেশে কোনস্থানে সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকের দল দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাড্‌পত্রি আসিয়া তাহা দেখিতে পাইলাম। এখানকার স্বেচ্ছাসেবকেরা সিপাহীর মত পোষাক পরিয়া প্রত্যেকে সাড়ে তিন হাত লম্বা লাঠি হাতে উপস্থিত হইয়াছিল। চলিবার সময় তাহারা যখন লাঠি কাঁধে

ফেলিয়া চলিত, তখন বন্দুক ঘাড়ে করিয়া সিপাহীর দল যাইতেছে বলিয়া ভ্রম হইত। মহাত্মাজীর কোথায়ও যাইবার সময় স্বেচ্ছাসেবকেরা সিপাহীদের মত লাঠি ঘাড়ে করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের লাঠির খোঁচায় দুই একবার তাঁহার চক্ষু নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা যখন তাড়্পত্রি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি, তখন মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব ষ্টেশনে আসিয়া প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে তাহাদের লাঠি ত্যাগ করাইলেন।

স্বেচ্ছাসেবকগণ থাকাতে এখানে আসিয়া আমাদের শ্রম খুব লঘু হইয়া পড়িল। রাত্রির অনিদ্রার পর প্রাতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাড়্পত্রি নামিয়াই মনে করিলাম, বাসায় যাইয়া শরীরের জড়তার নিমিত্ত কোন কাজ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু ট্রেণ হইতে নামিয়াই প্রাতের সেই শীতল বায়ু সেবনে শরীরের অবসাদ ও জড়তা দূর হইতে লাগিল। ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় তিন মাইল দূর; এক গো-যানে এই পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলাম। তাড়্পত্রি সহরের চতুর্দ্দিকে দূরে পর্ব্বতমালার বেষ্টনী দেখা যাইতে লাগিল। সেই পর্ব্বতের উপর মেঘ ঘনীভূত হইয়া মেঘে ও পর্ব্বতে এক হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, ক্রমে যখন পূর্ব্বদিকে উষার রক্তিম-ছটা সেই মেঘের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতে থাকিল, তখন সমগ্র উপত্যকা-ভূমিটি গাঢ় লালবর্ণে রঞ্জিত হইল, এবং সেই মনোরম শোভা দেখিতে দেখিতে আমাদের শরীর ও মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল।

মহাত্মাজী ও মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব তাড্পত্রির সভা সমাপ্ত করিবার পর, বেলা ১টার সময় আমরা আবার ষ্টেশনে আসিয়া করনুল্ যাইবার ট্রেণ ধরিলাম। পথে ষ্টেশনে ষ্টেশনে সভা হইতে লাগিল। সভাতে শ্রোতাদের মাথায় বিদেশী টুপি দেখিলে মৌলানা সাহেব তাহাদিগকে তাহা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্বেচ্ছায় টুপি ফেলিয়া দিল, কেহ বা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; তথাপি স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহা আদায় করিয়া আনিল। ইহাতে টুপি-রক্ষার জন্য অনেক লোকের মধ্যে একটা ব্যস্ততা আসিয়া পড়িল। এক এক সভায় দেখিলাম, টুপির প্রসঙ্গ হইলেই বহুলোক প্রস্থান করিতে লাগিল। এক স্থানে কোন কারণে ষ্টেশনের বাহিরে ট্রেণের গতিরোধ হইলে দশ বার জন লোক চুপে চুপে আসিয়া মহাত্মাজীকে দেখিবার আশায় ট্রেণের নিকটবর্ত্তী হইল। মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব তখন "এ-ভাই শোন" বলিয়া যেই হাত বাহির করিলেন, তখনই সকলে নিজ নিজ টুপি লইয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। "আরে! ইঁহা ভি খবর পৌছ্ গিয়া" এই কথা বলিয়া মৌলানা সাহেব হাসিয়া উঠিলেন।

এইরূপে সমস্ত দিনের পর রাত্রিও ট্রেণে যাপন করিয়া পরদিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) প্রাতে করনুল্ পৌছিলাম। এদেশে আজকাল দুর্ভিক্ষ চলিয়াছে; ট্রেণ হইতে জমির দিকে চাহিয়া ঐ জমিতে যে কখনও ফসল হয়, তাহা মনে হইল না। স্থানে স্থানে দেখিলাম, স্তুপাকারে প্রস্তরখণ্ডসকল পড়িয়া রহিয়াছে।

স্থানীয় লোকেরা বলিলেন যে গরীব লোকদিগের দ্বারা ঐ পাথর ভাঙ্গাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে পাঁচ বা ছয় পয়সা এবং পুরুষদিগকে দশ পয়সা দৈনিক মজুরি দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই দৈনিক তিন আনা মজুরি দিয়া চরকাতে সূতা কাটার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সকলেই পাথর ভাঙ্গার কাজ ছাড়িয়া দিয়া উৎসাহের সহিত চরকা অবলম্বন করিয়াছে। এখন তাহারা ঘরে বসিয়াই কাজ করিতে পারে। এই বিবরণ শুনিয়া মহাত্মাজী খুব সুখী হইলেন, এবং দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে চরকার দ্বারা কি অদ্ভুত কাজ হইতে পারে তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম।

করনুলে আমরা এক সমৃদ্ধ হিন্দু-বণিকের অতিথি হইলাম। সেখানে ব্রাহ্মণেরা মহাত্মাজীর মঙ্গলোদ্দেশে হোম করিয়া বেদধ্বনি করিতে করিতে জল ও ধান্য-দূর্ব্বাদি দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিলেন। অপর এক হিন্দু-বণিক্ এই শুভদিনে আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান-স্বরূপ স্তরে স্তরে টাকা সাজাইয়া মহাত্মাজীকে উহা ভেট্ প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত অর্থ তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারে জমা হইল। করনুলে বহু পুরাতন এক মুসলমান শিক্ষাগার আজ অবধি বর্ত্তমান আছে। এখানকার শিক্ষা-প্রাপ্ত মৌলবী দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্র মুসলমান-সমাজে বিশেষ সমাদর পাইয়া থাকেন। এই মাদ্রাসার বর্ত্তমান পরিচালক মহাশয় তাঁহার নিঃস্বার্থতা ও চরিত্রের গাম্ভীর্য্যের গুণে স্থানীয় লোকদিগের নিকট পীরের ন্যায় সম্মান লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ

তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি ও উদার প্রকৃতি সকলেরই হৃদয়ে স্বাভাবিক ভাবে শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। মহাত্মাজী কিছুক্ষণের জন্য সেই মাদ্রাসায় গিয়া ছাত্রদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিলেন। তাহার পর এক বিস্তীর্ণ নদীর গর্ভে জনসভা বসিল। নদীর গর্ভে সভা শুনিয়া বাঙ্গালী পাঠক হয়ত হাসিবেন। কিন্তু সে দেশের নদীতে বিন্দুমাত্র জল নাই, এবং যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর বক্ষে কেবল বালুরাশি ধূ ধূ করিতেছে। করনুলের লোকেরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য মহাত্মাজীকে পাইয়া যখন যেখানে তিনি যাইতে লাগিলেন, সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দৌড়াইতে থাকিল। তাহাতে সহস্র সহস্র লোকের দপ্ দপ্ পদধ্বনি দূর হইতেও শুনা যাইতে লাগিল এবং সেই জনসমষ্টির পদস্থলে একখানা উন্মুক্ত গাড়িতে তাঁহাকে বসিয়া যাইতে দেখিয়া বাইবেলের "Shepherd and the Flock" (মেষপালক ও মেষপাল) এই উপমা স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল।

করনুল্ হইতে মোটারে করিয়া বেলারি গমনের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু একখানির অধিক মোটার সংগ্রহ হইল না দেখিয়া শেষে ট্রেণে যাওয়া স্থির হইল। অন্ধ্র প্রদেশের পশ্চিম সীমায় বেলারি জেলা। উহার উপর কাহার অধিকার ইহা লইয়া অন্ধ্র এবং পার্শ্ববর্ত্তী কর্ণাট কংগ্রেস-কমিটির বিবাদ চলিয়াছে, এবং তাহার মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের সালিশ নিযুক্ত হইয়াছে। এই জেলায় তেলেগু এবং কর্ণাটক এই দুই ভাষারই প্রচলন আছে। জন-সংখ্যায় বোধ হয় তেলেগুভাষীই অধিক হইবে; কিন্তু কর্ণাটকদিগের প্রভাব অধিক

বলিয়া সমস্যাটি জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সীমানা লইয়া অন্ধ্রের সহিত উৎকলেরও বিবাদ আছে। গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত বহরমপুর সহর উড়িষ্যা কংগ্রেস-কমিটি নিজ প্রান্তের অন্তর্গত করিবার দাবী করিতেছে। মহাত্মাজী তাহা শুনিয়া অন্ধ্র-নায়ক কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পায়া মহাশয়কে বলিলেন—"আহা! উড়িষ্যা ভারতের মধ্যে দুঃস্থ প্রদেশ; এমন গরীব দেশ আর নাই। উড়িষ্যার জন্য আমি সব সহ্য করিতে পারি। উড়িষ্যা যাহা প্রার্থনা করিতেছে বিবাদ না করিয়া তাহাই মঞ্জুর করিতে হইবে।" বেঙ্কটাপ্পায়া মহাশয়ও তাহাতে প্রস্তুত আছেন বলিলেন, এবং অন্ধ্র পক্ষের সালিশ শ্রীযুক্ত প্রকাশম্ মহাশয়কে তিনি তাহা বলিয়া দিবেন এইরূপ স্থির হইল।

গুণ্টাকল জাংসানে আসিয়া খবর পাইলাম, মহাত্মাজীর আগমন-প্রতীক্ষায় সন্ধ্যা পাঁচটা হইতে বেলারির সভাস্থলে অসংখ্য লোক জমায়েৎ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের কিন্তু বেলারি পৌঁছিতে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। ট্রেণ আসিয়া বেলারিতে উপস্থিত হইলেই দেখি, ষ্টেশনে ভয়ানক জনতা, তাহার উপর অন্ধকার রাত্রি। সেই অন্ধকারে ট্রেণ হইতে নামিয়া যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। মহাত্মাজী নামিয়াই সেই অগণিত লোক সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে চলিয়া গেলেন। এইরূপে জনতার হ্রাস হইলে আমাদের অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে আমরা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

ত্রিংশ অধ্যায়

গ্রেপ্তারের গুজব

সভাস্থল হইতে মহাত্মাজী অন্য কোথায়ও না যাইয়া সোজা ষ্টেশনেই ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাত্রি দেড়টা। তিনি আসিয়া সেই উন্মুক্ত প্ল্যাট্‌ফরমের উপরই তাঁহার বিছানা করিতে বলিলেন। তিনি শয়ন করিলে আমি রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে লাগিলাম। সেই প্ল্যাট্‌ফরমে আরও অনেক রেলের যাত্রী শুইয়া ছিল। তাহাদিগের মধ্যে সামান্য একজন পথিকের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া মহাত্মাজীকে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া তাঁহার অতুল সম্পদ্, প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। সমগ্র ভারত আজ যাঁহার করতলগত, যিনি সর্ব্বত্র সম্রাটের ন্যায় সম্মান লাভ করিতেছেন এবং যাঁহার জয়গুণ-গান করিতে করিতে দেশের আপামর-সাধারণ, বালক-বৃদ্ধ-বনিতা পাগল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অমানিতার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া প্রাণে কত কি ভাবের উদয় হইতে লাগিল। ভাবিলাম, যদি সেই ঐশ্বর্য্য, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার প্রাণে বিন্দুমাত্র অহঙ্কারের আঁচড় লাগিত, তাহা হইলে কি তিনি কখনও এ ভাবে নিদ্রা যাইতে পারিতেন! কোন্ শক্তিতে তিনি এই অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের মাদকতা জয় করিয়াছেন! অর্থ,

মান, যশ, প্রভুত্ব এবং ক্ষমতার গরল হজম করিয়া নীলকণ্ঠ হইতে হইলে জীবকে শিব হইতে হয়। এরূপ মান-সম্ভ্রম এবং প্রতিপত্তির মোহকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া জগতের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে এক হইতে হইলে হৃদয়ের কতদূর পবিত্রতা ও শুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা আমার নিজের মলিন অন্তর পরীক্ষা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, এবং তাঁহার উদারতা, সরলতা ও মহত্ত্ব আরও ভালরূপ উপলব্ধি করিয়া মনে মনে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে লাগিলাম।

শেষ রাত্রিতে উঠিয়া বেলারি ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইল। ভোর ৫ টার সময় ট্রেণ আসিলে আমরা সকলে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। তখন সহর হইতে স্থানীয় নেতারা সংবাদ লইয়া আসিলেন যে ত্রিচিনপল্লীর বক্তৃতার জন্য মহাত্মাজীর নামে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে এবং তিনি গুণ্টাকলে ফিরিয়া যাইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই অল্প-বিস্তর বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু মহাত্মাজী খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন। এই গুজব কতদূর সত্য তাহা বুঝিবার জন্য সংবাদদাতাদিগের মধ্যে একজনকে আমি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন যে তাঁহারা পাকা খবর পাইয়াছেন, এবং এই গ্রেপ্তারের জন্যই বেলারির ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব আমাদের সহিত সেই ট্রেণে গুণ্টাকল চলিয়াছেন।

ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে মহামতি বেঙ্কটাপ্পায়া মহাত্মাজীকে

প্রশ্ন করিলেন, বাস্তবিকই যদি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহা হইলে বম্বেতে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ভারতের সকল প্রান্তীয় নেতাদের যে সভা আহ্বান করা হইয়াছে, তাহার কি হইবে? তদুত্তরে মহাত্মাজী বেঙ্কটাপ্পায়া মহাশয়কে গ্রেপ্তারের সমস্ত ঘটনা বম্বে যাইয়া বর্ণনা করিতে বলিলেন। তাহার পর বলিলেন—"দেশের এখন একমাত্র কাজ খদ্দর প্রস্তুত ও খদ্দর সরবরাহ করা। আর কিছু দরকার নাই, এবং অন্য কিছু করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। এক খদ্দর দ্বারা আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব এখন কি করিবেন মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মাজী হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন—"আপনার কাজ, দেশের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া এখনও যে সকল লোক বিদেশী টুপি পরিতেছে, তাহাদের টুপি কাড়িয়া লওয়া।" তিনি বেঙ্কটাপ্পায়া ও হরিসর্ব্বোত্তম রাওকে খদ্দর-প্রচারের ভার দিলেন। তাহার পর তিনি শৌচে যাইলে যমুনাদাসজী অপর কামরা হইতে আসিয়া গ্রেপ্তারের গুজব শুনিলেন এবং বুক ঠুকিয়া বলিতে লাগিলেন—"বেশ হয়েছে, আমি বাপুজীর সহিত জেলে যাব। আমি বলিব—বাপু রুগ্ন (invalid), একজন সেবক না হইলে চলিবে না। তাহা হইলেই তাহারা আমাকে সঙ্গে থাকিতে দিবে।" তাহার পর প্রভুদাস এবং আমি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বম্বে পৌঁছিতে পারি, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে তিনি বেঙ্কটাপ্পায়া মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে সকলেরই কর্ত্তব্য ঠিক

হইয়া গেল। মহাত্মাজী শৌচ হইতে আসিয়া যমুনাদাসজীকে বলিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে "নব-জীবন" যে প্রকার চলিতেছে সেইরূপ চলিবে; কিন্তু "ইয়াং ইণ্ডিয়া" যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে তিনি শেষ বিদায়ের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন দেখিয়া আমি আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যমুনাদাসজীর দ্বারা প্রশ্ন করাইলাম। মহাত্মাজী তখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"যদি গবর্ণমেণ্ট আমার সঙ্গে কাহাকেও থাকিতে দেয়, তাহা হইলে তোমাকেই সঙ্গে লইয়া জেলে যাইব; কিন্তু আমি সেই জন্য কোনরূপ প্রার্থনা করিব না। প্রার্থনা করা আমার দ্বারা হইবে না। আর যদি তোমাকে সঙ্গে রাখিতে না দেয়, তাহা হইলে তুমি সবরমতি আশ্রমে গিয়া বসিয়া যাইবে। যদি সেখানে মন না বসে, তাহা হইলে কাশীতে সতীশবাবুর নিকট চলিয়া যাইবে।" এইরূপে সকলের কথাবার্ত্তা ও প্রশ্ন সমাপ্ত হইলে আমরা সেই শেষ এবং প্রত্যাশিত মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তখন অন্তরের আবেগ দমন করিয়া কোন প্রকারে বাকি সময় কাটাইবার জন্য মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব এক হেঁয়ালী প্রশ্ন তুলিলেন—"Prove that Non-violent Non-Co-operation will lead to Swaraj"—অর্থাৎ প্রমাণ কর যে অহিংস-অসহযোগ দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে। যাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি সহসা এই প্রশ্নের সদুত্তর নিশ্চয় করিতে না পারিয়া ন্যায়শাস্ত্রের আবরণ লইয়া মৌলানা সাহেবকে পাল্টা এক প্রশ্ন করিলেন। তাহাতে মৌলানা সাহেব—"বা!

প্রশ্ন করিলাম আমি, উত্তর দিব আমি—এ-তো হার গিয়া” এই বলিয়া হস্ত-সঞ্চালন পূর্ব্বক বিজয়োল্লাসে হাসিয়া উঠিলেন। তখন অপর ব্যক্তির ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া গেল। মহাত্মাজী উভয়ের এই দ্বন্দ্ব নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিলেন, এবং তাঁহার অনুগত কর্ম্মিবৃন্দের একজন প্রধান ব্যক্তি এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলেন না দেখিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী রাজনৈতিক আসর হইতে অন্তর্হিত হইলে দেশে কোন্ প্রশ্ন প্রধান হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা মৌলানা সাহেব তাঁহার প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির বলে তখনই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রশ্নের মর্ম্ম আমরা এখন যে প্রকার বুঝিতেছি, তখন সেইরূপ বুঝি নাই। এই প্রণয়-কলহ ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ট্রেণ গুণ্টাকলের নিকটবর্ত্তী হইলে মহাত্মাজী খুব স্ফূর্ত্তির সহিত গা ঝাড়া দিয়া উঠিলেন। আমরা সকলেই তখন বাহিরে সৈন্য-সজ্জা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ট্রেণ হইতে বাহিরে দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু দেখি কিছুই নহে, মাত্র দুই এক জন লালপাগড়ীধারী পুলিশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ইহা দেখিয়া আমি আনন্দে ও সোৎসাহে বলিয়া উঠিলাম—“কুছ্ নেহি হ্যায়।” মহাত্মাজীও তাহাতে হাসিয়া উঠিলেন। এদিকে তখন বম্বে মেল প্ল্যাটফরমের অপর পার্শ্বে ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া জিনিষপত্র লইয়া তাহাতে উঠিয়া ১লা অক্টোবর প্রাতে ৮ টার সময় গুণ্টাকল হইতে বম্বে যাত্রা করিলাম।

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বম্বে প্রত্যাগমন

১লা অক্টোবার সকাল ৮ টার সময় আমরা গুণ্টাকল হইতে বম্বে মেলে বম্বে অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে রাইচর, ওয়াড়ি, সালাপুর ইত্যাদি বড় বড় ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া রাত্রি তিনটার সময় ট্রেণ পুণা পৌঁছিল। পুণার সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত কেল্‌কার মহাশয় ঐ সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। পুণা হইতে আমাদের বম্বে পৌঁছিতে সকাল ৮ টা হইয়া গেল। ট্রেণ বম্বের নিকটবর্ত্তী হইলে প্রভুদাস আমাকে বলিয়া দিলেন যে, আমরা এখন আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইতেছি। বর্ত্তমান আন্দোলনের বাহ্য নিদর্শন খদ্দরের সাদা টুপি বম্বেতে যেরূপ অধিক সংখ্যক লোকের মাথায় দেখা যাইবে, এরূপ আর কোথায়ও নহে। মহাত্মাজীর আহ্বানে বম্বেতে সর্ব্বসাধারণের সভা হইলে, যখন লক্ষাধিক লোক এইরূপ সাদা টুপি মাথায় দিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হয়—তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হয়; মনে হয় যেন সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্র-তীর অতিক্রম করিয়া সভাস্থলে আসিয়া শাদা ফণা তুলিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে। প্রভুদাসের মুখে বম্বের এইরূপ গুণ-বর্ণনা ও প্রশংসা শুনিলাম। শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের সকলই এরূপ ভাল ও সাধু প্রতীয়মান হয়।

ট্রেণ বম্বের 'বড়-বন্দর' ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে খদ্দর-পরিহিত একদল স্বেচ্ছাসেবক মহাত্মাজীকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া লইল। তাহার পর মৌলানা সাহেবকে খিলাফৎ আফিসে পাঠাইয়া দিয়া মহাত্মাজী লেবার্নাম্ রোডে শ্রীযুক্ত রেবাশঙ্কর জগ্‌জীবন জাভেরী মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উঠিলেন। রেবাশঙ্করজী মহাত্মাজী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি একজন হীরক-ব্যবসায়ী। যদিও তিনি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তথাপি খাঁটি জহুরীর মত তিনি জহর চিনিয়া লইয়াছেন। নতুবা যে ভাবে তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া মহাত্মাজীর সেবা করেন, সেইরূপ সেবা করা সম্ভবপর হইত না। মহাত্মাজীও তাঁহাকে অগ্রজতুল্য মনে করেন, এবং বম্বে আসিলে তাঁহার বাটীতেই সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

নূতন বেশ-গ্রহণের পর মহাত্মাজী এই প্রথম বম্বে আসিয়াছেন। ঠিক্ দুইমাস পূর্ব্বে তিনি বম্বে ত্যাগ করিয়া একদিকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আলিগড়, পূর্ব্বদিকে আসামের ডিব্রুগড়, এবং দক্ষিণে মাদ্রাজের টিনেভেলি পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, এক প্রকার ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া ২রা অক্টোবার তারিখে পুনরায় বম্বে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার এই যাত্রা দিগ্বিজয়-যাত্রার ন্যায় প্রতীতি হইতেছে, এবং তাহার ফলে দেশময় এক অপূর্ব্ব উৎসাহের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এক বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশনে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে অসহযোগ-নীতির ব্যাখ্যাকালে তিনি তাঁহার

এই সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন যে, যদ্যপি তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থা যথাযথ প্রতিপালিত হয়, এবং যত্তপি সমগ্র দেশে শান্তি অক্ষুন্ন থাকে, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজলাভ হইয়া যাইবে ; সেই ঘোষণার পর এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। সেইজন্য ভারতের দৃষ্টি আজ তাঁহার প্রতিই সমগ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এদিকে তাঁহার প্রধান সহকর্ম্মী আলি-ভ্রাতৃদ্বয় কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কারাচিতে মোকদ্দমা চলিতেছে। এতদ্‌ব্যতীত খদ্দর প্রচারও আশানুরূপ হইতেছে না, সেজন্য মহাত্মাজী নিজের বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া ফকির সাজিয়াছেন। এই সমস্ত ঘটনা-পরম্পরার প্রভাবে লোকের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিতেছে, এবং তিনি বম্বে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া দলে দলে দর্শকবৃন্দ তাঁহার নূতন বেশ দেখিয়া যাইতে লাগিল।

তাঁহার সহচরদিগের মধ্যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে এখানে প্রথম দেখিলাম। ইঁহারা সকলেই মহাত্মাজীর কার্য্যের বিশেষ সহায়ক এবং পরবর্ত্তী অনেক ঘটনার সহিত তাঁহারা নানা সূত্রে জড়িত আছেন ; সেই জন্য এখানেই পাঠকবর্গের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিতেছি। আমাদের পৌঁছিবার অল্প পরেই ৩০।৩৫ বৎসর বয়সের এক ভদ্রলোক আসিয়া প্রভুদাস ও যমুনাদাসকে কুশল-প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। ইঁহার বিশেষত্ব এই যে, চক্ষু ফাটিয়া হাসি বাহির হয় এবং তাঁহার মন যেন অন্তরের মধ্যে না থাকিয়া চক্ষু দুইটিতে অবস্থিত ; কারণ সন্তুষ্টি ও

বিরক্তির ছায়া তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যুগপৎ আলো ও আঁধার এবং রৌদ্র ও বৃষ্টির ন্যায় খেলিতে থাকে। ইহাতে ভাবপ্রকাশের জন্য তাঁহার অধিক বাক্য-ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রভুদাসের নিকট শুনিলাম, ইনি বম্বে কংগ্রেস-কমিটীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল বেঙ্কার।

ইঁহার সহিত এক গৌরবর্ণা মহিলা আসিয়াছেন, তিনি অন্তরের আনন্দ সম্বরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও এক একটা বাক্যের মধ্য দিয়া সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তখনই আবার সেই আনন্দ অন্তরেই লুকাইয়া রাখিবেন, কিম্বা বাহিরের কথা ও ব্যবহারে প্রকাশ করিবেন এইরূপ দ্বন্দ্বে পড়িয়া এক একবার ইনি অন্যমনস্ক হইতেছিলেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই অবস্থায় অপর মহিলা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ "অনসূয়া, অনসূয়া" বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার সেই চিন্তার ঘোর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহা হইতে বুঝিলাম, ইনিই সেই আমেদাবাদের শ্রমিক-মণ্ডলীর সুপ্রসিদ্ধা অধিনেত্রী শ্রীমতী অনসূয়া বেন্।

যিনি ইঁহাকে আহ্বান করিতেছিলেন, তিনি পোষাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলন ইত্যাদি সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে বম্বে অঞ্চলের মহিলাদিগের অনুকরণ করিলেও, কেমন একটা বাঙ্গলার বাতাস সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাঙ্গলার উর্ব্বরা ধরিত্রীর যেরূপ শ্যামলা শোভা, এবং প্রকৃতিদেবী যেরূপ দুই হাতে ফল-শস্যের সম্ভার বিতরণ করিয়া সকল বিষয়ে বাঙ্গলাকে

সম্পদশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, এবং কোমলতা, প্রখরতা ও চঞ্চলতার আবরণে বাঙ্গলার বিশিষ্টতা গড়িয়া দিয়াছেন, এই মহিলার ভিতরও বাঙ্গলার সেই রূপের ছায়া দেখিতে লাগিলাম। ভারতের অন্যান্য প্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়া বাঙ্গলার স্বরূপ আমি আরও ভাল করিয়া বুঝিয়াছি। সেই জন্য প্রথম দর্শনেই শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহাশয়াকে চিনিয়া লইতে আমার কষ্ট পাইতে হইল না। তাঁহার সরল, স্বাভাবিক ইংরাজি এবং কবিত্বপূর্ণ বাক্‌চাতুর্য্যে সকলকেই মোহিত ও চমৎকৃত করে। মহাত্মাজী রহস্য করিয়া ইঁহার নাম রাখিয়াছেন,—"বুল্‌বুল্‌"।

আরও দুই ব্যক্তিকে প্রভুদাস ও যমুনাদাস একটু বিশেষ সম্মান দেখাইলেন। একজন শুনিলাম গুজরাতের রাষ্ট্রীয়-নেতা শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পেটেল ; কিন্তু তাঁহাকে যেরূপ গম্ভীর-স্বভাব ও অল্পভাষী দেখিলাম, তাহাতে কিরূপে তিনি নেতৃত্ব করেন বুঝিতে পারিলাম না। মহাত্মাজীর ছায়ায় গুজরাতের রাষ্ট্রীয়-জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতেই বোধ হয় এইরূপ অল্পভাষী ও কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে স্থান পাইয়াছেন। অপর যে সকল প্রান্তে এখনও রাজনৈতিক কার্য্য কেবল বক্তৃতাতেই পরিসমাপ্ত হয়, সেখানে এই শ্রেণীর লোকের নেতৃত্বলাভ সম্ভবপর নহে। ইঁহার সঙ্গীয় অপর ব্যক্তির পরিচয় শুনিলাম যে, তিনি গুজরাতের খদ্দর-বিভাগের কর্ত্তা—নাম, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীদাস। ইনি যেরূপ সামান্য এক-খণ্ড গামছা মাত্র গাত্রে দিয়া চলাফেরা করেন, তাহাতে ইঁহার ক্ষমতা ও গুণের সম্যক্‌ পরিচয় হঠাৎ পাওয়া অপরিচিতের পক্ষে দুঃসাধ্য।

বম্বে মহাত্মাজীর কর্ম্মের কেন্দ্রস্থল; এখানে তাঁহার সেবক ও অনুগত জনের সংখ্যা নাই। তিনি প্রায় সকলের সঙ্গেই তাঁহার মাতৃভাষা গুজরাতিতে কথা কহিতে লাগিলেন এবং সহজভাবে সকলের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন। ইংরাজী বা হিন্দীতে কথা কহিতে তাঁহাকে যেরূপ ওজন করিয়া প্রত্যেক কথা বলিতে শুনিয়াছি, তাহা এখন আর নাই। দলের পর দল আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং তিনিও সকলের সঙ্গে উৎসাহের সহিত মন খুলিয়া সকল বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। আমি গুজরাতি কথার একাক্ষরও না বুঝিয়া বহু লোকের মধ্যে থাকিয়াও একরূপ নির্জ্জন-বাস করিতে লাগিলাম। তদ্ব্যতীত, নূতন লোক বলিয়া আমার পক্ষে এখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু তিনি নিজেই আমাকে আহ্বান করিয়া নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। রাত্রি আট্‌টা অবধি এইভাবে সময় অতিবাহিত করিয়া তিনি বাহিরে কোথায় চলিয়া গেলেন এবং তাহার পর কত রাত্রিতে বাটীতে ফিরিলেন তাহা আমি জানি না। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম।

পরদিন (৩রা অক্টোবার) সোমবার, তিনি মৌন অবলম্বন করিলেন। সেদিন আর তাঁহার নিকট লোকজন নাই, কেবল আমি বসিয়া বসিয়া পাহারা দিতে লাগিলাম। যমুনাদাস মধ্যাহ্নে আসিয়া কতকগুলি টেলিগ্রামের উত্তর লিখাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। প্রাতঃকালে কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রিন্সিপ্যাল ধ্রুব আসিয়া মহাত্মাজীর সহিত গুজরাতিতে অনেক কথা কহিলেন। মহাত্মাজী লিখিয়া লিখিয়া প্রশ্ন করিতেছিলেন ও প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল ধ্রুবের কথার ধরণ হইতে মনে হইতে লাগিল যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের হ্রাস হওয়াতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, ভাইস্-চ্যান্সেলার পণ্ডিত মালবীয়জীও হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। সেই জন্যই যেন প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় মহাত্মাজীকে একটী "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষণ-পদ্ধতি" আবিষ্কারের জন্য অনুরোধ করিলেন। এই সম্পর্কে পণ্ডিতজীর কোন অনুরোধ ছিল কিনা বুঝিতে পারিলাম না।

সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া মহাত্মাজী "নবজীবনের" জন্য প্রবন্ধাদি লিখিলেন। তাহার পর রাত্রি ৯টার সময় হঠাৎ একা নির্জ্জনে ছাদের উপর চলিয়া গেলেন। পনর বিশ মিনিট পরে নামিয়া আসিয়াই কাগজ লইয়া দ্রুত লিখিতে লাগিলেন। আমি তখন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। লেখা শেষ হইতে না হইতে তিনি আমাকে এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া দিলেন "Make as many copies as possible in large hand, keeping double space, on foolscap paper if we have any."—অর্থাৎ "আমাদের ঘরে যদি ফুলস্কেপ কাগজ থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ কাগজে বেশ ফাঁক ফাঁক করিয়া বড় বড় অক্ষরে যতগুলি পার ইহা নকল করিয়া ফেল।" বাড়ীর কর্ত্তা

রেবাশঙ্করজীর নিকট কিছু কাগজ চাহিয়া লইয়া মহাত্মাজীর পার্শ্বে বসিয়াই তাহা নকল করিতেছিলাম, এমন সময় পুনরায় লিখিয়া দিলেন—"Tell Prabhudas to make my bed."—অর্থাৎ "প্রভুদাসকে আমার বিছানা করিতে বল।" বিছানা প্রস্তুত হইলেই তিনি শয়ন করিলেন। তখন রাত্রি ৯॥ টা। তাঁহার কক্ষে বসিয়া কাজ করিলে আলোকে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে, এইজন্য আমাদের কামরায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বসিয়া আটখানা নকল শেষ করিলাম।

পরদিবস তিনি অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধুইতে গেলেন। আমি তখন তাঁহার ঘরে আসিয়া একখানা নকল পৃথক্ করিয়া আল্‌পিন্ দিয়া আট্‌কাইয়া রাখিতেছি, এমন সময় তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং কয়খানা নকল হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আটখানা নকল হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন—"রাত্রিতেই আট কপি করিয়া ফেলিয়াছ? আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে বলিয়া দিব তিন কপি হইলেই কাজ চলিবে। এখন আট কপি পাইলাম, ইহাতে আমার কাজ উত্তমরূপে চলিবে।"
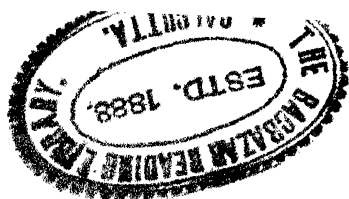
দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক শান্তিময় অবাধ্যতার সূত্রপাত

আজ ৪ঠা অক্টোবার, মঙ্গলবার। মহাত্মাজীর আহ্বানে ভারতের সকল প্রান্ত হইতে প্রধান প্রধান জননায়কগণ আজ বম্বেতে সমবেত হইয়াছেন। মহাত্মাজী এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে তাঁহাদের সকলের স্বাক্ষরিত এক ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে। সেই পত্রের খসড়া যে অবস্থায় প্রস্তুত হইয়াছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। উহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কৌশলে রচিত হইয়াছিল যে পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যে অপরাধে আলি-ভ্রাতৃদ্বয়কে গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করিয়াছে, সরকারি ভ্রূকুটি উপেক্ষা করতঃ ভারতের অপরাপর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মহাত্মাজীর আহ্বানে একযোগে সেই অপরাধ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। খসড়াপত্রে মহাত্মাজী লিখিলেন যে, সরকারী কোন কার্য্যে অথবা সৈনিক-বিভাগে নূতন যোগদান করা কিম্বা বর্ত্তমানে যাহারা চাকুরী করিতেছে, তাহাদিগের পক্ষে উহাতে নিযুক্ত থাকা উচিত কি অনুচিত, এই দুই বিষয়ে নির্ব্বিবাদে মতামত প্রকাশ করিতে সকলেরই সাধারণ অধিকার আছে। অতঃপর তিনি ঘোষণা করিলেন যে, কেবল মুসলমানের পক্ষে নহে, বর্ত্তমান

অবস্থায় প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে সরকারি সৈনিক বা অপর শাসন-বিভাগে চাকরী করা তাহাদের কর্ত্তব্য-বিরুদ্ধ। সেই জন্য তিনি সকলকেই চাকরী ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য খদ্দর সরবরাহের ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়া ঘোষণা-পত্রের উক্ত খসড়া সমাপ্ত করিলেন।

সকাল হইতেই নানা প্রান্তের নেতাদিগের আগমন-সংবাদ আসিতে লাগিল। পাঞ্জাব হইতে লালাজী, দিল্লী হইতে হাকিমজী ও ডাক্তার আন্‌সারি; যুক্ত-প্রদেশ হইতে পণ্ডিত মতিলালজী, মৌলানা আব্দুল বারি, মৌলানা হজরৎ মোহানী, পণ্ডিত জহরলালজী ও শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই; বেহার হইতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাঙ্গলা হইতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উত্তর-ভারতের বাহিনী পূর্ণ করিলেন। দক্ষিণ হইতে মাদ্রাজের রাজগোপালচারীজী, অন্ধ্র দেশের শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাপ্পায়া, কর্ণাটকের শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডে, পুণার শ্রীযুক্ত কেলকার এবং অপরাপর মহারাষ্ট্রীয় নেতা সকল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সভা বৈকালে ৩টার সময় বসিবে; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই প্রাতঃকাল হইতে কেহ কেহ মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহাকে ঐ ঘোষণা-পত্রের খসড়া দেখাইবার প্রয়োজন ছিল, মহাত্মাজী তাঁহাকে উহা দেখিতে দিলেন।

খিলাফৎ-কমিটির সভাপতি, বম্বের কোটিপতি সওদাগর ছোটানি মিঞা সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন। তিনি

মিঃ মুশির হোসেন কিডোয়াই ও মৌলানা হজরৎ মোহানীকে সঙ্গে করিয়া মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং মহাত্মাজী যাহাতে এই দুই জনকে নিজের মতাবলম্বী করিয়া লইতে চেষ্টা করেন, সেই অনুরোধ তিনি করিলেন। কিডোয়াই সাহেব এই আন্দোলনের সমস্তই পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করিতে-ছিলেন। তিনি কথা বলিবার সময় আঁকাবাঁকাভাবে শব্দোচ্চারণ করিয়া কথা কহেন। আর মৌলানা হজরৎ মোহানী যেন এক খণ্ড সচল প্রস্তর। তাঁহার ভিতরটা পাথরেরই মত শক্ত ও গুরু; দেখিয়া মনে হয়, যাহার সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইবে তাহাকেই তিনি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিবেন। তাঁহার স্থির-দৃষ্টি এবং কাঁসার মত গলা ;—এই সমস্তই তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক এবং নিজের মত ও বিশ্বাসের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠার পরিচায়ক। ছোটানি মিঞা সাহেবের এইরূপ অনুরোধ শুনিয়া মৌলানা হজরৎ মোহানী মহাত্মাজীকে বলিলেন—"না, না, আমি আপনার বিরুদ্ধ-মত নহি; তবে আপনি খদ্দরের প্রতি যতটা আস্থা প্রদর্শন করেন, ততটা আমি উচিত মনে করি না। আমি বিবেচনা করি দেশী মিলের বস্ত্র স্বদেশী।" মৌলানা আব্দুল বারি সাহেব লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন তপ্ত আগুনের গোলা। মুসলমান সমাজে তাঁহার অসাধারণ প্রভাব। মহাত্মাজীর জানুর উপর কাপড় দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"আপনার নিকট সকলকেই আসিতে হয়; কিন্তু জানু এইরূপ নগ্ন রাখা আমাদের শাস্ত্র-

বিরুদ্ধ।" মহাত্মাজী তাহাতে তাড়াতাড়ি গায়ের চাদর দিয়া পা ঢাকিয়া—"আচ্ছা, আচ্ছা, আবিতো হুয়া"—এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত জহরলালজী আসিয়া চুপ করিয়া মহাত্মাজীর পার্শ্বে বসিয়া সেই দিবসের বম্বে ক্রনিক্‌ল্ (Bombay Chronicle) পাঠ করিতেছিলেন। তাহাতে আসাম গভর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে মহাত্মাজীকে "মহাত্মা গান্ধী" লেখা হইয়াছে দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"This is perhaps the first time that a Government communique calls him a Mahatma."—অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহারে তাঁহাকে বোধ হয় এই প্রথম 'মহাত্মা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এদিকে একজন গেরুয়াধারী, পাগড়ী-বাঁধা সাধু নিজকে প্রত্যাদিষ্ট মনে করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মাজী নেতৃবৃন্দের সহিত কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত থাকায় তিনি সকাল হইতে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি ছোটানি মিঞা সাহেবকে ধরিয়া বসিলেন। মিঞা সাহেব একে ভালমানুষ, তাহার উপর বোধ হয় এই হিন্দু-মুসলমানের একতার দিনে গেরুয়াধারীকে অবজ্ঞা করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। কিন্তু মহাত্মাজী সেই সাধুবেশ-ধারীকে ধমক্ দিয়া বলিলেন, "কেন আপনি বেয়াদবি করিয়া ছোটানি মিঞার সময় নষ্ট করিতেছেন?" ছোটানি মিঞা সাহেব ইহাতে রক্ষা পাইয়া গেলেন। এই ঘটনা হইতে

দেখিলাম, মহাত্মাজী সাধারণতঃ মৃদু-স্বভাব হইলেও কোনরূপ অবিবেচনা অথবা বেয়াদবির কার্য্যে প্রশ্রয় দেন না।

বেলা ৩টার সময় নেতাদিগের সভা বসিল। মহাত্মাজীর আবাস-গৃহেই সভা বসিবে প্রথমে এইরূপ কথা ছিল; কিন্তু এখানে স্থানাভাব হইবে মনে করিয়া শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল বেঙ্কারের বাটীর নিকট চৌপাটী রাস্তার উপর স্বতন্ত্র এক স্থান করা হইয়াছিল। মহাত্মাজীর আবাসস্থল হইতে উহা ৪।৫ মিনিটের পথ। সভা বসিবার কিছু পূর্ব্বে মহাত্মাজী শ্রীমতী নাইডু প্রভৃতি ৮।১০ জনকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে সভাস্থলে চলিলেন; আমিও তাঁহাদের অনুগামী হইলাম। মহাত্মাজীর অনাবৃত দেহ, পরিধানে ক্ষুদ্র এক খণ্ড বস্ত্র, এবং হস্তে এক ঝোলা;—এই বেশে তাঁহাকে পদব্রজে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বরোদার বৃদ্ধ আব্বাস্ তায়েবজী সাহেব হাতে তালি দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া খুন্ হইতে লাগিলেন, এবং মহাত্মাজী এবার নিজেও পাগল হইয়াছেন, অপরকেও পাগল করিবার বেশ ফন্দি বাহির করিয়াছেন বলিয়া রহস্য করিতে লাগিলেন। এই রহস্যের উত্তরে মহাত্মাজীও মন খুলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে আমার উপর দ্বাররক্ষার ভার পড়িল; কারণ ইহা প্রকাশ্য সভা নহে এবং অপরিচিত ও অনিমন্ত্রিত লোকের প্রবেশ নিষেধ ছিল। সভার মধ্যস্থলে মহাত্মাজী বসিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভারতবিখ্যাত মুসলমান-প্রধানেরা দরবারে যে ভাবে বসিতে হয়, সেইভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া

সভার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। এখনও তাঁহারা মুসলমান আমলের আদব-কায়দা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুদিগের বসিবার সেরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি নাই। মহাত্মাজীর বামদিকে মিসেস্ নাইডু, পণ্ডিত মতিলালজী প্রভৃতি হিন্দুনেতৃবর্গ আসন পরিগ্রহ করিলেন। ঘোষণা-পত্রের যে খস্ড়া মহাত্মাজী প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন, তাহা প্রথমে তিনি ইংরাজীতে পাঠ করিয়া উহার উর্দ্দু অনুবাদ করিলেন। তাহার পর ঐ সম্বন্ধে বিচার চলিতে লাগিল। মুসলমান গণনায়কেরা প্রধানতঃ নীরব হইয়া রহিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যাঁহারা মহাত্মাজীর অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন, তাঁহারাও ঐ বিষয়ে বিশেষ কোন কথা উত্থাপন করিলেন না। লালা লাজপৎ রায় মহাশয় পূর্ব্বে মহাত্মাজীর মতের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন বলিয়া কাগজে পড়িয়াছিলাম। এখন তিনি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ অক্ষরে অক্ষরে আপত্তি উত্থাপন করিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। চরকা, তাঁত ও খদ্দরের নাম-গন্ধে তাঁহারা মহা হৈ চৈ করিয়া উঠিতে লাগিলেন। দেখিলাম, শ্রীযুক্ত বিঠল ভাই পেটেল, শ্রীযুক্ত কেলকার, শ্রীযুক্ত জয়কার, ডাঃ মুঞ্জি, এই কয়জন প্রধান, এবং কূট সমালোচক। মহাত্মাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া মাদ্রাজের রাজগোপালচারীজী কিছুক্ষণ তর্ক করিলেন। তাঁহার বিচার-বুদ্ধি সূক্ষ্ম এবং প্রতিপক্ষের যুক্তিখণ্ডনে তিনি সুনিপুণ। লালাজী

এবং মতিলালজী মধ্যস্থভাবে এই দুই পক্ষের মতের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'কমিটি-মীটিং' সম্বন্ধে আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি এই তর্ক-বিতর্কের ধূম দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। মহাত্মাজীকে এত কষ্ট সহ্য করিয়া কাজ করিতে হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া প্রাণে ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। বিরুদ্ধমতের প্রধান প্রধান প্রতিযোগীরা একত্র সম্মিলিত হইলে এইরূপ বাদ-বিতণ্ডা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক বটে, কিন্তু মহাত্মাজী এখন এক ভীষণ সমর-সাগরে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এই সময় এইরূপ বিতণ্ডা আমার ভাল লাগিল না। তিনি অবশ্য নিজের পক্ষের সংখ্যার বলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি-গুলি কত ধৈর্য্য-সহকারে এবং কত মর্য্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া শ্রবণ করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম।

তর্ক-বিতর্কের ফলে ঘোষণা-পত্রের ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইল বটে, কিন্তু ভাব প্রায় সেই প্রকারই রহিয়া গেল। কেবল যাহারা সরকারি কার্য্যে ইস্তফা দিবে, তাহাদের জীবিকার সম্পর্কে চরকা ও খদ্দর এই বাক্যের পরিবর্ত্তে লেখা হইল যে তাহারা তাহাদের আত্মসম্মান রক্ষার উপযোগী যে কোনরূপ জীবিকার্জ্জনের উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে। মহাত্মাজীর প্রথম খসড়াতে লেখার যে কৌশল ও সৌন্দর্য্য ছিল, তাহা এইরূপ খোঁচাখুঁচিতে অনেকটা নষ্ট হইয়া গেল বলিয়া আমার মনে হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহাত্মাজীর আহার লইয়া আসিবার জন্য আমি

একবার বাসায় গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি—শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই ঘোষণা-পত্রের একখণ্ড পরিষ্কার নকল করিয়া আনিলেন এবং প্রথমে মহাত্মাজী তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। তাহার পর অপর সকলে নাম স্বাক্ষর করিতে আরম্ভ করিলেন। সহি শেষ হইতে সন্ধ্যা ৭টা হইয়া গেল। তখন অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হওয়াতে আমি বাসায় চলিয়া গেলাম।

মহাত্মাজীর সভা হইতে বাসায় আসিতে রাত্রি সাড়ে নয়টা হইল। সৈনিক এবং পুলিশদিগকে চাকুরী ত্যাগ করিবার পরামর্শ প্রচার করিবার অভিযোগে সেই রাত্রিতেই তাঁহার গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনা, এইরূপ গুজব সভাস্থলে চলিতেছিল শুনিতে পাইলাম। সেই কারণে এত রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি অপর নেতাদিগের সহিত কথা কহিতেছিলেন এবং তাঁহার গ্রেপ্তার হইলে কি প্রণালী অনুসরণ করিয়া আন্দোলন পরিচালিত হইবে, তাহারই আলোচনা করিতেছিলেন। রাত্রিতে কেবল আমি মহাত্মাজীর ঘরে থাকি। আমাদের সকলের অজ্ঞাতসারে পুলিশ যাহাতে হঠাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে না পারে, সেই বিষয়ে সাবধান থাকিতে যমুনাদাসজী আমাকে বলিল, এবং সত্য সত্য পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইলে অপর সকলকে নিদ্রাভঙ্গ করিতে যেন অবহেলা না করি, বারম্বার এই অনুরোধ করিল।

মহাত্মাজী যখন গৃহে আসিলেন, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আসিয়াই তিনি শুইয়া পড়িলেন। সেইদিন বড়ই গরম পড়িয়াছিল; আমাকে তিনি পাখার বাতাস

করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন—'লেখ।" তাড়াতাড়ি কাগজ কলম আনিয়া লিখিতে বসিলাম। তখন প্রথমে ওয়ার্কিং কমিটিতে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, তাহা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। নেতৃবর্গের স্বাক্ষরিত ঘোষণা-পত্রে চরকা, তাঁত ও খদ্দরের উল্লেখ বর্জ্জন করা হইয়াছিল; কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবে মহাত্মাজী পুনরায় তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি লিখিলেন যে যাহারা সরকারি সৈনিক বা পুলিশ বিভাগের চাকরী ত্যাগ করিবে, তাহারা অতি অল্পদিন শিক্ষার ফলেই চরকা ও তাঁত অবলম্বন করিয়া সৎপথে থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে। খদ্দর প্রচার তাঁহার আশানুরূপ হয় নাই, এই কথার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিলেন যে, বিলাতি বস্ত্রের আমদানি একেবারে বন্ধ হইয়া যতদিন প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক প্রদেশ নিজ নিজ অভাবানুযায়ী খদ্দর প্রস্তুত করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন সমগ্রভাবে শান্তিময় রাজনৈতিক আইন-ভঙ্গ বা বিদ্রোহ-প্রবর্ত্তন সম্ভবপর হইবে না। অতঃপর তিনি ১৭ই নবেম্বর তারিখে যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে দেশব্যাপী হরতাল অনুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন। রাত্রি ১১টার সময় সিন্ধুপ্রদেশের শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাকে লিখিবার ভার দিয়া আবার আমাকে পাখার বাতাস করিতে বলিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির জন্য যখন সেই মন্তব্যের খসড়া লেখা হইয়া গেল, তখন জয়রাম দাসজী মহাত্মাজীর নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, সেই

রাত্রিতেই মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হইবেন বলিয়া যেরূপ গুজব শুন
যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার অভাবে কি ভাবে কাজ চালাইে
হইবে সেই বিষয়ে জনসাধারণকে কিছু বলিয়া গেলে ভাল হয়
মহাত্মাজী তখন "In the event of my arrest", অর্থাৎ "যা
আমার গ্রেপ্তার হয়," এই নাম দিয়া "বম্বে ক্রনিক্‌ল্‌" কাগজে এ
পত্র লিখিতে বসিলেন। লেখা ১১টা ৪০ মিনিটে সমাপ্ত হইল
এদিকে নেতাদিগের স্বাক্ষরিত ঘোষণা-পত্র দেশের চারিদিবে
টেলিগ্রাম করিয়া পাঠাইবার এবং উহা "বম্বে ক্রনিক্‌ল্‌" ‹
ছাপাইবার ভার লইয়া শ্রীযুক্ত মহাদেব গিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রি
১২টা অবধি তিনি প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া মহাত্মাজী
কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। জয়রামদাসজী বলিলেন—"পত্র
সহ মহাদেবকে পথে গ্রেপ্তার করিয়া লয় নাই ত?" রাত্রি ১২টা
পর জয়রামদাসজী চলিয়া গেলেন, এবং মহাত্মাজীও তখন নিদ্র
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাত্রি সাড়ে ১২টা
সময় "বম্বে ক্রনিক্‌ল্‌" এর লোক আসিল। তাহাকে বিদায় দিয়
দীপ নিভাইয়া শুইয়াছি, এমন সময় শ্রীযুক্ত মহাদেব আসিয়
দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী তখনই শ্রীযুক্ত
মহাদেবকে ডাকিয়া গুজরাতি ভাষায় নানারূপ প্রশ্ন করিতে
লাগিলেন। আমি তাঁহাদের উভয়ের কথা কিছুই বুঝিলাম না
তবে শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশেষ দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছিলে
এবং তিনি সঙ্গে থাকিলে মহাত্মাজীর সকল বিষয়ে সুবিধা ও
শ্রম লাঘব হয় ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম।

পরদিবস (বুধবার) প্রাতে "বম্বে ক্রনিক্‌ল্" এ পত্র প্রকাশিত হইলে সহরে মহা উত্তেজনা ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। ব্যক্তিগত-ভাবে দায়িত্ব গ্রহণপূর্ব্বক ভারতের প্রায় চল্লিশ জন প্রধান নেতা রাজ-কর্ম্মচারী, সরকারি সৈনিক ও পুলিশদিগকে চাকরী ইস্তফা দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে এই কথা প্রচার হইতে লাগিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রাতে আসিয়া মহাত্মাজীকে বলিয়া গেলেন যে সহরের ইংরাজ অধিবাসীরাও ইহাতে আশ্চর্য্য ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তখন তাজমহল হোটেলে বাস করিতেছিলেন। সেখানে কোন কোন ইংরাজ ঐ সংবাদ পড়িয়া শ্রীমতী নাইডুকে এই বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন "What do you mean? Are you really serious?" অর্থাৎ তোমাদের উদ্দেশ্য কি? সত্য সত্যই কি তোমরা ঐরূপ করিতে প্রস্তুত? বেলা ১২টার সময় ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসিল। সেই সভায় মহাত্মাজীর প্রস্তাব গৃহীত হইল। সেই দিনই প্রায় সকল নেতা নিজ নিজ প্রান্তে চলিয়া গেলেন। দেশে শান্তিরক্ষা এবং খদ্দর প্রচার—এই দুই কাজ এখন তাহাদের প্রধান কাজ হইবে—ইহাই মহাত্মাজী বলিয়া দিলেন। তিনিও সেই দিন (৫ই অক্টোবার) সন্ধ্যার সময় বম্বে ত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বজ্রাদপি কঠোর

বম্বের কোলাবা ষ্টেশনে মহাত্মাজীকে দর্শন করিবার জন্য বহুলোক আসিয়া ভিড় করিল। সকলেরই মাথায় সাদা খদ্দরের টুপি, অথচ কেহ কাহারও কথা শুনে না। ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইল, তথাপি লোকের ধাক্কাধাক্কি ও গোলমালে আমাদের জিনিষপত্র আমরা ট্রেণে তুলিতে পারিতেছিলাম না। যমুনাদাসজী তাহা লইয়া সকলের সঙ্গে গলা ফাটাইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিল। কিন্তু কে কাহার কথা শোনে? গুজরাতের বুলি কিছুই না বুঝিয়া, সকলের মুখে কেবল—"ছে, ছে, ছে, ছে" শব্দ শুনিতে লাগিলাম। ভিড়ের মধ্যে আমি এক ফাঁকে গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু মালপত্র কিছুতেই তোলা যাইতেছিল না দেখিয়া শেষে মহাত্মাজী নিজে কামরার দরজায় দাঁড়াইলেন এবং লোকদিগের ঐরূপ ব্যবহার "অত্যাচার" বলিয়া গুজরাতিতে মিষ্টবাক্যে কিছু ভৎর্সনা করিলেন, বুঝিলাম। তখন গোলমাল থামিয়া গেল। তাহার পর ধরাধরি করিয়া মালগুলি তোলা হইলে ২।৪ সেকেণ্ডের মধ্যে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

মহাত্মাজীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী, শ্রীমতী অনসূয়া বেন্ প্রভৃতি আমরা বহুলোক চলিয়াছি। মহাত্মাজী ও অনসূয়া বেন্ ট্রেণে এক কামরায় বসিলেন। আমাকে কার্য্যোপলক্ষে একবার সেখানে যাইতে দেখিয়া, অনসূয়া বেন মহাত্মাজীর নিকট আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহাত্মাজী আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলেন, তন্মধ্যে মাত্র "বৈষ্ণব" কথাটি আমি বুঝিয়াছিলাম। তাহাতে মনে হইল আমি একজন "বৈষ্ণব" এইরূপ তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছেন।

মহাত্মাজীর কামরা হইতে আসিয়া কিছুক্ষণ রাজগোপালা-চারীজীর নিকট বসিলাম। "ইয়াং ইণ্ডিয়া" পত্রে প্রকাশিত মহাত্মাজীর "Hinduism" ("হিন্দু-ধর্ম্ম") প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি আমার সহিত নানারূপ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রবন্ধে মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তৎসঙ্গে অবাধ বিবাহ ও অবাধ আহার-বিহারের বিরুদ্ধেও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত দুই মতের সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভবপর, রাজগোপালাচারীজী তাহা লইয়া বিচার করিতে লাগিলেন। ইহার পর আশ্রমে পৌছিয়া তিনি ঐ বিষয়ে মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে মহাত্মাজী বলিলেন যে, তিনি কর্ম্মফলে বিশ্বাসী, সেইজন্য তিনি বিবাহ এবং আহারাদির নিয়ম-পদ্ধতি সকল নষ্ট করিবার পক্ষপাতী নহেন। তবে অস্পৃশ্যতার নামে নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর যেরূপ অত্যাচার হইতেছে, এবং তাহাদের মনুষ্যত্বের দাবী যে ভাবে

দলিত হইতেছে, তাহা তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন, এবং সেইজন্য তাহা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বম্বেতে প্রভুদাসের সহিত আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইল। তাহাকে ওয়ার্ধা (Wardha) যাইয়া সেখানকার আশ্রমে কাজ করিবার হুকুম মহাত্মাজী দিয়াছেন। আসিবার সময় তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া প্রাণে বড় ক্লেশ হইতে লাগিল। তাহার পর আমি যখন রাজগোপালাচারীজীর নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, তখন যমুনাদাস মহাত্মাজীর কামরা হইতে আসিয়া বলিল—"My death warrant is signed" অর্থাৎ "আমার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে"। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহাকে রাজকোটে গিয়া চরকা এবং তাঁতের কাজ করিতে হইবে, এইরূপ মহাত্মাজী স্থির করিয়াছেন। মহাত্মাজীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া সেই আদেশকে সে মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় কঠোর মনে করিতে লাগিল। মহাত্মাজীর নিত্যসঙ্গী ও প্রিয়ভক্ত শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই তখন "Independent" ("ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট") কাগজের দায়িত্ব লইয়া এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু বহুকাল যাবৎ মহাত্মাজী হইতে দূরে থাকা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। অথচ যাহাকে যে স্থানে রাখা বা যে কার্য্যে নিয়োগ করা প্রয়োজন বলিয়া মহাত্মাজী মনে করেন, তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি, একদিন সান্ধ্য-প্রার্থনার পর রাত্রি ৮ টার সময় ৩।৪ জন প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ব্যক্তিবিশেষ

সম্পর্কে কোন একটী বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহাতে তাঁহাকে সম্মত করিবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আমার তখন মনে হইল যে, মহাত্মাজীকে বহির্দৃষ্টিতে অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইলেও, ভিতরে তিনি বড় শক্ত। সকলের বক্তব্য মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া এক কথায় তিনি উত্তর দিয়া বসিলেন—"আমি তোমাদের কথা কিছুই বুঝিতেছি না।" এইরূপ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে বুঝিয়াছি যে, কেবল অনুনয়-বিনয় বা প্ররোচনার সাহায্যে মহাত্মাজীর দ্বারা কেহ স্বীয় কার্য্য-সিদ্ধি করিতে পারে না।

কথাগুলি এই জন্য লিখিলাম যে, ইহা হইতে মহাত্মাজীর প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশ বুঝা যায় যে, কেবল আনুগত্য ও সেবা দ্বারা তাঁহাকে কেহ বশ করিতে পারে না। সাধারণতঃ জগতে যত লোক দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই কিছু না কিছু লোভের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন;—কেহ বা রক্তের আকর্ষণে কাহারও প্রতি আকৃষ্ট; কেহ বা স্নেহের ও কেহ বা খোসামোদের অধীন। কিন্তু মহাত্মাজীকে দেখিলাম—নিতান্ত অনুগত, আত্মীয় ও সেবা-পরায়ণ ব্যক্তিদিগেরও ইচ্ছা বা বাসনার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যাহা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তাহাই তিনি করিয়া যাইতেছেন, কোনরূপ মায়া বা স্নেহের বশীভূত হইয়া তাঁহার বুদ্ধি ও বিচারকে আচ্ছন্ন হইতে দিতেন না। তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি—এক সময় অস্পৃশ্যতা লইয়া তাঁহার সহিত

তাঁহার পত্নীর মতভেদ হয়, তখন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিতে বলিয়াছিলেন। ন্যায় এবং সত্যের জন্য তিনি কতদূর কঠোর হইতে পারেন, তাহা এই ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

সত্যাগ্রহাশ্রম—সাবরমতি

৬ই অক্টোবার প্রাতে ৮টার সময় গুজরাত মেল আমেদাবাদ পৌঁছিল। আমেদাবাদের পর সাবরমতি ষ্টেশন। কিন্তু মেল ট্রেণ সাবরমতি ষ্টেশনে দাঁড়াইবে না। সেইজন্য আমাদিগকে আমেদাবাদে নামিতে হইল। আমেদাবাদ ষ্টেশন হইতে আশ্রম দুই ক্রোশ ব্যবধান।

কাপড়ের কলের ব্যবসায় দ্বারা আমেদাবাদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহাতে সহরের অস্থিমজ্জায় কল-কারখানা প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং সর্ব্বদা কল-কব্জা ও লোহা-ইস্পাতের সংস্পর্শে সহরের আকৃতি-প্রকৃতি সমস্তই যেন লোহার ন্যায় রুক্ষ, নীরস ও প্রাণহীন হইয়া গিয়াছে।

বিদেশ জয় করিয়া দেশের রাজা দেশে ফিরিয়া আসিলে সাধারণ্যে যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়, আমেদাবাদের জনমণ্ডলীও সেইরূপ উৎসাহ ও উল্লাসে মহাত্মাজীকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিতে আসিল। তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়া রাজ-গোপালাচারীজীকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। তাহার পর জনতার হ্রাস হইলে আমরা এক মোটার-লরীতে মালপত্র বোঝাই করিয়া ষ্টেশন হইতে রওনা হইলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সাবরমতি নদী পাইলাম। নদী পার হইবার এক পাকা সেতু আছে এবং অপর পারে একটী সরকারি রাস্তা নদীর সমান্তরালভাবে সোজা উত্তরে সাবরমতি ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সেই রাস্তা দিয়া প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিলে সহসা একস্থানে চারিদিকে খোলা ময়দানের মধ্যে অনেকগুলি নূতন বাড়ী-ঘর পথিকের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহাই সাবরমতির সুপ্রসিদ্ধ সত্যাগ্রহাশ্রম। উক্ত সরকারি রাস্তার পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকে, একুনে প্রায় সাড়ে তিন শত বিঘা জমি লইয়া আশ্রমটী বিদ্যমান। আশ্রমের পূর্ব্বভাগ দিয়া সাবরমতি নদী দক্ষিণমুখে প্রবাহিত। নদীর অপর পারে অবস্থিত আমেদাবাদ সহর নদীর কূল ধরিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে দৈর্ঘ্যে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এইস্থানে মহাত্মাজী সামান্য এক তাঁবু গাড়িয়া আশ্রমের পত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ সেই স্থান লোকজন এবং বাড়ী-ঘরে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আশ্রম হইতে আরও এক মাইল উত্তরে রাস্তাটি সাবরমতি ষ্টেশন অবধি চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনের নিকটেই সাবরমতি জেল। ইহা বম্বে প্রদেশের এক প্রধান জেল। এখানে ১২০০ কয়েদী রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। আশ্রম, জেল এবং রেল-ষ্টেশন, এই তিন জিনিষ সাবরমতিতে আছে, এবং এই তিনের জন্যই এই স্থান প্রসিদ্ধ।

সরকারি রাস্তার পূর্ব্ব এবং পশ্চিম, দুইদিকে আশ্রমের

দুইভাগের কথা উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বভাগে নদীর উপকূলে নদীর দিকে মুখ করিয়া একটি বড় কুটীর আছে, তাহাতে মহাত্মাজী বাস করেন। কুটীরের সম্মুখে একটি বড় খোলা বারান্দা। রাত্রিতে তিনি বার মাস ঐ খোলা বারান্দায় শয়ন করিয়া থাকেন। শীতকালেও রাত্রিতে তিনি সেই উন্মুক্ত স্থানে নিদ্রা যান। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, রাত্রিতে শয্যা হইতে যদি তিনি আকাশ দেখিতে না পান, তাহা হইলে তাঁহার নিদ্রা হয় না এবং গভীর নিশীথে আকাশের তারার দিকে চাহিয়া থাকা, তাঁহার এক বহু পুরাতন অভ্যাস। বারান্দার দক্ষিণ পার্শ্বে মহাত্মাজীর বসিবার ঘর। দিনের বেলা তিনি এই ঘরে বসিয়া কাজকর্ম্ম করেন। ইহা ব্যতীত এই কুটীরে আরও চারিখানি ঘর আছে।

মহাত্মাজীর কুটীরের ঈষৎ দক্ষিণে নদীকূলে কিছু উন্মুক্ত পরিষ্কার স্থান খোলা পড়িয়া আছে। সেখানে প্রত্যহ প্রাতে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে এবং সন্ধ্যার সময় আশ্রমের সকল নর-নারী ও বালক-বালিকা একত্রিত হইয়া তান-লয়-সহযোগে সুমধুর ভগবন্নাম-কীর্ত্তন ও সমস্বরে সুর করিয়া গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকেন। মহাত্মাজীর উপস্থিতি এবং স্থানমাহাত্ম্যের গুণে এক এক দিন প্রার্থনা খুব জমাট বাঁধিয়া যায়। সম্মুখে খরস্রোতা নদী এবং উপরে দিগন্তবিস্তৃত আকাশ; তাহাতে কৃষ্ণপক্ষের বা শুক্লপক্ষের চন্দ্র কখনও প্রাতে কখনও সন্ধ্যায় সেই প্রার্থনার স্থান জ্যোৎস্নামণ্ডিত করিয়া প্রার্থনার স্বাভাবিক

মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আরও শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। মহাত্মাজী আশ্রমে থাকিলে, সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি প্রার্থনার সময় প্রার্থনাস্থলে উপস্থিত হন।

মহাত্মাজীর কুটীর ব্যতীত আশ্রমের পূর্ব্বভাগে আশ্রমবাসী-দিগের বাসোপযোগী অন্যান্য কুটীর কিছুদূর অন্তর অন্তর আছে। তদ্‌ব্যতীত তাঁতশালা, চরকাবিভাগ, গোশালা এবং অনেক কৃষি-জমি আছে। আজকাল জমিতে বেশীর ভাগ তূলার চাষ হইয়া থাকে।

রাস্তার পশ্চিমভাগে আশ্রম-সংলগ্ন পাঠশালার সুবিস্তৃত অট্টালিকা প্রথমেই পথিকের নয়ন আকর্ষণ করিবে। অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসের প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে এখন কেবল বিদ্যাভ্যাসে মগ্ন থাকিবার সময় নহে। বর্ত্তমান দেশ-ব্যাপী ধর্ম্মযুদ্ধে সকলকেই তিনি কোন না কোন ভাবে নিয়োগ করিতে প্রয়াসী। কেহ বা চিন্তাশক্তি, কেহ বা কর্ম্মকুশলতার দ্বারা এই যুদ্ধের সহায়তা করিবেন; আর বালকেরা তাহাদের হস্তপদাদি ব্যবহার দ্বারা চরকা ও তাঁতের কাজ করিয়া এই আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন করিবে। বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, সকলের জন্য মহাত্মাজী এইরূপ এক একটা কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, এবং দেশের আপামর-সাধারণ সকলকেই এই ভাবে কর্ম্মসূত্রে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার আন্দোলন আজ এই বিশাল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছে।

বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসের প্রথা বন্ধ হওয়াতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু মহাত্মাজীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। কারণ, যাহাতে মানুষ গড়িয়া উঠিবে না, যে শিক্ষা-লাভে শিক্ষার্থীর মেরুদণ্ড শক্ত হইবে না, এবং সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইবে না, এমন শিক্ষা তিনি চাহেন না।

বিদ্যামন্দিরের পশ্চিমে আশ্রমের পুস্তকাগার ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ভোজনাগার। এতদ্ভিন্ন এই পশ্চিমভাগে আরও যে সকল বাড়ী-ঘর উঠিয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বিদ্যালয়কেই কেন্দ্র করিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যামন্দিরের উত্তরে চারি সারি গৃহে ১২টী পরিবারের বাসোপযোগী ব্যবস্থা আছে, সেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সপরিবারে বাস করেন। তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে ইমাম্ সাহেবের কুঠী। ইমাম্ সাহেব একজন আরব দেশীয় মুসলমান। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসা করিতেন। সেই সময় মহাত্মাজী এসিয়াবাসীর মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে বিশ্ব-বিশ্রুত আন্দোলন পরিচালন করেন, ইমাম্ সাহেব তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি মহাত্মাজীর সহিত যুক্তভাবে আছেন, এবং হিন্দু ও মুসলমান নিজ নিজ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও কিরূপে ভ্রাতৃভাবে একসঙ্গে থাকিতে পারে, এই আদর্শ প্রদর্শনের জন্য মহাত্মাজী ইমাম্ সাহেবকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে লইয়া আসিয়াছেন।

আশ্রমের পূর্ব্ব এবং পশ্চিমভাগ একই আদর্শ এবং একই

উদ্দেশ্যে গড়িয়া উঠিলেও কোন কোন বিষয়ে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু আশ্রমবাসীদিগের দৈনিক জীবনের বাহ্য কর্ম্মপদ্ধতির উপর সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রভাব তেমন দৃষ্ট হয় না। এই কর্ম্মপদ্ধতির মূল সন্ধান করিতে হইলে একটা বিষয় প্রথম হইতেই বুঝা আবশ্যক। শরীর, মন এবং আত্মা —এই তিন বস্তু লইয়া মানুষ। অথচ সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে যাঁহারা মানসিক বা আত্মিক উৎকর্ষ-বিধানে ব্যগ্র, তাঁহারা শরীরের কথা ভুলিয়া গিয়া, অথবা শরীরকে অবহেলা করিয়া, বিদ্যাভ্যাস বা ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকেন। এই ক্রটী দূরী-করণের জন্য আশ্রমের সকলকেই শরীরযাত্রার নিমিত্ত কিছু না কিছু শারীরিক কাজ করিতে হয়। এখানকার সুপণ্ডিত শিক্ষকেরাও ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া, কাঁধে ভার বাঁধিয়া সেই জল নিজেদের ঘরে লইয়া যান। এতদ্ব্যতীত, ধোপার কাজ ও বাসন মাজা ইত্যাদি সমস্ত নিজেদের হাতে সকলকে করিতে হয়। এ দিকে ভোর চারিটার সময় নিদ্রাভঙ্গের ঘণ্টা বাজিলে, শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতের প্রার্থনায় এবং সন্ধ্যার সময় সান্ধ্য-প্রার্থনার ঘণ্টা বাজিলে সন্ধ্যার প্রার্থনায় যোগ দিতে হয়। এই সমস্ত বিষয়ে এক নিয়ম আশ্রমের সকলকে পালন করিতে হয়। কিন্তু মহাত্মাজী যে অসামান্য ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ নিজের জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এবং যাহা তিনি আশ্রম-জীবনের মধ্য দিয়া দেশবাসীর সমক্ষে প্রস্ফুটিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, সেই আদর্শ মত দৈনিক জীবন যাপন করা সকলের

পক্ষে, বিশেষতঃ গৃহীর পক্ষে সহজ নহে। সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ পালন, ইত্যাদি ব্রত জীবনের লক্ষ্যীভূত হইতে পারে, কিন্তু কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভাবে সেই ব্রতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন পরিচালন বহু সুকৃতি ও আত্মশুদ্ধি-সাপেক্ষ। মহাত্মাজী নিজেও ইহা স্বীকার করেন, সেইজন্য কাহাকেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বাহ্যিক আড়ম্বরের সহিত ঐ ব্রত গ্রহণ করিতে তিনি অনুরোধ করেন না। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, জোর-জবরদস্তি করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া বা কোন কাজ করাইয়া লওয়া, মহাত্মাজীর শিক্ষা-পদ্ধতি নহে। তিনি কেবল দিনের পর দিন নিজের জীবন শুদ্ধ হইতে আরও শুদ্ধ, এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতর করিবার জন্য ব্যস্ত ও উৎসাহী। তাহা দেখিয়া লোকে স্বাভাবিক ভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহা গ্রহণ বা শিক্ষা করিতে পারে, ততটুকু গ্রহণ করিলেই তিনি সন্তুষ্ট এবং সুখী।

পঞ্চম অধ্যায়

আশ্রমের প্রার্থনা

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গের ঘণ্টা বাজিয়াছে। ঘণ্টার কর্ণভেদী শব্দ সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া দিল। এই জাগরণ কি বাহ্যিক নিদ্রাভঙ্গ? না—ইহার ভিতর মানবের আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিবারও আহ্বান রহিয়াছে? আশ্রমের চারিধারে জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর ত্বরিত-পাদক্ষেপে সকল আশ্রমবাসী প্রার্থনার স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উষারাণী এখনও রাত্রির কোলে নিদ্রিতা; আর প্রিয়-সখী রজনী সহস্র নয়ন মেলিয়া নিদ্রিতা উষাকে লোকচক্ষু হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সেই সহস্র নয়নের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি গগন ব্যাপিয়া ঝিকিমিকি করিতেছে। সম্মুখে নিশার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া খরস্রোতা নদীর কুলুকুলু শব্দ দূরে বিজন-পথে অস্পষ্ট সঙ্গীত-ধ্বনির ন্যায় শুনা যাইতেছে। সহসা সেই ধ্বনির তানে তান মিলাইয়া শতকণ্ঠে প্রার্থনার গান ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

প্রাতর্ভজামি মনসো বচসামগম্যম্।
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ॥

যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচুঃ।
তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্রম্ ॥

অনুবাদ ঃ—যিনি মন এবং বাক্যের অগোচর ; যাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত বাক্য প্রকটিত হয় ; "নেতি" "নেতি" বলিয়া বেদ সকল যাঁহার বর্ণনা করে ; যাঁহাকে দেবতাদিগেরও দেবতা, জন্মরহিত, অচ্যুত এবং আদি-পুরুষ আখ্যা দেওয়া হয়, তাঁহাকে আমি এই প্রাতঃকালে ভজনা করিতেছি।

ইহার পর গান করিয়া পৃথ্বী-বন্দনা, সরস্বতী-বন্দনা, গুরু-বন্দনা, বিষ্ণু-বন্দনা ও শিব-বন্দনা করা হইলে, নিজের শুদ্ধ কামনা শ্রীভগবচ্চরণে অর্পিত হইল। সে সকল কামনা কি প্রকারের? "আমি রাজ্যও চাহি না, স্বর্গও চাহি না, মুক্তিও চাহি না, কেবল দুঃখতপ্ত প্রাণীদিগের আর্ত্তিনাশ কামনা করি। প্রজাদিগের কল্যাণ হউক। পৃথিবীর রাজন্যবর্গ ন্যায়মার্গ অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পরিপালন করুন, সর্ব্বদাই গো-ব্রাহ্মণের শুভ হউন, এবং সমস্ত লোক সুখী হউক্, ইহাই কামনা করি।" এইরূপে নিজের শুদ্ধ কামনা নিবেদন করিয়া ও ইত্যাদি শ্লোক সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করা হইল।

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়।
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় ॥
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায় ॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যম্।
ত্বমেকং জগৎকারণং স্বপ্রকাশম্॥
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ।
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥

অনুবাদঃ—সৎস্বরূপ জগতের কারণ যিনি, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। চিৎস্বরূপ সর্ব্বলোকের আশ্রয় যিনি, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। মুক্তিদাতা ও অদ্বৈততত্ত্ব যিনি, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। সর্ব্বব্যাপী, শাশ্বত, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে নমস্কার করিতেছি।

তুমিই একমাত্র শরণের পাত্র; তুমিই একমাত্র বরেণ্য; তুমিই জগতের পালক এবং স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের একমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকর্ত্তা; তুমিই একমাত্র সৃষ্টির অতীত, নিশ্চল এবং নির্ব্বিকল্প পুরুষ।

ইহার পর গায়ক তোমাকে শুনাইয়া দিবেন,—"হে মানব! তুমি একাকী এ জগতে বিচরণ করিতেছ না; সমস্ত জগতের সহিত তোমার একত্ব-সম্বন্ধ রহিয়াছে। সে একত্ব কি করিয়া তুমি জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহার চেষ্টা কর। কর্ম্মের সূত্র দিয়া জীবন পবিত্র করিতে হইবে এবং পবিত্রতা অর্জ্জন করিলেই জীবনের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে। ভিতরে দ্বন্দ্বশূন্য হইলেই বস্তুতঃ তুমি জগতের সহিত এক হইয়া যাইবে। সেই জন্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তোমাকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনাইয়া দেওয়া হইল। এই শিক্ষা লাভ করিয়া

যাও, সমস্ত দিন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাক এবং ঐ শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা কর। কর্ম্ম ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত তুমি অবস্থান করিতে পার না ও পারিবে না। কর্ম্মই তোমাকে উদ্ধার করিবে; আবার কর্ম্মই তোমাকে নিরয়গামী করিতে পারে। বিভিন্ন কর্ম্মের দোষগুণ তোমাকে শুনাইয়া দেওয়া হইল। এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া দিবসের কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত কর।

এই ভাবে আশ্রমের দিনের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। যদি তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, আচার্য্যকে প্রশ্ন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে পার। যাহাতে উৎসাহের সহিত, হৃদয়ে উপযুক্ত বল লইয়া, দিনের কার্য্য পবিত্রভাবে নির্ব্বাহ করিতে পার, তাহার জন্য যে প্রকার মানসিক সরঞ্জাম আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিয়া লও।

দিনান্তে সমস্ত কর্ম্মের অবসানে, আবার প্রার্থনার আহ্বান ও ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইবে। তখন অস্তগামী সূর্য্য পশ্চিম আকাশকে রঙ্গিন করিয়া ডুবিয়া গিয়াছেন। আবার সেই নদীর তীর, উন্মুক্ত আকাশ, সন্ধ্যার পবিত্র মৃদুমন্দ বাতাস—সকলে মিলিয়া যেন তোমার দিনের শ্রান্তি দূর করিতে ব্যগ্র হইয়াছে। আশ্রমের বালক-বালিকাদিগের উৎসাহধ্বনি সন্ধ্যার নীড়বিহারী পক্ষীসকলের যুক্ত কাকলীর ন্যায় ধ্বনিত হইতেছে। সহসা সেই ধ্বনি স্তব্ধ করিয়া মধুর স্বরে জগৎপতির গুণ-বর্ণনা বাজিয়া উঠিল। জগতের যিনি অধিপতি, যিনি সকলেরই আশ্রয়, যাঁহার বিহনে কিছুই বর্ত্তমান থাকিতে

পারে না—আমাদিগের সকলের ভক্তি, শ্রদ্ধা, আকর্ষণ ও ভালবাসা তাঁহারই চরণে অর্পিত হউক্। ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি দিব্য স্তবের দ্বারা যাঁহার স্তব করেন; সমস্ত উপনিষদ্ সামগানের দ্বারা যাঁহার গুণগান করেন; ধ্যানাবস্থিত ও তদ্গতমন যোগীরা যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন এবং সুরাসুরেরাও যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই দেবতা তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি।

অতঃপর শাস্ত্রের পবিত্র শ্লোক মধুর-কণ্ঠে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া তোমাকে শুনাইয়া দেওয়া হইবে যে যদি শান্তি আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাকে বাসনা ও কামনা জয় করিতে হইবে; সমস্ত বাসনাকে অন্তরে সমাহিত করিতে হইবে। প্রাতে তোমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছিল এবং কিরূপ কর্ম্ম শ্রেয়ঃ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে যখন দিনের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রান্তি অপনোদনের জন্য যাইতেছ, তখন তোমাকে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, শ্রান্তি কেবল নিদ্রাতেই নিবারিত হইবে না। কারণ, শারীরিক শ্রান্তিই একমাত্র শ্রান্তি নহে। দিবসের কর্ম্মের ভিতর দিয়া তুমি কত বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াছ; তাহাতে তোমার চিত্ত কত প্রকারে উদ্বেলিত হইয়াছে; সেই সমস্ত ঝাড়িয়া মুছিয়া যদি তুমি শুদ্ধ হইতে পার, তবেই তোমার খাঁটি বিশ্রাম লাভ হইবে। স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ সম্মুখে রক্ষা করিয়া তোমাকে কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে এবং উন্মার্গগামী বহিরিন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া

'প্রজ্ঞা' ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সমুদ্র মধ্যে যেমন সমস্ত নদ-নদীর জল প্রবেশ করে, সেইরূপ যাহার বাসনা-কামনা বহির্মুখী না হইয়া নিজের অন্তরেই সমাহিত হয়, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হ'ন; কামনাবশগ লোক তাহা লাভ করিতে পারে না।

আমরা যদি সকাল ও সন্ধ্যার এই উপাসনা, প্রার্থনা ও শিক্ষা বাদ দেই, তাহা হইলে যে মহাত্মার জীবনের স্বপ্ন এই আশ্রমরূপে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাঁহার সমস্ত কার্য্যের গূঢ় অর্থ কিছুতেই তাহার কোন সন্ধান পাইব না।

তাঁহার বাহিরের কর্ম্মশক্তি আজ ভারতকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে এবং তাঁহার আহ্বান ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমরা যদি কেবল তাঁহার এই বাহিরের কর্ম্মশক্তির দ্বারা তাহার পরিমাপ করিতে যাই, তাহা হইলে প্রকৃত বস্তু বুঝিতে পারিব না, তাঁহার ঐ শক্তির মূল কোথায় তাহা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাত্মাজীর ধর্ম্ম-জীবনের মূল সূত্র

আশ্রমের প্রার্থনা হইতেই মহাত্মাজীর ধর্ম্ম-জীবনের ভিত্তি কোথায় তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই প্রার্থনাতে যেরূপ শুদ্ধ, অহং-বিরহিত, পবিত্র এবং সাত্বিক কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্ম্মের লক্ষ্য, গতি এবং পরিসমাপ্তি সমস্তই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কর্ম্মকে শুদ্ধ এবং পবিত্র করাই ধর্ম্ম-জীবনের এক প্রধান সমস্যা। যগুপি মানুষের শারীরিক এবং মানসিক কর্ম্ম অশুদ্ধ ও অপবিত্র হয়, তাহা হইলে কেবল ধর্ম্মের তথ্য আলোচনা করিয়া ধর্ম্ম-জীবন লাভ সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। সেই জন্য কোন্ কর্ম্ম বন্ধন এবং কোন্ কর্ম্ম মুক্তির হেতু, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ম্মের ভালমন্দ বিচার আবশ্যক। মহাত্মাজী কর্ম্মমার্গের একজন বীর-সাধক। কর্ম্মের শত সহস্র আবর্ত্তের মধ্যেও তিনি নির্ব্বিকার ও নিরবলম্ব ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নিজেকে পরিচালিত করিতে পারেন, এবং কোন প্রকার কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন না। তাহাতেই তিনি রাজনৈতিক কার্য্য-পদ্ধতি ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার

রাজনীতিতে ছল, চাতুরী, কপটতার স্থান কিছুই নাই। তাঁহার রাজনীতি কোন ব্যক্তি, জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের সাংসারিক স্বার্থ, ভোগ, সুখ, মান, ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদ্‌লাভের উপায়-স্বরূপ নহে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের সেবাই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য। যাঁহারা স্বরাজ বলিলে কেবল রাজত্বলাভ মনে করেন, অর্থাৎ ইংরাজদিগের হস্ত হইতে প্রধানতঃ রাজ্য-পরিচালনের ক্ষমতা নিজেদের আয়ত্বাধীন করিবার জন্যই যাঁহারা ব্যাকুল, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে সেইরূপ স্বরাজলাভ হইলেও মহাত্মাজী তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না। কারণ সেই স্বরাজলাভের পর যদি কোন বিশিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায় শক্তিশালী হইয়া সাধারণের উপর অন্যায় আধিপত্য স্থাপন করেন, তাহা হইলে মহাত্মাজী তাহার বিরুদ্ধতা করিবেন এবং সেই বিশিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের শক্তি হরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন। মহাত্মাজী নিজে অর্থ, প্রভুত্ব বা মান কিছুরই ভিখারী নহেন। এই দুঃস্থ ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়ায় বিগলিত হইয়া তিনি বর্ত্তমান রাজ্য-পদ্ধতির আমূল সংশোধন অথবা উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার কার্য্য এত শুদ্ধ, এত পবিত্র, এত সাত্ত্বিক; এবং সেই কারণেই তাঁহার রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলিও তাঁহার ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ-রূপে প্রতিভাত হইতেছে।

জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম এই ভাবে ধর্ম্মের দৃষ্টিতে দেখিয়া উহাকে তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, কর্ম্মের উক্তরূপ ভালমন্দ

এবং শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচারে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্খলিতপদ হ'ন না। সংসারে থাকিয়া ও সংসারের সমস্ত কর্ম্মের সহিত আবদ্ধ হইয়া, এইভাবে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম পথ অনুসরণ করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ মায়া-মমতা, সূক্ষ্ম ভোগস্পৃহা এবং বাসনা পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা পদে পদে মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহার সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সেইজন্য অনেক সাধক সাধনার প্রথমাবস্থায় সংসার হইতে দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু মহাত্মাজী সেই পন্থার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার একজন প্রিয় অনুচর কিছুকালের জন্য ঐরূপ নির্জ্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাত্মাজী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ নির্জ্জনবাসে লাভ নাই। সংসার হইতে দূরে গিয়া থাকিলে সাময়িক ভাবে সংসারের প্রভাব বা প্রলোভন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সেই প্রভাব বা প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহার উপর আধিপত্য স্থাপনের শক্তি সঞ্চয় না করিলে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। সেই জন্য তিনি বলিলেন, চারিদিকের ঝড়-তুফান ও ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও মনের স্থিরতা লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "গীতায় যেমন আছে—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৫।৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৫।৯

—সেইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে ভিতরে প্রার্থনা এবং সাধন কেন চলিবে না, তাহা আমি বুঝি না।”

অনুবাদ:—যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ ও আত্মদর্শী পুরুষ, তিনি কখনই মনে করেন না যে নিজে কোন কার্য্য করিতেছেন। ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের স্বীয় স্বীয় ব্যাপারে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং তাহারাই কার্য্য করিতেছে, এইরূপ তাঁহাদের ধারণা। অতএব দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুরুন্মিলন বা নিমেষ—এই সমস্ত কার্য্য আত্মদর্শী পুরুষ বাহ্যতঃ করিতে থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে উহার একটীও তিনি করিতেছেন না, এইরূপ স্থির বুদ্ধিতে সর্ব্বদাই অবস্থান করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে—কর্ম্মের ভিতর দিয়াই উপাসনা, কর্ম্মের ভিতর দিয়াই আত্মশুদ্ধি, এবং কর্ম্মের ভিতর দিয়াই পরাশান্তি লাভ মহাত্মাজীর ধর্ম্মজীবনের আদর্শ। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, বাহিরে ‘পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে’র মত জোরে কর্ম্ম চালাইতে হইবে, কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িলে চলিবে না। প্রয়োজন মত কর্ম্মত্যাগ করিবার শক্তি-অর্জ্জনও চাই। কর্ম্মী ভিতরে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, অচঞ্চল, স্থির এবং শান্ত থাকিয়া কর্ম্মের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবেন। কর্ম্ম করিতে কর্ম্মী যদি চঞ্চল, অস্থির বা অশান্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত কর্ম্ম করা হইল না। কারণ, তখন কর্ম্ম আত্মোন্নতির সোপান না হইয়া বন্ধন ও দুঃখের হেতু হইয়া পড়ে। যাঁহারা এই গ্রন্থ প্রথম হইতে পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা নানা ঘটনার মধ্য দিয়া মহাত্মাজীর ধৈর্য্যগুণ এবং সকল প্রকার বিশৃঙ্খলার মধ্যেও মন সংযত করিবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছেন। পরে

তাঁহার সহিত অধিক ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া আমি তাঁহার ঐ শক্তির পরিচয় আরও ভালরূপ পাইয়াছি। আন্দোলনের সেই ঘনঘটার সময়ও তাঁহাকে প্রতি সপ্তাহে দুইখানি সাপ্তাহিক কাগজ ("নবজীবন" ও "ইয়াং ইণ্ডিয়া") সমগ্র অংশ নিজেকে লিখিয়া চালাইতে হইত। তদ্‌ব্যতীত সেই সময় দেশের চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রত্যহ কত টেলিগ্রাম, কত চিঠি-পত্র তাঁহার নিকট আসিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কখনও তাঁহাকে অস্থির বা ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই। সহস্র সহস্র লোকের গর্জ্জন, জয়ধ্বনি ও চীৎকারের মধ্যেও তিনি কেমন নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেন, তাহা না দেখিলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

স্বভাবের এই সমস্ত অসাধারণ লক্ষণ হইতে তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যে মুক্ত নহেন একথা পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন। একদিন আশ্রমে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমি যখন মুক্তির জন্য বসিব, তখন মুক্তি লইয়া তবে উঠিব।" তাঁহার যেরূপ একনিষ্ঠ, সংযম এবং শরীর ও মনের উপর আধিপত্য দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহার ঐ শক্তিতে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

অনেক সময় দেখা যায়, যাঁহারা বাহিরে একটু ত্যাগ-স্বীকার করেন, অথবা যাঁহারা বহির্ম্মুখী, ভোগপ্রবণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রামকে কঠোরভাবে নিগ্রহ ও শাসন করেন, তাঁহাদের ভিতর একপ্রকার অস্বাভাবিক তেজ, দম্ভ এবং অহঙ্কার আসিয়া যায়। পার্থিব ভোগ্য-বস্তু কিছু কিছু ত্যাগ করিতে পারিলেও, তাঁহারা ভিতরের

অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারেন না। মহাত্মাজীর ত্যাগ সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাঁহার ভিতর ও বাহির দুই দিকেই যত কিছু আকর্ষণের বস্তু আছে, তাহার অধিকাংশই তিনি ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। সেই জন্য এত ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, মান, যশ, সুখ্যাতি এবং অসংখ্য লোকের উপর আধিপত্য লাভ সত্ত্বেও তাঁহার অন্তরে কোনরূপ দম্ভ, অভিমান বা অহঙ্কারের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। ইহা তাঁহার হৃদয়ের কতদূর অনাবিলতা ও পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা যাঁহারা অর্থ, মান, যশ, ক্ষমতা ইত্যাদির মাদকতা হইতে অব্যাহতির জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহারাই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

মহাত্মাজীর ধর্ম্ম-জীবন

তাঁহার সমগ্র জীবনই এই প্রকার আত্ম-সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। শরীর এবং মনকে শাসন করিয়া তিনি তাহাদিগকে তাঁহার এত অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহা বলিবার নহে। আমি ইতিপূর্ব্বে দুইবার তাঁহাকে পাঁচ দিন করিয়া দীর্ঘ উপবাস গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হইলেও তাঁহার মন কখনও অবসন্ন হয় নাই। উপবাসের প্রথম দুই দিন শরীরে কিছু যন্ত্রণা বোধ হইত; কিন্তু তৃতীয় দিবস হইতে তিনি অন্তরে ও বাহিরে এক অপূর্ব্ব ও অখণ্ড শান্তি অনুভব করিতেন, ইহা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। উপবাসের সময়েও তাঁহার নিয়মিত লেখাপড়ার কাজ অথবা অন্যান্য কর্ত্তব্য, কিছুরই বিরাম ছিল না। তাঁহার বিবাহিত জীবন হইলেও তিনি যৌবনাবস্থা হইতেই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন, * এবং জিহ্বা সংযম করিয়া কেবল শরীরের জন্য যেরূপ বা যতটুকু আহার প্রয়োজন, তাহাই গ্রহণ করেন। আমি সাত মাস কাল ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে এক নিয়মে প্রাতে, দ্বিপ্রহরে

---

* মহাত্মাজী প্রণীত "Guide to Health" (ইংরাজি অনুবাদ) পৃঃ ৭৯ দ্রষ্টব্য।

এবং সন্ধ্যায় প্রতিবারে অর্দ্ধ সের পরিমাণ ছাগদুগ্ধ, তিন টুক্‌রা পাঁউরুটির টোষ্ট, অথবা সমপরিমাণ আটার 'ভাকৃরি' + এবং বিশটী মনাক্কা বা তৎপরিবর্ত্তে আঙ্গুর এবং দুইটী করিয়া কমলা লেবু, এই মাত্র আহার গ্রহণ করিয়া দিনাতিপাত করিতে দেখিয়াছি।

বর্ত্তমান আন্দোলনের পূর্ব্বে তিনি প্রতিদিন প্রাতে দুই ঘণ্টা কাল গম পিষিয়া নিজ হাতে আটা প্রস্তুত করিতেন, ইহা শুনিয়াছি। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইলেও কেবল মনের বলে তিনি এতটা শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন। কিছুদিন পূর্ব্ব অবধি তিনি ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীতে চলাফেরা করিতেন। তাহাতে অনেক সময় তাঁহাকে নানারূপ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। কখনও বা কেহ তাঁহাকে আহির বা গোয়ালা ভাবিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে; কখনও বা জাঠ কিম্বা সামান্য কৃষক জ্ঞানে বলিষ্ঠ লোকেরা তাঁহার বসিবার স্থান জোর করিয়া দখল করিয়া লইয়াছে; তথাপি তিনি আত্ম-পরিচয় দেন নাই।

একদিন জনৈক আশ্রমবাসী আমাকে কথায় কথায় বলিলেন,—"আপনারা এখন খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে বাপুজীর সহিত চলাফেরা করেন; পূর্ব্বে তিনি নিজের মোট নিজেই মাথায় করিয়া বহন করিতেন, এবং ষ্টেশন হইতে গন্তব্যস্থান যত দূরেই হউক, গাড়িঘোড়ায় না চড়িয়া সমস্ত পথ পায়ে হাঁটিয়া যাইতেন।" এখন ঐরূপ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহাকে

+ 'ভাকৃরি' এক প্রকার গুজরাটী রুটি।

দেশের কাজে ব্যয় করিতে হয়; তদুপরি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা এবং বর্ত্তমান অবস্থা দুই তাঁহার নিকট তুল্য। বরং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে শুনিবেন যে, পূর্ব্বে তিনি বড় সুখে চলাফেরা করিতেন, আর আজ কাল সর্ব্বদা ট্রেণের সেকেণ্ড্ ক্লাশ্ ও মোটর ইত্যাদির চাপে পড়িয়া তিনি অত্যন্ত ক্লেশে আছেন।

ইহা তিনি কপট দৈন্য অথবা পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি মৌখিক বিতৃষ্ণা প্রদর্শনের জন্য বলিবেন না। যাহা তিনি সত্য ভাবে প্রাণে উপলব্ধি করিবেন না এমন কথা কখনও মহাত্মাজীর মুখে বাহির হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। তাঁহার সহিত সাত মাস প্রায় অবিচ্ছেদে সঙ্গ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে বোধ হয় স্বপ্নেও কোনরূপ অসত্য ভাব বা চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় না। কিন্তু যাহাতে শরীরের আরাম হয় এবং যাহা সুখদায়ক বলিয়া সাধারণতঃ লোকে মনে করে, তাহাতে তিনি ক্লেশ অনুভব করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি দেখাইব যে সাধারণ লোক হইতে মহাত্মাজীর কার্য্য ও আচার-ব্যবহার কত পৃথক্, কত স্বতন্ত্র।

আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই দেখি যে, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও তিনি সকল কর্ত্তৃত্ব অপরের হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে একজন অতিথির ন্যায় তথায় বাস করিতেছেন। আশ্রম-সম্বন্ধীয় কোন প্রার্থনা লইয়া তাঁহার নিকট কেহ

উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিয়া দিতেন যে তিনি সেখানকার একজন অতিথি; কোন প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি নিজের জন্য কিছু বিষয়-সম্পত্তি রাখেন নাই। আশ্রমের ব্যয় তাঁহার বন্ধুবর্গ বহন করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত পুস্তকাদি যাহা বাজারে বিক্রয় হইতেছে তাহারও স্বত্বাধিকারিত্ব তিনি নিজে রাখেন নাই, এবং সেই কারণ বিনিময়ে তিনি কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই ও করেন না। কংগ্রেসের কাজে তাঁহাকে দেশময় পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে, অথচ ঐ নিমিত্ত এক কপর্দ্দকও তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডার হইতে কখনও তিনি গ্রহণ করেন নাই। অর্থ সম্বন্ধে তাঁহাকে এক প্রকার উদাসীন দেখিতাম। তিনি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রত্যহ দলে দলে দর্শনার্থী লোকেরা আসিয়া ফুল-ফলের সহিত সিকি, দু-আনি, আধুলি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ টাকা, দশ টাকা এবং সময়ে সময়ে অনেক অধিক অর্থ দিয়া তাঁহার যে পূজা করিত, তাহাতে আশ্রমে প্রতিদিন বহু অর্থের আমদানী হইত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কার্য্যের ব্যাঘাত হয় দেখিয়া কিছুদিন পরেই তিনি দর্শনার্থীদের এইরূপ পূজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

তিনি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া বাস করিলেও সাংসারিক লোকের ন্যায় তিনি কখনও তাহাদের ঐহিক সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই। কিন্তু যাহাতে তাহাদিগের কল্যাণ ও মঙ্গল হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা তাঁহার দৃষ্টি ছিল। পরিবারবর্গ এবং অপর বাহিরের লোকের সহিত ব্যবহারে তাঁহার কখনও কোন ইতর-

বিশেষ দেখি নাই। বরং কখনও কখনও মনে হইয়াছে যে, পরিবারবর্গ অপেক্ষা তাঁহার অন্য সেবক ও অনুগত জনের প্রতি তিনি অধিক আত্মীয়তা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার দৃষ্টি ও ব্যবহারের এই প্রকার সমতার জন্য তিনি সকলেরই "বাপু" (পিতা)। গুজরাতে "বাপুজী" নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্রগণ যে অধিকারের দাবী করিয়া তাঁহাকে "বাপুজী" বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহার উপর সেই অধিকার জগতের সকলেরই আছে, ইহা তাঁহার সহিত দুই দিন বাস করিলেই প্রতীত হয়। সেই জন্য দেখিয়াছি বহু লোক তাঁহার সহিত প্রথমে সমকক্ষভাবে মিশিতে চেষ্টা করিয়াও শেষে অল্প কালেই তাঁহাকে "বাপুজী" বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিতেন।

সাধারণতঃ দেখা যায়, লোকে প্রশংসায় তুষ্ট এবং নিন্দায় বিরক্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু মহাত্মাজীর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব দেখিয়াছি। কখনও কোন স্তাবক তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। মান্দ্রাজ হইতে এক ব্যক্তি "Gospel of Gandhi" (গস্‌পেল্ অব্ গান্ধী) অর্থাৎ গান্ধী প্রস্তাবিত শাস্ত্র নামে একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তকের শিরোনামায় ঐ 'Gospel' 'গস্‌পেল্' শব্দ পড়িয়া তিনি এত ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন যে বলিবার নহে। ইহাতে ধর্ম্মের প্রতি অপমান করা হইল বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে একবার তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রশংসাসূচক একটি প্রবন্ধ এক বিলাতী কাগজ হইতে পুনর্মুদ্রিত করা হইলে, তিনি অত্যন্ত

ক্লেশ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশের মধ্যে কেহ মান্য, গণ্য এবং প্রধান হইলে সচরাচর দেখা যায় যে একদল লোক তাঁহার প্রশংসা এবং একদল লোক নিন্দা করিয়া থাকে। মহাত্মাজীর নিকটও ঐরূপ নিন্দা ও প্রশংসাসূচক বহু পত্র প্রতিদিন আসিত। আমি কখনও কখনও প্রশংসাসূচক দুই একখানা পত্র তাঁহাকে শুনাইয়া দেখিয়াছি, প্রশংসা শুনিলে তিনি যেন বিষণ্ণ এবং ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেন। আর নিন্দা বা সমালোচনা শুনিলে, তাহাতে কতটুকু সত্য আছে তাহা বুঝিবার জন্য প্রত্যেক কথা কাণ পাতিয়া শুনিতেন। বম্বের দাঙ্গার সময় বহু পার্শী স্ত্রী-পুরুষ তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়া অনেক পত্র দিয়াছিল; সেই সমুদয় পত্র তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ বিকার দেখি নাই। এরূপ গালাগালি শুনিয়া সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকা সাধারণ মনুষ্যের ক্ষমতার অতীত বলিয়া আমার তখন মনে হইয়াছিল।

তাঁহার নিকট বিরুদ্ধবাদিগণ যেরূপ খাতির, যত্ন, সম্মান এবং সহৃদয়তা পাইয়া থাকেন, তাঁহার অনুগত জন বা ভক্তেরাও অনেক সময় সেরূপ পাইতেন না। কারণ, তাঁহার প্রশংসা বা গুণগান করিলে কেবল উপেক্ষা বা উদাসীনতা ব্যতীত অধিক কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই। অনুগত জনের প্রতিও মহাত্মাজীর মঙ্গলদৃষ্টি সর্ব্বদা বর্ষিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তুলনায় প্রতিপক্ষের প্রতিই তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা অধিকতর প্রবল—ঘটনা-পরম্পরা হইতে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে।

সংসারে কেহ লাঞ্ছিত অথবা উপদ্রুত হইলে মহাত্মাজীর নিকট যেরূপ সহানুভূতি পাইবে, এরূপ আর কোথায়ও নহে। যাঁহার প্রতি সকলে বিরক্ত, মহাত্মাজী তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। এক সময়ে কোন কারণে এক ব্যক্তির প্রতি আশ্রমের অনেকে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা করিতে লাগিল। মহাত্মাজীও তাঁহার অনেক কার্য্য অনুমোদন করিতেন না; তথাপি যে দিন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, লোকে সেই ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিতেছে, সেইদিন হইতে প্রত্যহ কিছু সময় শত কাজ অবহেলা করিয়া তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ইহাতে অপর সকলেও তাঁহাকে পুনরায় সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। কেহ কোনরূপ অন্যায় বা অসত্য আচরণ করিলে মহাত্মাজী প্রথমে কোথায় নিজের দোষ বা ত্রুটি হইয়াছে তাহাই বিচার করিতে বসিতেন। কারণ, তিনি বলিতেন যে, নিজের ভিতরই দুষ্ট বা অসত্য ভাব লুক্কায়িত না থাকিলে অপরে ঐরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। তাঁহার জীবন এতই স্বচ্ছ, শুভ্র ও পবিত্র যে, তাঁহার পক্ষে লোকের নিকট গোপন করিবার কিছুই নাই, ইহা আমি নানা প্রকারে উপলব্ধি করিয়াছি।

অষ্টম অধ্যায়

মহাত্মাজীর সাধনা

চরিত্রের এইরূপ পবিত্রতা ও স্বাভাবিক সরলতা মহাত্মাজী কিরূপে অর্জ্জন করিলেন,—কি সাধনার দ্বারা তিনি চিত্তের ময়লা দূর করিতে সমর্থ হইলেন, ইহা জানিতে ধর্ম্মার্থী অনেকেরই কৌতূহল হইবে; কিন্তু সাত মাস দিবারাত্রি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও তাঁহার জীবন ও সাধনা বাহির হইতে যতদূর দেখা যায়, তদতিরিক্ত আমার জ্ঞান নাই। কারণ, ধর্ম্ম-সাধনার কথা মহাত্মাজী বিশেষ আলোচনা করিতেন না। তাঁহার জীবনের ঐ দিক্ যথাসম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতেই তিনি অধিকতর প্রয়াসী ছিলেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। সত্যের প্রতি তাঁহার অকপট নিষ্ঠা, এবং সত্যের জন্য জগতের সমস্তই বিসর্জ্জন করিবার শক্তি তাঁহার আছে, ইহা দেখিয়াছি। ইহা হইতে আমার মনে হয়, কেবল সত্যের জ্যোতিতে মহাত্মাজীর অন্তর স্বাভাবিক নিয়মে পরিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের সংস্কার তাঁহার অস্থিমজ্জায় রহিয়াছে। তদতিরিক্ত বাল্যে ও যৌবনে গুজরাতের জৈন সাধুদিগের প্রভাব তাঁহার উপর অল্পাধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়াছিল। বিলাতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে

তিনি অনেক খ্রীষ্টান ভক্তের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, এবং বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে বাইবেল হইতে যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানেরও সঙ্গ করিয়াছেন। তিনি সকল ধর্ম্ম হইতেই সার সত্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ বলিয়া ধর্ম্ম লইয়া তাহার কোনরূপ দলাদলি নাই। আজ কাল তিনি সর্ব্বদা একখানা গীতা সঙ্গে রাখেন, এবং গীতা ধ্যান, গীতাজ্ঞান ও গীতাই তাঁহার কণ্ঠের ভূষণ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার হইলেও তাঁহার নিজের আচার-পদ্ধতি ও উচ্ছিষ্ট-বিচার অনেকাংশে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর ন্যায় দেখা যায়।

গীতার সঙ্গে ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের একটি মালা মহাত্মাজী তাঁহার ঝোলার মধ্যে রাখিতেন। কিন্তু আমি কখনও তাঁহাকে উহা ব্যবহার করিতে দেখি নাই। কেবল দুই দিন অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ সঙ্কট সময়ে প্রাতে বিছানা তুলিতে যাইয়া তাঁহার বালিশের নিকট মালাটী পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। ইহা হইতে আমার মনে হইয়াছিল যে রাত্রিতে তিনি উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে যখন কলিকাতাতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন ঐ মালা মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইয়া মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে তিনি উহা জপ করেন; কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐরূপ জপ অপেক্ষা চরকা চালনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-স্মরণ করিলে তিনি অধিক ফললাভ

করেন। সেই জন্য মহাত্মাজী বিশ্বাস করেন যে যজ্ঞ হিসাবে চরকা ব্যবহার করিলে লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই ভগবন্মুখী হইবে। তিনি "Young India"র একস্থানে এই কথা আভাসে লিখিয়াছেন—"**And I verily believe that when millions take to the *Charka* as a sacrament it will turn our faces Godward**" (Y. I. Sept. 22, 1921 "Wanted Experts.") মহাত্মাজীর জপের প্রণালী আমি জানি না, তবে তাঁহাকে একাগ্রভাবে বসিয়া চরকা চালাইতে বহুবার দেখিয়াছি। তাহাতে অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে যে তিনি অজপা সাধন করেন; কিন্তু ঐরূপ সাধনপ্রণালী কোথায়, কি ভাবে তিনি লাভ করিলেন, তাহা কিছুই আমি বলিতে পারি না।

মহাত্মাজীর ধর্ম্মজীবন আমি যাহা দেখিয়াছি এবং যতটুকু বুঝিয়াছি তাহা বর্ণনা করিলাম। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নানা জনে নানা দিক্ হইতে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহার ভিতরের চিন্তা এবং বাহিরের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্য দিয়া যে পবিত্র ধর্ম্মভাব স্বতঃই প্রবাহিত হইতেছে, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলে সমগ্রভাবে তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ সম্ভব নহে। গুজ-রাতের প্রসিদ্ধ ভক্ত-কবি নরসৈয়া রচিত একটি স্তোত্র মহাত্মাজী বড় ভাল বাসিতেন। আশ্রমের প্রার্থনার সময় এই স্তোত্র

তাঁহাকে প্রায়ই শোনান হইত, এবং বন্দীভাবে যখন তিনি আশ্রম হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, তখনও উপস্থিত সকলকে উহা গান করিতে বলিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর চিত্ত যেন ঐ স্তোত্রের অক্ষরে অক্ষরে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার মনের গঠন ও জীবনের আদর্শ উহা দ্বারা পরিস্ফুট হইতেছে বলিয়া গানটীর মূল এবং অনুবাদ এইস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

রাগ—খাম্বাজ, ধুলালী।

বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিরে,
জে পীর পরাই জানেরে।
পর দুঃখে উপকার করে তোত্র,
মন অভিমান ন আনেরে॥ ১

সকল লোকমাঁ সহুনে বন্দে,
নিন্দা না করে কেনিরে।
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে,
ধন ধন জননী তেনি রে॥ ২

সম দৃষ্টনে তৃষ্ণা ত্যাগী,
পর-স্ত্রী জেনে মাত রে।
জিহ্বা থকি অসত্য ন বোলে,
পরধন নব ঝালে হাত রে॥ ৩

মোহ মায়া ব্যোপ নহি জেনে,
দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মনমারে।

রাম নাম [illegible],
সকল তীরথ তেনা তনমাঁ রে ॥ ৪
বন লোভী নে কপট রহিত ছে,
কাম ক্রোধ নিবার্য্যা রে।
ভনে নরসৈঁয়া তেনু দরশন কর্ত্তা,
কুল একোত্তর তর্য্যা রে ॥ ৫

অনুবাদ

"বৈষ্ণব ত তাঁহাকেই বলি যিনি অপরের ক্লেশ বুঝিতে পারেন, এবং পরদুঃখে উপকার করিয়া মনে অভিমান আনেন না ॥ ১

যিনি সকলকে মর্য্যাদা দেন, কাহারও নিন্দা করেন না এবং বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়সকল বশে রাখিতে পারেন, সেই ব্যক্তির জননী ধন্য, ধন্য ॥ ২

যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রক্ষা করেন, যাঁহার অসত্য বলিতে জিহ্বা অবসন্ন হইয়া যায় এবং পরধনের প্রতি যাঁহার লোভ নাই, যাঁহার উপর মায়ার আধিপত্য নাই এবং মনে দৃঢ় বৈরাগ্য রহিয়াছে, সর্ব্বদা যিনি রামনাম জপে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহার শরীরে সমস্ত তীর্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩-৪

যিনি লোভ, কপটতা, কাম এবং ক্রোধ জয় করিয়াছেন, নরসৈয়া বলে সেই ব্যক্তির দর্শনে কুলের একাত্তর পুরুষ অবধি উদ্ধার হইয়া যায়" ॥ ৫

নরসৈয়া রচিত এই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতে রামনামের প্রশংসা আছে। মহাত্মাজীকেও একদিন পথশ্রম ও উপবাসের নিমিত্ত শরীরের অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় "শ্রীরাম, শ্রীরাম" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে দেখিয়াছিলাম *। তদ্ব্যতীত তিনি যেরূপ ভক্তিভাবে তুলসীদাস প্রণীত রামায়ণের প্রশংসা করিতেন এবং রামলীলা-সম্বন্ধীয় সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন, তাহা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে তিনি রামনাম অবলম্বন করিয়া ভগবদুপাসনা করিয়া থাকেন।

---

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নবম অধ্যায়

মহাত্মাজীর পরিবার

আশ্রমের সকলে মহাত্মাজীকে যেমন "বাপুজী" বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহার পত্নীকে সেইরূপ "বা" বলিয়া সম্বোধন করা হয়। গুজরাতি "বা" শব্দের অর্থ "মা"। মহাত্মাজীর পত্নী হইয়া 'বা'কে সর্ব্বদা কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া জীবন যাপন করিতে হয়। তাঁহার স্বামী বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত হইতেছেন এবং দেশে সম্রাটের ন্যায় সম্মান লাভ করিতেছেন। তাহাতে 'বা'-কে তেত্রিশ কোটি সন্তানের মাতৃত্বের দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। স্বামীর যশের ও গৌরবের অংশভাগিনী হইলেও সংসারের সুখ-সম্পদ্ 'বা'র কিছুই নাই। স্বামীর ত্যাগ এবং সেবা-ধর্ম্ম নিজেও গ্রহণ করিয়া যে ভাবে তিনি দেশের ও দশের সেবাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের সতী রমণীকুলে তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি কখনও মহাত্মাজীর ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় হ'ন নাই এবং যখন যে ভাবে প্রয়োজন হইয়াছে, কায়মনোবাক্যে তিনি স্বামীর কর্ম্মের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন।

মহাত্মাজীর সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-দৃষ্টি অনুসারে কার্য্য করিয়া 'বা'কে সর্ব্বদা

স্বামীর সন্তোষ-বিধান করিতে হয়। একদিন একজন আশ্রম-বাসী অসুস্থ ছিলেন, অথচ 'বা' তাহা জানিতেন না, তাহাতে প্রার্থনার সময় সকলের সমক্ষে মহাত্মাজী তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন—"দেবদাসের অসুখ হইলে তোমার জানিতে বাকি থাকিত না; কিন্তু অপরের অসুখের সংবাদ রাখ না, ইহা কিরূপ?" অপর একদিন তাঁহার সম্বন্ধে মহাত্মাজী আমাকে বলিয়াছিলেন—"বা'কে আমি প্রথম হইতেই এমন শিক্ষা দিয়াছি যে পায়খানা পরিষ্কার করা হইতে আরম্ভ করিয়া কোন কাজ করিতে তিনি পরাঙ্মুখী নহেন। তবে খাটিতে খাটিতে যখন আর শরীরে কুলাইয়া উঠে না, তখন 'বেচারি' কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ না করিয়া কেবল কাঁদিতে থাকে।"

আশ্রমে মহাত্মাজীর পাকশালার নাম "বড় পাকশাল"। মহাত্মাজী আশ্রমে থাকিলে "বড় পাকশালে" প্রত্যহ অনেক অতিথি উপস্থিত থাকিতেন। পরিচিত কেহ দেখা করিতে আসিলেই মহাত্মাজী তাঁহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। এই সকল লোকের জন্য রন্ধন 'বা'কে দুই বেলা স্বহস্তে করিতে হইত। তাহাতে তাঁহার এত অধিক পরিশ্রম হইত যে শরীর শুকাইয়া যেন কাঠ হইয়া যাইত। তাহার পর যখন মহাত্মাজী কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেন, তখন একটু বিশ্রাম পাইয়া 'বা'র শরীর আবার তাজা হইয়া উঠিত, ইহা বহুবার আমি লক্ষ্য করিয়াছি। স্বামীর বৈরাগ্য এবং বিষয়-বিতৃষ্ণার অংশ এই ভাবে দৈনন্দিন জীবন এবং কর্ম্মের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়া

তিনি ভারতের স্ত্রী-জাতির সম্মুখে পতি-সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।

মহাত্মাজীর চারি পুত্রের মধ্যে আশ্রমে এই সময় কেবল তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাজে অবস্থান-কালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহাত্মাজী এক ব্যক্তিকে বলিয়া-ছিলেন যে, আশ্রমে পৌছিলে দেবদাস ও আমি তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কাজকর্ম্মের সাহায্য করিব। সেইজন্য তিনি প্রভু-দাসকে ওয়ার্ধা ও যমুনাদাসজীকে রাজকোটে অন্য কাজের ভার দিয়া পাঠাইয়াছেন। ইঁহাদের সহিত আমার পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল। এখন আবার নূতন করিয়া দেবদাসের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে হইবে, এইজন্য আমাকে চিন্তিত দেখিয়া প্রভুদাস বলিয়া দিল যে দেবদাসের স্বভাব এমনই কোমল এবং সেবা-পরায়ণ যে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইতে অধিক সময় লাগিবে না।

দেবদাসকে প্রথম আমেদাবাদ ষ্টেশনে দেখিলাম—নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতেছেন, আর মালপত্র মোটর লরিতে বোঝাই করিতেছেন। তাহার পর আশ্রমে আসিবার সময় লরিতে বসিয়া জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কোন বক্তৃতাকে তিনি "rigmarole, rigmarole" অর্থাৎ অসার বাক্যসমষ্টি বলিয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুবজনোচিত সুস্থদেহের স্ফূর্ত্তি, বুদ্ধির প্রখরতা এবং বাক্‌চাতুর্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। জন্মাবধি

মহাত্মাজীর ক্রোড়ে লালিত-পালিত এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দেবদাস পিতার অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার যেরূপ সেবাপরায়ণতা, নির্ভীকতা এবং সর্ব্বদাই প্রশান্ত ও প্রফুল্লভাব দেখিয়াছি, এরূপ অল্পই দেখা যায়। মহাত্মাজী নিজে একবার বলিয়াছিলেন—"দেবদাসের ভিতর ভয়ের লেশ-মাত্র নাই। যেখানে প্রবেশ করিতে অপর লোক বহুবার ইতস্ততঃ করিবে, দেবদাস নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া সেখানে প্রবেশ করিবে।" আশ্রমের সমস্ত আদর্শগুলি মহাত্মাজী ধীরে ধীরে দেবদাসের অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরিত্রের মধ্যে ফুটাইতে চেষ্টা করিতেছেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির পরিপক্কতা লাভ হইলে, দেবদাস মহাত্মাজীর এক বিশেষ যন্ত্ররূপে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা অল্পদিনের পরিচয়েই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

মহাত্মাজীর আত্মজ না হইয়াও অপর যে কয়জন দেশভক্ত যুবক আত্মজের ন্যায় সেই সময় তাঁহার বড় পাকশালের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনা এখন করিতেছি। দেবদাস যেমন কথাবার্ত্তায় সুচতুর এবং লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া তাঁহা-দিগের চিত্ত হরণ করিতে সুদক্ষ, নির্ব্বাক্‌কর্ম্মী ছোটলালজী ঠিক তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত। অনেক সময় প্রশ্ন করিয়াও ছোট-লালজীর নিকট হইতে উত্তর পাওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। তিনি সর্ব্বদা যেরূপ নীরবে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার আশ্রমে অবস্থিতি সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত

হইতে পারে। অথচ যেমন শরীরের প্রাণবায়ু শরীরকে জীবিত রাখে, সেইরূপ তিনি আশ্রমের কার্য্যকলাপ ও নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি অহরহঃ দৃষ্টি রাখিয়া আশ্রমের বিশিষ্টতা ও জীবন-রক্ষা করিতেছেন। মহাত্মাজী বলিতেন—"ছোটলাল ত একজন সিপাহী।" বস্তুতঃ নিজের কর্ত্তব্য ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে ছোটলালজী এরূপ উদাসীন থাকিতেন যে, যদি একদিকে জগৎ ধ্বসিয়া ধ্বংসপ্রাপ্তও হইয়া যায়, তথাপি ছোটলালজী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য স্বস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত থাকিবেন। ছোটলালজীর এই গুণ আবার সুরেন্দ্রজীতে নাই। তিনি আদর, আত্মীয়তা ও ভদ্রতার মূর্ত্তিস্বরূপ। সর্ব্বদাই তাঁহার প্রফুল্লবদন এবং সর্ব্বদাই তিনি আত্মীয়জনের সেবা করিতে প্রস্তুত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জ্জনের প্রতি তাঁহার এমন অসম্বরণীয় লোভ, যে কোন অবস্থাতেই তিনি তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। সেইজন্য সুরেন্দ্রজীর প্রশ্নের বিরাম নাই, এবং কঠোর ও একাগ্রভাবে কর্ত্তব্যকার্য্যে নিবিষ্ট থাকা তাঁহার পক্ষে সময় সময় কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আলাপ-পরিচয় এবং আত্মীয়তা করিতে সুদক্ষ বলিয়া তিনি অল্পবয়সেই মাতৃভাষা হিন্দী ব্যতীত উর্দ্দু, মারাঠি, গুজরাতি প্রভৃতি ভাষায় জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন।

তৃতীয় যুবক প্যারীলালজীকে বাহির হইতে ছোটলালজীর ন্যায় গম্ভীর এবং নীরব বলিয়াই বোধ হয়; অথচ কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত দিতে

পারিলে তাঁহার হৃদয়ের উৎস খুলিয়া দেওয়া যায়। ইনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী উচ্চশিক্ষিত যুবক। একজন 'scholar' বা পণ্ডিত বলিয়া লোকের নিকট মহাত্মাজী ইঁহার পরিচয় দিতেন, এবং তাঁহার কোন লেখা বা উক্তি হইতে কোন বিষয় উদ্ধার করিতে হইলে প্যারীলালজীকেই তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন। মহাত্মাজী বলিতেন—"আমার যাহা কিছু ছাপা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে প্যারীলাল এক "Encyclopædia" অর্থাৎ বিশ্বকোষ।

মহাত্মাজীর এই সকল 'মানসপুত্র'দিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ বালকৃষ্ণ বা 'বাকোবা' একজন artist (শিল্পী) এবং অনুক্ষণ সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার রসানুভূতিতে মগ্ন থাকিতেই সমধিক সমুৎসুক। তাঁহার মধুর এবং কোমল কণ্ঠ সকলকেই মোহিত করে। তাঁহাকে দেখিলে পূর্ব্বতন ব্রহ্মচারী ঋষিবালকদিগের কথা স্মরণ হয়। প্রকৃত শিল্পীর ন্যায় তাঁহার স্বভাব এখনও বালকের ন্যায় সরল এবং যুবজনোচিত চরিত্রগত কোন বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

স্ত্রী-পুত্র পরিজন সকলের সহিত কর্ত্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও পরিবারের মধ্যে মহাত্মাজীর পঞ্চম-বর্ষীয়া পৌত্রী মনু এবং পালিতা কন্যা লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার যে প্রকার প্রণয় এবং অন্তরের সংযোগ দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও সহিত নহে। মহাত্মাজীর গাম্ভীর্য্য দেখিয়া এক এক সময়ে তাঁহাকে পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চল ও শান্ত বলিয়া মনে হইত; কিন্তু সেই অবস্থাতেই মনু ও লক্ষ্মী আসিয়া তাঁহার সেই ঘনীভূত ভাব তরল করিয়া দিতে সক্ষম হইত।

লক্ষ্মীর কাহিনী দেশের অস্পৃশ্যতা-সমস্যার সহিত যুক্ত বলিয়া ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। লক্ষ্মীর নিজ পিতা-মাতা উভয়েই আছেন। তথাপি মহাত্মাজী উহাকে কন্যারূপে প্রতিপালন করিতেছেন। অন্ত্যজ-জাতীয়া লক্ষ্মীর আগমনে মহাত্মাজীর পরিবারে একটি ক্ষুদ্র বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল ; কিন্তু মহাত্মাজী লক্ষ্মীর জন্য আত্মীয়-পরিবার সকলকেই বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। লক্ষ্মী ভারতের অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ-জাতি-সমূহের প্রতিনিধিরূপে মহাত্মাজীর সম্মুখে বর্ত্তমান। মহাত্মাজী ইহাকে যে চক্ষুতে দেখেন এবং ইহার প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা তিনি অন্ত্যজ-জাতি-সমূহের প্রতি তাঁহার সহৃদয়তা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ বলিলে মহাত্মাজী কি অর্থ প্রকাশ করিতে চাহেন, ইহা লইয়া দেশে নানারূপ মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন, মহাত্মাজী ইহা দ্বারা জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন ; আবার কেহ-বা ইহা কেবল তাঁহার একটি রাজনৈতিক চাতুরী ব্যতীত আর কিছু নহে এইরূপ বিশ্বাস করেন। যে সকল সমাজ-সংস্কারকগণ পূর্ব্ব হইতে জাতিভেদের উচ্ছেদ-সাধন করিতে প্রয়াসী ছিলেন, তাঁহারা মনে করেন যে মহাত্মাজীও ঐ উদ্দেশ্যেই অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস মহাত্মাজীর মতে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের সহিত আহার-বিহার বা বিবাহ-প্রথা পরিবর্ত্তনের কোন সম্বন্ধ নাই। টিনাভেলি অবস্থান কালে জনৈক অন্ত্যজ-জাতীয় নেতার সহিত

আলোচনা-প্রসঙ্গে মহাত্মাজী ঐ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পর আশ্রমে আসিয়া তিনি রাজগোপালাচারীজীর প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আমি লিখিয়াছি। অস্পৃশ্যতা-নিবারণকল্পে আর্য্যসমাজের পোষকতায় দিল্লীতে "দলিতোদ্ধার সমিতি"র উদ্‌যোগে এক আন্তর্জাতিক প্রীতিভোজ হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া সনাতনী হিন্দুগণ মহাত্মাজীকে বহু পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন, সেইজন্য বিষয়টি তাঁহার নিকটে একদিন উপস্থিত করিয়াছিলাম, তখন আক্ষেপ করিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—"লোকে যদি এভাবে আমার কথার বিকৃত অর্থ করিতে থাকে, তাহা হইলে আমি কি করি?" ইহার পর আমেদাবাদ কংগ্রেসের সময়ও এক আন্তর্জাতিক প্রীতিভোজ হইয়াছিল। দেশের নানাস্থান হইতে তৎসম্বন্ধে হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধিবর্গের পত্রাদি আসিতে আরম্ভ হইলে আমি মহাত্মাজীকে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি তাহাতে বলিলেন যে, তাঁহার অভিমত লইয়া ঐ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং তিনি নিজে উহাতে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও বলিলেন যে ঐ ভোজে পুরি, কচুড়ী ইত্যাদি পাকা জিনিস ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা গুজরাতের প্রথা অনুসারে 'সকৃড়ি' নহে।

মহাত্মাজীর আশ্রমে আহারাদি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দেখিয়াছি, তাহা কোন কোন অংশে বিশুদ্ধ হিন্দু-আচার-পদ্ধতির অনুকূল নহে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু উহা কি পরিমাণে গুজরাতের

দেশাচারের অনুবর্ত্তী, এবং কি পরিমাণে দেশাচারের বিপরীত, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সকলের পক্ষেই স্বপাকের ব্যবস্থা মহাত্মাজী প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আশ্রম হইতে অন্যত্র যাইলে আশ্রমবাসীদিগকে স্বপাকে আহার করিতে বলিতেন। আশ্রমে অবস্থানকালে সকলকে এক আদর্শ এবং এক নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়, সেইজন্য ঐ নিয়ম পালিত না হইলেও ক্ষতি নাই, এইরূপ তিনি মনে করিতেন। নিজের আহার সম্বন্ধে তিনি উচ্ছিষ্ট বিচার করিয়া চলিতেন তাহা দেখিয়াছি। হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে আত্মশুদ্ধির জন্য আহার-শুদ্ধির আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু আত্ম-শুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল আভিজাত্যের অভিমান বা জাতি-বিদ্বেষ পোষণ-কল্পে আহার লইয়া আচার-বিচার করিলে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় হয়, ইহাই তাঁহার অভিমত। অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের চেষ্টা দ্বারা তিনি এই জাতি-বিদ্বেষ বা আভিজাত্যের অভিমান নষ্ট করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু তৎসঙ্গে সমাজে যদি সংযমের আদর্শ শ্লথ হইয়া যায়, তাহা হইলে মহাত্মাজী যত দুঃখ ভোগ করিবেন সেরূপ বোধ হয় অপর কেহ করিবেন না। জাতিগত সংযমের আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তিনি কখনও জাতিভেদ প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হেন, এবং সেই কারণেই তিনি সামাজিক ভাবে আন্তর্জাতিক ভোজ এবং আন্তর্জাতিক বিবাহ-প্রথা অনুমোদন করেন না।

দশম অধ্যায়

আশ্রমে প্রথম তিন দিন

প্রায় দুই মাস কাল অধিকাংশ সময় মহাত্মাজীর সঙ্গে ট্রেণে যাপন এবং অবশিষ্ট সময় লোকাকীর্ণ বড় বড় নগরে বাস করিয়া হৃদয় যেন কুঞ্চিত ও আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহা আশ্রমে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী উন্মুক্ত প্রান্তর, তাহাতে সহরের আবর্জ্জনাশূন্য, মৃদুমন্দ পবিত্র বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া প্রাণ আবার সরস ও সতেজ হইয়া উঠিল। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিলে যেরূপ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ে, আমারও অবস্থা কিয়ৎ-পরিমাণে তাহাই হইল। আশ্রমে পদার্পণ করিতেই প্রিয় সুহৃৎ সুরেন্দ্রজী আদর করিয়া তাঁহার কক্ষে আমাকে লইয়া গেলেন এবং তদবধি তিনিই আমার আশ্রমে অবস্থানকালে অভিভাবকস্বরূপ হইলেন। তাঁহার নিকট আশ্রমের কোথায় কি দেখিবার আছে জানিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার সময় একবার মহাত্মাজীর সম্মুখে পড়িয়াছিলাম। তিনি তখন স্নানাগার হইতে বাস-গৃহে যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি আশ্রম কেমন লাগিতেছে, হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম

"জাগা বহুৎ আচ্ছা হ্যায়"। তাহাতে প্রফুল্ল হইয়া "বহুৎ" শব্দের উপর জোর দিয়া, তিনিও বলিয়া উঠিলেন, "বহুৎ আচ্ছি হ্যায়" এবং সহাস্যবদনে চলিয়া গেলেন। আমি "আচ্ছি"-কে "আচ্ছা" বলিয়া হিন্দী ব্যাকরণ দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার ঐ আবৃত্তি হইতে বুঝিতে পারিলাম।

প্রথম দিন, (৬ই অক্টোবারের) সান্ধ্য-প্রার্থনা কিছু আড়ম্বরের সহিত হইল। আশ্রমের লোকজন ব্যতীত আমেদাবাদ সহর হইতেও বহুলোক এই প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে আশ্রমে সেই দিন কে কি পরিমাণ সূতা কাটিয়াছিল এবং কতটা বয়ন-কার্য্য করিয়াছিল, তাহার হিসাব পাঠ হইল; মহাত্মাজী খুব মনোযোগ দিয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলের দৈনিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে মহাত্মাজী চরকা ও তাঁত সম্বন্ধে গুজরাতিতে অনেক কথা বলিলেন, এবং তাঁহার গ্রেপ্তার হইলে কি কি কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিলেন। তাঁহার সেই উপদেশ সকলে নিস্পন্দভাবে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রার্থনার জমায়েৎ ভঙ্গ হইতে কিছু অধিক রাত্রি হইল, এবং চতুর্দ্দিক তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। প্রার্থনাস্থল হইতে মহাত্মাজী নিজ কক্ষে আসিয়া প্রায় তিন হাত লম্বা এক বাঁশের লাঠি হস্তে হন্ হন্ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। অন্ধকার রাত্রি বলিয়া দেবদাস তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লণ্ঠন লইয়া

ছুটিতে লাগিল। আশ্রমে আসিয়া অবধি মহাত্মাজীরও প্রাণে একটু স্ফূর্ত্তি আসিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

সান্ধ্য-প্রার্থনার পর আশ্রমে কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য নাই। প্রার্থনার পূর্ব্বেই সকলকে আহারাদি সমাপ্ত করিতে হইয়াছিল। মহাত্মাজী বেড়াইতে যাইলেন দেখিয়া আমি রাত্রির বিশ্রামের চেষ্টায় সুরেন্দ্রজীর কুটীরে আশ্রয় লইলাম। ভোর ৪টার সময় আবার প্রার্থনার ঘণ্টা বাজিল, এবং আবার সকল আশ্রমবাসী একত্রিত হইয়া সমস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করিবার পর মহাত্মাজী আত্মদর্শনের জন্য নির্জ্জনতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন যে এই নির্জ্জনতা কেবল লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনগমনেই লাভ হয়, তাহা নহে। ভিতর হইতে নিঃসঙ্গ হইলে লোকালয়ে থাকিয়াও নির্জ্জন-বাস করা যায়। গুজরাতি ভালরূপ বুঝিতে না পারাতে মহাত্মাজীর এই সকল অমূল্য উপদেশ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যতদূর সম্ভব বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার তাহাতে বড়ই অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল।

মহাত্মাজীর দপ্তরের কাগজপত্র ঠিক করিয়া রাখা এক মস্ত কাজ। যমুনাদাস রাজকোট চলিয়া যাইল দেখিয়া আমাকে কি করিতে হইবে তাহা বুঝিবার জন্য প্রাতে (৭ই অক্টোবার) মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন—"দেবদাসের সহিত কথা বলিয়া তোমাদিগের কাজ ভাগ করিয়া

দিব।” দ্বিতীয় দিবস বম্বে হইতে ষ্টোক্‌স্ সাহেব (Mr. Stokes), সিন্ধুদেশের শ্রীযুক্ত জয়রামদাস, এবং অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রাও প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেবদাস এই অতিথিবর্গের সেবা-শুশ্রূষা কিরূপ নিপুণতার সহিত করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। রামচন্দ্র রাও মহাশয় মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করিলেন,—“গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহ দিয়াছিলেন, অথচ আপনি অহিংসা প্রচার করিতেছেন, ইহার সামঞ্জস্য কোথায়?” মহাত্মাজী প্রথমে বলিলেন,—“এই প্রশ্নের উত্তর আমি বহুবার দিয়াছি। দেবদাস তোমাকে আমার বক্তব্য বুঝাইয়া দিবে।” কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন, “গীতা আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। মানুষের অন্তরে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে। সেই অসৎ-প্রবৃত্তির নাশ এবং সৎ-প্রবৃত্তি বা ধর্ম্মের বৃদ্ধির জন্য জীবাত্মাকে পরমাত্মা যে উপদেশ দিতেছেন, তাহাই গল্পের মধ্য দিয়া গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে।” এই বিষয়ে অন্য দিন অপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—“আপনি হত্যা করা অধর্ম্ম বলিতেছেন, কিন্তু দশমগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহ যুদ্ধ করিবার জন্য শিখ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তবে কি বুঝিতে হইবে যে তিনি ইহার দ্বারা অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন?” মহাত্মাজী বলিলেন,—“গুরুগোবিন্দ সিংহের যে অধিকার সামান্য জীবের সেই অধিকার নহে। গুরুগোবিন্দ সিংহকে অনুকরণ করিতে হইলে তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা পূর্ব্বে লাভ করিতে হইবে।” মহাত্মাজীর এই

উত্তর হইতে আমি বুঝিলাম যে তাঁহার মতে বদ্ধ-জীবের প্রত্যেক কার্য্য পাপ-পুণ্য বিচার করিয়া করিতে হইবে; নতুবা পাপানুষ্ঠান দ্বারা অন্তরের অপবিত্রতা বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে তাহার ফলভোগ নিশ্চয়ই করিতে হইবে। হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইয়া যখন বদ্ধ-জীব মুক্ত হইয়া যায়, তখন তাহার চিত্তে পাপের সংস্কার অঙ্কিত হয় না, এবং সেইজন্য তাহার কর্ত্তব্য এবং বদ্ধ-জীবের কর্ত্তব্য এক নিয়মে পরিচালিত হয় না।

দ্বিতীয় দিনের সান্ধ্য-প্রার্থনার পর মহাত্মাজী আশ্রমের সকলের নাম করিয়া কুশল-বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং এক একটা কথা বলিয়া সকলকে খুব হাসাইতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি নিজে কোন উপদেশ না দিয়া ষ্টোক্‌স্ সাহেবকে উপদেশ প্রদানের ভার দিলেন এবং প্রার্থনা শেষ হইলে পূর্ব্বদিনের ন্যায় ভ্রমণে বাহির হইলেন। রাত্রির অবসানে ৮ই অক্টোবার প্রাতে আবার যে প্রার্থনা হইল তাহাতে "অন্তর মম বিকসিত কর অন্তরতর হে" এই বাঙ্গলা গানটি গীত হইল। গানের ভাবে এমন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল যে গান শেষ হইলেও মহাত্মাজী অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে আসন করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে তিনি নিজের গৃহে চলিয়া গেলেন। গানের ভাব ভঙ্গ করিয়া সেই দিন আর তিনি কোন উপদেশ প্রদান করিলেন না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে চারিদিক্ আলোকিত হইলে আমি মহাত্মাজীর নিকট গিয়া বসিলাম। তখন প্রথমে আমাকে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কিছুক্ষণ সূতা কাটিতে বলিলেন। তাহার পর আবার

বলিলেন,—"তূলা ধুনিবার কাজটাও অবসর মত অভ্যাস করিয়া লইও।" এই সময় মহাত্মাজীর প্রাতের আহার লইয়া 'বা' আসিলেন। তিনি তাহা খাইতে খাইতে আমাকে ষ্টোক্‌স্ সাহেবের দুইটি প্রবন্ধ "ইণ্ডিপেন্‌ডেণ্ট" কাগজ হইতে পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। প্রবন্ধ দুইটি পুস্তকাকারে ছাপা হইবে। ষ্টোক্‌স্ সাহেব মহাত্মাজীকে তাহার মুখবন্ধ লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আহার শেষ করিয়া তিনি তাহা লিখিতে বসিবেন, এমন সময় আমেদাবাদ হইতে শ্রীমতী অনসূয়া বেন্ মহাত্মাজীর সহিত পরিচয় করাইতে একজন সাহেবকে লইয়া আসিলেন। সাহেবটি অনসূয়া বেনের ভ্রাতা; প্রসিদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অম্বালাল সারাভাই মহাশয়ের পুত্র-কন্যাদিগের গৃহ-শিক্ষক; সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন। অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই মহাত্মাজী সাহেবকে আশ্রমের চারিদিক দেখাইবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিলেন। সাহেবের সরল ও শান্ত স্বভাব এবং সকল বিষয় জানিবার ও শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া আমি বেশ মন খুলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। তিনিও তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—"I am one of Mahatmaji's humble attendants", অর্থাৎ আমি মহাত্মাজীর একজন সামান্য পরিচারক। পকেট হইতে ছোট একটি ক্যামেরা বাহির করিয়া সাহেব আশ্রমের নানা স্থানের ছবি (snapshots) তুলিয়া লইলেন। তাহার পর মহাত্মাজীর

নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ছবি তুলিবার অনুমতি চাহিলেন। মহাত্মাজী তাহাতে বলিলেন—"যদি অনুমতি চাও তাহা হইলে পাইবে না, কারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমি কোন ছবি তুলিব না, এইরূপ স্থির করিয়াছি। তবে আমার কাজের ক্ষতি না করিয়া এবং আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া, ছবি তুলিয়া লইলে আমি তাহাতে আপত্তি করিব না।" এই বলিয়া মহাত্মাজী আবার লিখিতে বসিলেন; সাহেব ইত্যবসরে মহাত্মাজীর ছবি তুলিয়া লইলেন।

সেই সময় বম্বের একজন ফটোগ্রাফার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ কথা শুনিয়া কয়েকদিন আশ্রমে থাকিয়া মহাত্মাজীর নানা ভাবের বহু ফটো তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাত্মাজী একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন—"আমার নিখুঁত প্রতিকৃতি তুমি তুলিতে পারিবে না, কেহই তাহা পারে নাই। আমার আকৃতি ঠিক্ একরূপ থাকে না, দিনের মধ্যে তাহার নানা পরিবর্ত্তন হয়।" মহাত্মাজীর এই কথার প্রকৃত অর্থ আমি তখন বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু পরে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি যে সত্য সত্যই তাঁহার আকৃতি সকল সময় এক রূপ থাকে না। কখনও তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছে যেন পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় যুবক, অসীম ও অদম্য উৎসাহে কার্য্যে নিরত আছেন; আবার কখনও মনে হইয়াছে যেন অশীতিপর বৃদ্ধ, জরাভারে কুঞ্চিত ও নত হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণ আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। তবে মনে হয়

তাঁহার শরীর এতদূর শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া গিয়াছে যে অন্তরের ভাব-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের আকৃতি অতি সহজেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহার দেহ অন্তরের ভাব প্রকাশের জন্য যেন দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছে।

বেলা দশটার সময় (৭ই অক্টোবার) শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় ও শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল, এই দুইজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং গভর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করিবে কিনা এই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী বলিলেন যে কেবল মডারেট্‌দিগের সহানুভূতি হারাইবে, এই ভয়ে গভর্ণমেণ্ট ইতস্ততঃ করিতেছে। কিন্তু লালাজী ও প্যাটেল সাহেব তাহা স্বীকার করিলেন না। মডারেট্‌দিগের উপর ইঁহাদের উভয়েরই বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই দেখিলাম। তথাপি মহাত্মাজী জোর দিয়া ঐ কথাই বলিতে লাগিলেন। লালাজী মহাত্মাজীকে বলিলেন—"দেশে এখন যেরূপ নির্ভীকতা দেখা যাইতেছে, কেবল মহাত্মাজীর দৃষ্টান্ত-প্রভাবেই তাহা লোকের প্রাণে পরিস্ফুট হইয়াছে।" ইহার পর তিনি গোপনে কিছু পরামর্শ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

লালাজী ও প্যাটেল সাহেব উভয়েই আশ্রমে আহার করিলেন। আশ্রমে একদল দুর্দ্দান্ত কুকুর ছিল, তাহাদের দৌরাত্ম্যে নিশ্চিন্তমনে কেহ আহার করিতে পারিত না। লালাজীর আহারের সময় মহাত্মাজী দাঁড়াইয়া কুকুর তাড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত ভারত ভ্রমণ কালে তাঁহাকে যেরূপ

সম্মান লাভ ও রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে দেখিয়াছি, তাহার পরই মহাত্মাজীর এইরূপ কুকুর তাড়াইতে উৎসাহ দেখিলাম। দুই দৃশ্যই মনে মনে তুলনা করিয়া ভাবিলাম উভয়ই তাঁহার চরিত্রের উপযোগী হইয়াছে।

বৈকালে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজের সহকারী সম্পাদক শ্রীবালজী দেসাই এবং গুজরাতি 'নব জীবনে'র সহকারী সম্পাদক শ্রীআনন্দ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাজীর সহকর্ম্মীরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইঁহাদের সহিত মহাত্মাজী যেরূপ মধুর ভাবে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম, মহাত্মাজীর অধীনে কাজ করিয়া কাহারও স্বাধীনতা, বিশিষ্টতা ও ব্যক্তিত্বের নাশ হয় না। এই সমস্তের ভিতর দিয়া সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই তিন দিন তেমন কাজের মত কাজ কিছুই করি নাই; সেই কারণ মহাত্মাজীর সঙ্গে বাস করিয়াও প্রাণে কেমন একটা ত্রাস আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, এইরূপ গোলমালের মধ্যে থাকিয়া পাছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ি, পাছে স্রোতের টানে পড়িয়া ভাসিয়া যাই।

একাদশ অধ্যায়

আবার বম্বে

৮ই অক্টোবার (শনিবার) রাত্রে মহাত্মাজী পুনরায় বম্বে যাত্রা করিলেন। এবার তাঁহার বাহনস্বরূপ দেবদাস ও আমি চলিয়াছি। দেবদাস ভাল ওস্তাদ জুটিয়াছে, কোন বিষয়ে তাহাকে কিছু বলিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতেছে না; এবং নিজে যেরূপ কার্য্যতৎপর অপরেও সেইরূপ অগ্রগামী হইয়া কাজ করিতেছে দেখিলে সে বড় প্রসন্ন হয়। মহাত্মাজীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায়, শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী, রামচন্দ্র রাও এবং মহাদেব দেসাই মহাশয় চলিয়াছেন। ট্রেণে আমি শ্রীযুক্ত মহাদেবের নিকট রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। তিনি কাব্য-রসের রসিক লোক। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি আমাকে নানারূপ কবিতার রস আস্বাদন করাইতে খুব উৎসাহী ছিলেন। শ্রীযুক্ত মহাদেবের সহিত এই মধুর আলাপন অল্পক্ষণের জন্য হইলেও, সেই স্মৃতি কখনও নষ্ট হইবার নহে।

পরদিন বেলা ১১টার সময় আমরা বম্বে পৌছিলাম। বাসায় আসিবার কিছু পরে মুস্‌লেম নেতা জিনা সাহেব মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি আশ্রমে মহাত্মাজীর নামে তার করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া

রাখিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর নগ্ন দেহ এবং জানুর উপর পরিধেয় বস্ত্র; আর মিঃ জিনার পোষাক-পরিচ্ছদ আপাদমস্তক পূর্ণমাত্রায় সাহেবী। দুইজনে যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া করমর্দ্দন করিতেছিলেন তখন পশ্চাৎ হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল— "What a great contrast !" অর্থাৎ,—কি বিষম পার্থক্য ! মহাত্মাজীর সহিত বহুক্ষণ গোপনে আলাপ করিয়া জিনা সাহেব প্রস্থান করিলেন।

বৈকাল ৬টার সময় বম্বের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ মিল্‌স্‌এর নিকটে জনসাধারণের এক প্রকাণ্ড সভা হইল। দেবদাসের সহিত আমি সেই সভায় গিয়াছিলাম। মহাত্মাজীর প্রবেশের পরই সভার দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। লক্ষাধিক লোকের সভার শৃঙ্খলা রক্ষা কিরূপ কঠিন ব্যাপার, যাঁহারা ঐরূপ জনতার পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহারাই উহা বুঝিবেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগের পক্ষে সময় সময় ধৈর্য্যরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। আমাদের সঙ্গে সভার প্ল্যাট্‌ফর্‌ম্ অবধি প্রবেশের টিকিট থাকিলেও আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। দেবদাস আত্মপরিচয় দিলেন না, দিলে কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু তাঁহার এতই বিনয়, বুদ্ধি এবং সহিষ্ণুতা যে ঐরূপ পন্থা অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগের সহিত তর্ক ও বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল টিকিটের বলে তিনি প্রবেশের অধিকার সাব্যস্ত করিয়া লইলেন। পিতার নাম প্রকাশ করিয়া তিনি কোনরূপ সুবিধালাভের চেষ্টা করিলেন না দেখিয়া মনে

মনে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলাম। সভায় প্রবেশ করিয়াই দেখি—সম্মুখে, বামে ও দক্ষিণে অর্দ্ধবৃত্তাকারে অসংখ্য লোক শ্রেণীবদ্ধভাবে বসিয়া রহিয়াছে। প্ল্যাট্‌ফর্‌মের কিঞ্চিৎ বামে বিলাতি বস্ত্রের এক প্রকাণ্ড স্তূপ প্রস্তুত করা হইয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে ৫ই অক্টোবার তারিখে 'ওয়ার্কিং কমিটি'র দ্বারা দেশের পুলিশ, সিপাহী এবং অন্যান্য রাজকীয় কর্ম্মচারিবর্গকে সরকারী চাকরী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া যে মন্তব্য পাস হইয়াছিল, এই সভাতে মহাত্মাজী সেই মন্তব্য সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন যে, যে অপরাধে আলিভ্রাতাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, সেই অপরাধ তিনি প্রকাশ্যভাবে এ সভায় করিতেছেন। তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিবার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে আহ্বান করিলেন এবং যাঁহারা সেই প্রস্তাব সমর্থন বা অনুমোদন করিবেন এবং যে সমস্ত সমবেত ব্যক্তি সেই সভাতে উপস্থিতি দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিতে তিনি সরকারকে অনুরোধ করিলেন।

সিপাহীদিগের সম্বন্ধে মহাত্মাজী বিশেষভাবে এই কথা জানাইয়া দিলেন যে, কেহ যেন গোপনে তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচারের চেষ্টা না করেন। এই আন্দোলন হইতে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের পন্থা সমূলে বর্জ্জন করা হইয়াছে। এই আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে পারিবেন না, তাহা গোপনে বলিবার অধিকার তাঁহার নাই।

'ওয়ার্কিং কমিটী'র মন্তব্যের মধ্যে সৈন্যদিগকে সরকারি

চাকরী ত্যাগ করিয়া চরকা, তাঁত এবং খদ্দরের ব্যবসায় অবলম্বন দ্বারা জীবিকার্জ্জনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিলেন—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কেবল চরকা এবং তাঁত অবলম্বনেই দেশের দারিদ্র্য বিদূরিত হইতে পারিবে এবং লোকে জীবিকার জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভরশীল না হইয়া স্বাধীনভাবে জীবন পরিচালন করিতে সক্ষম হইবে। মৌলানা মহম্মদ আলী বলিতেন যে এই অসহযোগ যুদ্ধে গোলা-বারুদের কোন প্রয়োজন নাই; সূতার গুলিই আমাদের গোলা, আর চরকা আমাদের কামান। মহাত্মাজী বলিলেন, এই কথা খুব ঠিক্।

কিন্তু দেশের লোক তেমন উৎসাহের সহিত খদ্দর গ্রহণ করিয়া বিলাতি বস্ত্রের আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে সমর্থ হইতেছে না, এই কথা বলিতে বলিতে মহাত্মাজীর চক্ষু আর্দ্র হইল। তিনি অশ্রুসিক্তনয়নে বলিতে লাগিলেন—"এক বৎসর পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম যে বৎসরের মধ্যেই স্বরাজলাভ সম্ভব হইতে পারিবে। বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল, অথচ এখনও স্বরাজ লাভ হইল না। যে সকল সর্ত্ত আমি দেশের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহাও সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইল না। আমি উকিলভ্রাতাদিগকে কিরূপে বুঝাইব যে আদালতে ন্যায়বিচার হয় না, এরূপ স্থানে আইন-ব্যবসায় করা অসঙ্গত। আমার তপস্যার অভাবে দেশের ছাত্রমণ্ডলীকেও স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিতে সম্মত করিতে আমি সক্ষম হইলাম না। বঙ্গের নর-নারীদিগকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে খদ্দর গ্রহণের প্রয়ো-

জনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করাইতে পারিলাম না।' এই দুঃখ আমি কোথায় রাখিব? কিন্তু আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা ভাবিবার দরকার নাই। এখনও যদি সকলে চরকা ও তাঁত লইয়া খদ্দর প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বরাজলাভের সম্ভাবনা আছে। চতুর্দ্দিকে খদ্দরের প্রসার লাভ যতক্ষণ আশানুরূপ না হইবে, ততক্ষণ আমি আইনভঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না। আমি ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ সামান্য জীব। ভগবানই অভ্রান্ত। ১৯১৯ সালে যথোপযোগী ব্যবস্থা না করিয়াই আইনভঙ্গ অনুষ্ঠান দ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম সেইরূপ দ্বিতীয়বার না হয়, ততটুকু দেখিয়া চলিবার বুদ্ধি আমার আছে। আইনভঙ্গ 'কসরতে'র কল-কৌশল ও মারপেঁচ সমস্তই আমার জানা আছে। ইহার অমোঘ শক্তি আমি জানি, আবার ইহার বিঘ্ন কোথায় তাহাও আমার জানা আছে। যতক্ষণ দেশে শান্তিময় পন্থার প্রতি লোকের নিষ্ঠা উদ্বুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ আইনভঙ্গ অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইবে না। ঐ নিষ্ঠা কি পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমানের একতা কতদূর দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, দেশে চরকার প্রচলন এবং খদ্দরের বিস্তৃতি দ্বারা তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। চরকা যখন সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে তখন অশান্তি-উপদ্রবের চিন্তা লোকের মন হইতে দূর হইয়া যাইবে।"

তাঁহার ফকিরের বেশ দেখিয়া বহুলোক অশ্রুবিসর্জ্জন করে,

এই বিষয় উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী বলিলেন—"আমার জন্য আমি কাহারও নিকট বিন্দুমাত্র দয়াপ্রার্থী নহি। সম্প্রতি আমি অন্ধ্রদেশে কয়েকটি জেলা পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। সেই সমস্ত জেলায় প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। শুনিয়াছি, কয়েকজন স্ত্রীলোক অন্নাভাবে সন্তানসন্ততি সহ জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দেশের এইরূপ দুরবস্থা স্মরণ করিয়া যদি সকলে চরকা ও খদ্দর গ্রহণ করে, তবেই জামা কাপড় পুনরায় গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। ঐ বিলাতি বস্ত্রস্তূপে আমি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিব উহা আমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিতেছে তাহার প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

উপসংহারে মহাত্মাজী তিলক মহারাজের নাম লইয়া বলিলেন যে—"লোকমান্যের মহত্ত্ব বুঝিবার জন্য "তিলক-গীতা" পাঠের প্রয়োজন নাই। তিলক-গীতার সারাংশ তিনি এক কথায় বলিয়া দিতে পারেন। "Swaraj is our birthright," অর্থাৎ, স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার,—এই বাক্য দ্বারা লোকমান্য তিলক তাঁহার জীবন, শিক্ষা এবং সাধনার মূলমন্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা তিলক-গীতার প্রথমার্দ্ধ; আর দ্বিতীয়ার্দ্ধ দ্বারা মহাত্মাজী পাদপূরণ করিতেছেন, যথা—"Swaraj is attainable only through the spinning-wheel," অর্থাৎ, চরকাই স্বরাজলাভের একমাত্র উপায়। এই দুই বাক্য একত্র করিলে তিলক-গীতা বা স্বরাজ-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব বোধগম্য হইবে।"

মহাত্মাজীর সেই বিষণ্ণভাব এবং অশ্রুসিক্ত নয়ন দর্শন করিয়া সমবেত জনমণ্ডলী নিতান্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিল। মহাত্মাজীর অভিভাষণ সমাপ্ত হইলে লালাজী সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। যে সমস্ত দেশের লোক সেই সময়ও সরকারকে সাহায্য করিয়া আপনাদিগকে পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে, এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য সামান্য খদ্দর-বস্ত্র গ্রহণ করিতেও পরাঙ্মুখ, তাহাদিগকে তিনি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। লালাজীর পর মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব এবং বিহার প্রান্তের সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, উভয়ে তেজঃপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

অতঃপর মহাত্মাজী বস্ত্রস্তূপে অগ্নি প্রদান করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বোমার দুড়ুম্ দুড়ুম্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবিশাল স্তূপের বস্ত্ররাশি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। দেবদাস ও আমি যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সভাস্থল ত্যাগ করিয়াও মহাত্মাজীর সঙ্গ লইতে পারিলাম না। অবশেষে ট্রামে চড়িয়া বাড়ী ফিরিতে আমাদিগের অনেক রাত্রি হইয়া গেল। বাড়ীতে পৌছিয়া দেখি, তিনি সোমবারের মৌনব্রত আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর শয্যা প্রস্তুত হইলে শয়ান অবস্থায় অক্টোবার মাসের Modern Review (মডার্ন রিভিউ) হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের

লেখা "The Call of Truth," অর্থাৎ, সত্যের আহ্বান শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতীত, Calcutta Review (কলিকাতা রিভিউ) ইংরাজী মাসিকে "Gandhi and Tagore," অর্থাৎ, গান্ধী ও ঠাকুর শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সরোজিনী নাইডু মহাশয়া মহাত্মাজীকে পড়িতে দিয়াছেন; তাহাও তিনি অনেক রাত্রি অবধি নিদ্রাত্যাগ করিয়া পাঠ করিলেন।

মহাত্মাজীর গ্রেপ্তার লইয়া এখন আর কিছু শুনা যাইতেছে না। তাহাতে মনে হইতেছে যে শীঘ্র ঐরূপ কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বম্বে আসিয়া একটা জনরব শুনা গেল যে বম্বে গভর্ণমেণ্টের Executive Council বা কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অন্যতম মেম্বর, শ্রীযুক্ত সিতলবাদ মহাশয় মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধতা করিতেছেন। অপর একটা জনশ্রুতি এই যে মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের জন্য ভারত সরকার বিলাত হইতে অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহা তখনও আসে নাই।

পরদিবস (১০ই অক্টোবার) সোমবার, মহাত্মাজী প্রধানভাবে রবিবাবুর প্রবন্ধের উত্তর লিখিতেই ব্যস্ত রহিলেন। উত্তরের নাম দিলেন, "The Great Sentinel", অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ প্রহরী। মধ্যে মধ্যে অনেক দর্শনার্থী আসিয়া তাঁহার লেখার ব্যাঘাত করিতে লাগিল। প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে মিসেস্ নাইডু, লালা লাজপৎ রায় মহাশয় এবং মহারাষ্ট্রীয় নেতা শ্রীযুক্ত খাদিলকার। তাঁহারা প্রত্যেকে বহুক্ষণ আলাপ করিলেন। পরিশেষে লেখা সমাপ্ত

হইলে তিনি আমাকে প্রবন্ধটি বিশেষ যত্নসহকারে পড়িতে এবং যদ্যপি কোন অংশে উত্তরের অপেক্ষা থাকে, তবে তাহাও তাঁহাকে জানাইতে বলিলেন। আমাকে লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "I hope you have read the Poet's article" —অর্থাৎ, তুমি বোধ হয় কবিবরের প্রবন্ধটি পড়িয়াছ। আমি বলিলাম "না"। শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন। তখন আমি বলিলাম,—"এই প্রবন্ধই বাঙ্গলাতে রবিবাবু Calcutta University Institute (কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্) সভাগৃহে পাঠ করিয়াছিলেন ; সেই জন্য আমি তাঁহার স্থূল যুক্তিগুলি অবগত আছি।" ইহাতে তিনি মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, তাঁহার অনেক প্রাণের কথা মহাত্মাজী এই প্রবন্ধ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে লেখা সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হইল। তাঁহার লেখা সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কোন কথা বলাই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তথাপি তিনি হুকুম দেন বলিয়াই আমি কখনও কখনও কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার ছিল না। পাঠ শেষ হইলে আমি উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধটি দিলাম, এবং মুখের ভাবে ও মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে আমার উহা খুবই ভাল লাগিয়াছে। তিনি তখনই তাহা ডাকে পাঠাইয়া দিতে লিখিয়া দিলেন এবং তৎসঙ্গে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র জন্য অনেক "Notes" বা "ক্ষুদ্র মন্তব্য" পাঠাইতে দিলেন। আমি আজ প্রায় সমস্তক্ষণই তাঁহার নিকট ছিলাম, অথচ

ঐ ক্ষুদ্র মন্তব্যগুলি কখন লিখিয়া ফেলিলেন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তাঁহার দ্রুত লিখিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

আজ শ্রীযুক্ত মহাদেব এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে মহাত্মাজী লিখিয়া লিখিয়া তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ মহাশয় রাত্রি দশটার ট্রেণে কানপুর যাত্রা করিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় তিনি মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন যে তাঁহাকে কিছু খবর দিবার প্রয়োজন হইলে টেলিগ্রাম করিতে অথবা পত্র লিখিতে যেন শৈথিল্য না হয়। রাজগোপালাচারীজী আজ মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন।

মঙ্গলবার অবধি বম্বে থাকিয়া সেইদিন (১১ই অক্টোবার) রাত্রি দশটার ট্রেণে মহাত্মাজী সুরাৎ যাত্রা করিলেন। মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব মহাত্মাজীর সঙ্গী। ট্রেণ ছাড়িবার মাত্র দুই মিনিট পূর্ব্বে আমরা বম্বে গ্রাণ্ট্ রোড্ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। দেবদাস দৌড়িয়া টিকিট্ করিতে গেল। আমি একজন মুটের মাথায় মাল তুলিয়া দিয়া, বাকি যাহা কিছু রহিল দুই হাতে তুলিয়া লইলাম। তাহাতে মহাত্মাজী হাত বাড়াইয়া "হাম্‌কো ভি কুছ্ দেও", এই বলিয়া নিজেও কিছু বহন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমি তাহা তাঁহাকে করিতে দিলাম না। এইরূপ ব্যস্ততার মধ্যে পাছে কোন জিনিষ ফেলিয়া যাই, সেইজন্য তিনি আমার পিছে পিছে রহিলেন এবং মাল তুলিতেও তাঁহার সাহায্য আবশ্যক

হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেবদাস·ও আমি ক্ষিপ্রতার সহিত সমস্ত কাজ শেষ করিলাম, তাহাতে তাঁহাকে কিছুই বহন করিতে হইল না; কিন্তু তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ট্রেণে মালপত্র তোলা হইলে আমি এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়িলাম; কিন্তু সেখানে এত ভিড় যে বসিবার স্থান ছিল না। একজন আরোহী আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া স্বেচ্ছায় উপরের বাঙ্কে তাঁহার বিছানাতেই আমাকে শুইতে অনুমতি দিলেন। এদিকে শুনিলাম, দেবদাস রাত্রিতে আমার বিছানা স্কন্ধে করিয়া আসিয়াছিল এবং আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। দেবদাসের আচার-ব্যবহার যতই লক্ষ্য করিতেছি ততই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি।

দ্বাদশ অধ্যায়

সূরাৎ নগর

১২ই অক্টোবার, বুধবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমরা সূরাৎ পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের সন্নিকটে মহাত্মাজীর এক পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামের স্থান ছিল। ষ্টেশন হইতে বহুজনপরিবৃত হইয়া তিনি সেই বিশ্রামাগারে চলিয়া গেলেন। তথায় তিনি প্রাতর্ভোজন গ্রহণপূর্ব্বক সামান্য কিছু লেখাপড়ার কাজ করিবেন, তাহার পর সহরের মধ্য দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া সহরের অপর প্রান্তে ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে "স্বরাজ আশ্রমে" অবস্থান করিবেন। দেবদাস তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। আমি মালপত্র লইয়া "স্বরাজ আশ্রমে" চলিয়া গেলাম।

সহরের বাহিরে "স্বরাজ আশ্রমে" যাইবার পথে দেখিলাম, মহাত্মাজীর শুভাগমন উপলক্ষে সহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, এবং দলে দলে খদ্দর-পরিহিত লোক ষ্টেশনের দিকে আসিতেছে। দেবদাসের মুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, সূরাতে যে প্রকার খদ্দরের বহুল ব্যবহার দেখা যাইবে এরূপ আর ভারতে কোথাও নহে। লোকের চলাফেরা এবং সাজসজ্জা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, আজ এ সহর মধ্যে একটা বিশেষ কিছু ব্যাপার ঘটিবে। কিন্তু তেমন কোলাহল বা গোল-

মাল নাই। এইরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা দেশে দলে দলে লোক রাস্তায় বাহির হইয়া গান, বাজনা ও চীৎকার করিয়া সহর তোলপাড় করিত। এখানেও দলে দলে লোক রাস্তায় বাহির হইয়াছে, কিন্তু সকলেই নিঃশব্দে গমনাগমন করিতেছে; কেবল মধ্যে মধ্যে দেখি এক এক জনের স্কন্ধে এক একটা ঢোল রহিয়াছে এবং মহাত্মাজীর আগমনের মঙ্গলবার্ত্তা ঘোষণার জন্য কাঠি দিয়া তাহাতে আঘাত করিয়া শব্দ করা হইতেছে।

সুরাতের রাজপথ অতিক্রম করিতে করিতে ভারতের কত পূর্ব্বস্মৃতি চিত্তে উদিত হইতে লাগিল। এই সেই নগর—যেখানে বহুশতকাল্ সৌরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি গৌরবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজমান ছিল। যুগপরিবর্ত্তনের চিহ্ন ধরিত্রীর বক্ষে স্বতঃই অঙ্কিত হইয়া যায়। তাই আজ অর্ব্বাচীন বম্বে মাত্র সেদিন জন্মগ্রহণ করিয়া সুরাতের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ যুগেরও আবার পরিবর্ত্তন হইবে; তখন বম্বের স্মৃতি অম্বুরাশিতে বিলুপ্ত হইলেও সুরাৎ আবার নিজের অক্ষয় কীর্ত্তি ও বিজয়পতাকা বহন করিয়া তাহার দীপ্তি বিকিরণ করিবে। ট্রেণ হইতে সুরাতের পূর্ব্বযুগের প্রাচীর পরিখা ও দুর্গ দেখা যায়, তাহাতে কত সময় কত বহিঃশত্রু প্রতিহত হইয়াছে জানি না। কিন্তু মাতা বসুন্ধরা আজ কি দুর্দ্দৈবের বশে যোড়লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধা হইয়াছেন; তাহার ফলে সুরাতেরও বক্ষে পাথর চাপা পড়িয়াছে, এবং ঐ পুরাতন প্রাচীর, পরিখা ও দুর্গ সমস্তই নিরর্থক হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বযুগের সেই প্রাচীরের নিকট রেল-লাইন দেখিয়া

উহা লৌহশৃঙ্খল এবং সুরাতের সুবিস্তৃত ষ্টেশনটি যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৌরাষ্ট্রের বক্ষোপরি প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় তখন আমার বোধ হইতে লাগিল।

ইংরাজ এই দেশে মোগল-রাজত্ব সময়ে বাণিজ্য করিতে আসিয়া প্রথম সুরাতে কুঠি স্থাপন করে। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে কেহ কি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল যে সেই কুঠির মধ্যে যে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বাস করিতেছিল, তাহাদেরই বংশধরেরা কালক্রমে এই ভূ-ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে। অশ্বত্থের বীজ দেখিয়া যেমন সুবিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ কল্পনা করা যায় না, সেইরূপ সেই কুঠি এবং বর্ত্তমান শক্তিশালী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট,—এই দুই-এর মধ্যে যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ আছে, মন কিছুতেই তাহা সহজে স্বীকার করিতে চাহে না; কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করাই শ্রীভগবানের লীলা; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

সুরাতে সেই পুরাতন পাশ্চাত্য প্রভাবের এক অদ্ভুত নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান, তাহা দেখিতে পাইলাম। গুজরাত অঞ্চলে সুরাতের ইংরাজি বাদ্যের 'ব্যাণ্ড' (band) প্রসিদ্ধ ইহা দেবদাসের মুখে শুনিয়াছিলাম। বিবাহে ধূমধাম করিতে হইলে সুরাতের 'ব্যাণ্ড' বাদ্য না হইলে কিছুই হইল না, এইরূপ সাধারণ লোকের বিশ্বাস। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দির ইংরাজি পোষাক ও ফ্যাসান্ ছবিতে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ব্যাণ্ডের বাদকদিগের পোষাকও ঠিক সেইরূপ। মাথায় উঁচু টুপি, গায়ে জেব্রার রং-এর মত নানারঙ্গের ডোরাকাটা কোট, কোটের ছাট

দুই তিনশত বৎসর পূর্ব্বের ইংরাজি কোটের ছাঁটের মত। দেখিয়া মনে হইল, বাস্তবিকই আমরা রক্ষণশীল জাতি ; ইংরেজী পোষাক ও ফ্যাসানের কায়দা দিন দিন কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু সুরাতের ব্যাণ্ড-বাদকেরা মোগল আমলের ইংরাজদিগের জীবন্ত ছবি এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

মোগল আমলের ইংরাজদিগের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা-রবি শিবাজীর সুরাৎ লুণ্ঠনের কথা মনে হইল। এইরূপ অতীত ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে করিতে "স্বরাজ আশ্রমে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই আশ্রমের অপর নাম 'পাটিদার বোর্ডিং'। গুজরাতে পাটিদার নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহা-দেরই আনুকূল্যে এই বোর্ডিং রক্ষিত হইতেছে। চল্লিশটী যুবক তখন ঐ আশ্রমে শিক্ষালাভ করিয়া দেশসেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সহরের কোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত বৃক্ষ-রাজি পরিবেষ্টিত আশ্রমটী দেখিয়া মনে হইল যেন গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি। পাটিদার বোর্ডিং-এর অনতিদূরে "অনাবিল বোর্ডিং" নামে অপর এক আশ্রমও আছে। অনাবিল ব্রাহ্মণদিগের পোষকতায় উহা রক্ষিত। অনাবিল বোর্ডিং-এর আচার্য্য দয়ালজী ভাই সুরাৎ-জেলা-কংগ্রেস-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ; আর পাটিদার বোর্ডিং-এর পরিচালক কল্যাণজী ভাই উহার মন্ত্রী বা সেক্রে-টারী। দয়ালজীভাই তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারে তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া একেবারে ফকির হইয়া বসিয়াছেন এবং কল্যাণজীভাই প্রমুখ বহু একনিষ্ঠ দেশ-সেবকের সাহায্যে

সুরাৎ জেলাকে অসহযোগ আন্দোলনের এক আদর্শ কেন্দ্ররূপে গঠন করিয়াছেন।

আমার আশ্রমে পৌঁছিবার ২।৩ ঘণ্টা পরে মহাত্মাজী, মৌলানা সাহেব ও দেবদাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের একটি সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত কক্ষের নাম 'প্রার্থনা মন্দির'। সেই কক্ষে মহাত্মাজী বসিলেন এবং দপ্তর খুলিয়া নিজের লেখাপড়ার কার্য্যে নিবিষ্ট হইলেন, এবং ঐভাবে কিছুকাল যাপন করিয়া সুরাতের বহির্দ্দেশে মুসলমানদিগের এক গণ্ডগ্রাম পরিদর্শনে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার অল্পপূর্ব্বে দেবদাসের সঙ্গে তাপ্তী নদীর উপকূলে সুরাতের বৃহৎ জনসভাতে উপস্থিত হইয়া দেখি, যে মহাত্মাজী সেই গ্রাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বক্তৃতা দিতেছেন। প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র লোকের এই বিরাট সভা; যে দিকে দৃষ্টি করি, সেই দিকেই দেখি খদ্দরের শাদা টুপি ও খদ্দরের জামা। ইহাতে সভার দৃশ্য এত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়াছিল যে তাহা বর্ণনাতীত। একস্থানে একত্রিত খদ্দর পরিহিত এত লোক ইতিপূর্ব্বে কোথায়ও আমি দেখি নাই। মহাত্মাজী গুজরাতিতে কি বক্তৃতা প্রদান করিলেন তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না। তবে বুঝিলাম যে বর্ত্তমানকালে ঐরূপ বৃহৎ জনসভার তিনি পক্ষপাতী নহেন। গ্রামে গ্রামে কিরূপে খদ্দরের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই এখন তাঁহার প্রধান চিন্তা। কারণ মনে প্রাণে খদ্দর গ্রহণ করিতে হইলে যে জ্ঞান, যে নিষ্ঠা ও যে একাগ্রতার প্রয়োজন, সাধারণে তাহার বিকাশ না হওয়া

অবধি তিনি কিছুতেই সার্ব্বজনীন শান্তিময় অবাধ্যতা (mass civil disobedience) কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। সভাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে দেবদাস ও আমি বাসায় চলিয়া আসিয়া সুরাৎ হইতে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। মহাত্মাজী ও মৌলানা সাহেব সভা হইতে বাসায় আসিলে আমরা সেই রাত্রিতেই সাবারমতি যাত্রা করিলাম।
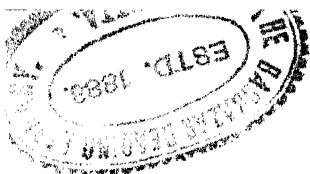
ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ (১)

১৩ই অক্টোবার প্রাতে আশ্রমে আসিয়া ৩১শে অক্টোবার অবধি মহাত্মাজী আশ্রমেই অবস্থান করিলেন। তাহার পর দিল্লীর অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটি বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য তিনি ১লা নভেম্বর তারিখে দিল্লী যাত্রা করিলেন; অক্টোবার মাসের ১৩ই হইতে ৩১শে অবধি এই উনিশ দিন তিনি আশ্রমের বাহিরে কোথায়ও না যাইলেও ইহা সহজে প্রতীত হইবে যে, যে সমস্ত ঘটনার বীজ ঐ সময় উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তীকালে প্রকটিত হইয়া আন্দোলনের গতি পরিচালিত করিয়াছিল। এই সময় সুরাতের দয়ালজীভাই ও কল্যাণজীভাই আসিয়া মহাত্মাজীকে বাড়্‌ডোলি তালুক পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং 'সার্ব্বজনীন শান্তিময় অবাধ্যতা' (mass civil disobedience) সমরে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা বাড়্‌ডোলির আছে তাহাও তাঁহারা জ্ঞাপন করিয়া গেলেন। বম্বে হইতে নেতৃবর্গের স্বাক্ষরিত ইস্তাহার জারি হইবার পর মহাত্মাজী শান্তিময় অবাধ্যতা অনুষ্ঠানের পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিলেন; এবং আশ্রমে আসিয়া তিনি প্রতিদিন নানাভাবে স্বকীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি আশ্রমবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ

করতঃ শেষ বিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দিল্লীতে অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটির সভায় তিনি শান্তিময় অবাধ্যতা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ইতিমধ্যে এক নূতন বিঘ্ন উপস্থিত হইল। নাগপুর* কংগ্রেসের বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট্ বিজয়রাঘবাচারীজীর ঐকান্তিক দেশপ্রীতি সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ হইতে পারে না। তিনি বয়সে প্রবীণ হইলেও মধ্যপন্থী রাজনৈতিকদিগের ন্যায় গভর্ণমেণ্টের অনুবর্ত্তী হইয়া দেশসেবার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু মহাত্মাজীর অসহযোগ নীতি সম্বন্ধেও তিনি একমত ছিলেন না, ইহা নাগপুর কংগ্রেসের ইতিহাস পাঠেই অবগত হওয়া যায়। এই মতভেদ তাঁহার নানা কার্য্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। কংগ্রেসের সমস্ত কার্য্যকরী ক্ষমতা অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটির হস্তে ন্যস্ত, কিন্তু নাগপুর কংগ্রেসে এইরূপ মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল যে ঐ কমিটি তাহাদিগের সেই ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটির হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন। সেই ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা যখন ৪ঠা নভেম্বর তারিখে দিল্লীতে অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটির সভা আহূত হইল, বিজয়রাঘবাচারীজী তখন তাহার বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন। এই সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট্ ও ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে কাহার কতদূর ক্ষমতা, তদ্বিষয়ে সংবাদ-পত্রে বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্টের সহিত কংগ্রেস সেক্রেটারী পণ্ডিত মতিলালজীর যে তর্ক-বিতর্ক হয়,

* ১৯২০ ডিসেম্বরে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

তাহা কংগ্রেসের ইতিহাসে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদকালে বিজয়রাঘবাচারীজী মহাত্মাজীকে যে সমস্ত তার করেন তাহা মহাত্মাজী পণ্ডিত মতিলালজীর গোচরার্থ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে পণ্ডিতজী তাহা ছাপাইয়া অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। মহাত্মাজী ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রেরিত সেই তারগুলি এই প্রকারে ব্যবহৃত হইবে ইহা মহাত্মাজীর অভিপ্রেত ছিল না। পণ্ডিত মতিলালজী যখন ১৩ই অক্টোবার তারিখে এই বলিয়া মহাত্মাজীকে প্রথম সংবাদ দিলেন যে প্রেসিডেণ্ট্ মহাশয় অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটির সভা স্থগিত রাখিবার হুকুম দিয়াছেন, তখন মহাত্মাজী তারযোগে পণ্ডিতজীকে জানাইলেন যে, "I suggest courteous ignoring Presidential word"—অর্থাৎ আমার মতে সভাপতি মহাশয়ের হুকুম ভদ্রভাবে অমান্য করা যাইতে পারে। সংবাদপত্র সমূহে এই বিষয় লইয়া আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ হইবার পর শেষে তাহাই ঘটিল ; এবং দেখা গেল যে বিজয়রাঘবাচারীজী মহাশয় দিল্লীর সভাতে উপস্থিত না হইলেও সভার কোন অনিষ্ট হইল না।

এদিকে ২২শে অক্টোবার তারিখে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জী সিমলা পাহাড়ে বড়লাট্ লর্ড রেডিং সাহেবের সহিত কি পরামর্শ করিয়া হঠাৎ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। লর্ড রেডিং তখন যুবরাজের অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত। বড়লাট্ মনে

করিয়াছিলেন যে যুবরাজকে ভারতে আনয়ন করিলে ভারতের জনসাধারণের মজ্জাগত রাজভক্তি আবার জাগিয়া উঠিবে এবং মহাত্মাজী ও কংগ্রেসকে ত্যাগ করিয়া ভারতের জনমণ্ডলী তাহার ফলে পুনরায় ব্রিটিশ্ রাজশক্তির প্রতিই আস্থা প্রদর্শন করিতে থাকিবে। যুবরাজের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্য করিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগীদিগের মিটমাটের প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মালবীয়জীর এই আগমন হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়া রহিল। পাঠক, ভবিষ্যৎ এক অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত পরিচয় পাইবেন।

অক্টোবার মাসের এই উনিশ দিন মহাত্মাজীর প্রাত্যহিক জীবন ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত আমি যে ভাবে ও যে পরিমাণে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, দৈনিক ডায়েরির আকারে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। ইহাতে প্রতিদিনের সমস্ত ঘটনা বা কথা সন্নিবেশিত না হইলেও মহাত্মাজীর দৈনন্দিন জীবনের একটা মোটামুটি ছবি ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এই সময় আমি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা হইতে এই ডায়েরি সঙ্কলন করিলাম।

* * * *

১৩ই অক্টোবার (১৯২১)।—সুরাৎ হইতে আসিয়া অবধি দেখিতেছি, মহাত্মাজী আমার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিতেছেন। কারণ কি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমিও

এখন সকলের ন্যায় তাঁহাকে 'বাপুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি তাঁহার পুত্রের সমান, তাঁহার আশীর্ব্বাদের ভিখারী। কিন্তু তাঁহার স্বভাব এতই মধুর যে তিনি উঁচু নীচু ভেদ দেখেন না। যতই আন্দোলন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে এবং অসহযোগীর ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিবার সময় হইয়া আসিতেছে, ততই তাঁহাকে দিনের পর দিন অধিকতর চিন্তান্বিত, অধিকতর একাগ্র দেখিতেছি। এক মুহূর্ত্তও তিনি বৃথা কথায় সময়ের অপব্যয় করেন না। কি প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আলিভ্রাতাদের মোকদ্দমার সময় তাঁহারা আদালতে যে হুলুস্থূল কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া কেহ কেহ তাঁহাদিগের কার্য্যের সমালোচনা করাতে তিনি আলিভ্রাতাদের পোষকতা করিয়া বলিলেন,—"ইহাতে সরকারি আদালতের প্রতি সাধারণের যে মোহ আছে তাহা নষ্ট হইবে।" কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও বলিলেন—"হাঁ, আমার দ্বারা ঐরূপ করা সম্ভব হইত না,—in my case, it would be like a lamb before the sacrificial post," অর্থাৎ,—বলির পূর্ব্বে যূপকাষ্ঠের সম্মুখে মেষশাবক যেরূপ নিরীহভাবে থাকে, আমি হইলে ঠিক্ সেইরূপ হইত।

অপর একদিন তিনি বলিলেন,—"হিংসার উৎপত্তি হয় কিসে? হিংসা করিয়া যদি আনন্দ না থাকিত তাহা হইলে কেহ হিংসা করিতে যাইত না। বাঘ যখন ছাগল শিকার করিতে যায় তখন ছাগল প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে। তখন তাহাকে

তাড়া করিয়া যে একটু খেলা বা স্ফূর্ত্তি হয়, অনেক সময় সেই লোভে হিংস্র জন্তুরা শিকারে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ থাকিলেও যদ্যপি সমস্ত ছাগল বাঘ দেখিলেই নির্ভীক চিত্তে স্বেচ্ছায় বাঘের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিত, তাহা হইলে বাঘের ছাগল বধ করিবার প্রবৃত্তি অল্পদিনেই রোধ হইতে পারিত। আমাদের এই গভর্ণমেণ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মারামারি কাটাকাটি করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া আছে; ঐরূপ সুবিধা পাইলেই ইহার স্ফূর্ত্তি বা আনন্দ। ইহার এই প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব বা নষ্ট করিবার একমাত্র উপায় আমাদের নির্ভীকতা শিক্ষা। তাহা হইলে মার্-কাট্ করিয়া যে আনন্দ হয়, তাহা আর ইহার থাকিবে না; এবং মারামারির পথ বন্ধ হইলে বাধ্য হইয়া ইহাকে লোকমতের অধীন হইয়া চলিতে হইবে।”

অন্য সময় অপর এক ব্যক্তিকে মহাত্মাজী বলিলেন—“শুনিয়াছি, সাপ যদি একবার দংশন করে তাহা হইলে তাহার আর বিষ থাকে না। সেইরূপ আমাকে দংশন করিয়া আমার উপর সমস্ত বিষ ঢালিয়া গভর্ণমেণ্ট যাহাতে নির্ব্বিষ হইয়া যায়, তাহার জন্য আমি প্রস্তুত হইতেছি।”

গুজরাত বিদ্যাপীঠের কোন অধ্যাপক আসিয়া মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করিলেন—“বাপুজী, আপনি অহিংস প্রতিরোধের পন্থা কি করিয়া আবিষ্কার করিলেন? জগতের কোথাও তো হিংসা-শূন্য বিরোধের নজির পাই না। কোন্ ঘটনা বা কোন্ পুস্তক

হইতে এই অহিংস পন্থার কথা আপনার প্রথমে মনে হইল ?”

কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া মহাত্মাজী উত্তর করিলেন—“দক্ষিণ আফ্রিকাতে যখন সেই পাঠান কর্ত্তৃক আমি আহত হইয়াছিলাম, তখন এই কথা প্রথম আমার মনে উদয় হয়।”

অধ্যাপক—“ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতেছে। কেহ যদি আমাকে প্রহার করে, আমারও তাহাকে প্রহার করিয়া প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি হয়। কেহ যদি আমার অনিষ্ট করে, কি করিয়া আমি তাহার ইষ্ট চিন্তা করিব ? তখন প্রতিশোধ লইতে পারিলেই আমার সুখ। আমি কিরূপে দুঃখের বোঝা বহন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব? “ঈশ্বরোঽহম্ অহং সুখী”—এই প্রকার ভাবই তো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক মনে হয়।”

মহাত্মাজী বহুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যাপক মহাশয়ের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া এই উত্তর করিলেন—“তোমার এই প্রকার মনে হয়, তাহার কারণ তোমার বড় অভিমান। আমার সেইরূপ অভিমান নাই, তাহাতেই আমার চিন্তার প্রণালী স্বতন্ত্র।”

অপর একদিন মহাত্মাজী বলিলেন—“আমি আমার সব “জোশ্” সঞ্চয় করিতেছি।” তিনি “রোষ” এবং “জোশ্” এই দুইটি শব্দ পৃথক্ অর্থে ব্যবহার করেন। তন্মধ্যে “রোষ”, অর্থাৎ সাধারণ ক্রোধ, রাজসিক বৃত্তি; ইহার সংযম দরকার। কিন্তু “জোশ্” সাত্ত্বিক তেজ; ন্যায় ও সত্যের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা।

স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে স্বার্থপর লোকের মনে যেরূপ রোষের সঞ্চার হয়, সেইরূপ সত্য অসত্য বিচার করিয়া, অসত্য নিরসনের জন্য হৃদয়ে যে তেজের উদ্ভব হয়, তাহাকে তিনি "জোশ্" বলিয়া থাকেন।

১৪ই অক্টোবার।—বম্বে হইতে আমাদের সঙ্গে আশ্রমে মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব আসিয়াছেন। মালাবারের মোপ্লা বিদ্রোহের সময় মোপ্লারা অনেক হিন্দুকে বলপ্রয়োগে মুসলমান করাতে, মৌলানা সাহেব তাহার বিরুদ্ধে এক উর্দ্দু ইস্তাহার লিখিয়াছেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে আমার দ্বারা উহার ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া লইতে বলিয়াছেন। মহাত্মাজী বলিয়াছেন—"কৃষ্ণদাস সব ঠিক করিয়া দিবে, মৌলানার কোন ভয় নাই।" প্রকাণ্ড ইস্তাহার, তাহার উপর দুর্ব্বোধ্য উর্দ্দু। শব্দের আড়ম্বরের মধ্যেই আমার পথভ্রম হইবার উপক্রম হইয়াছে, এবং কি করিয়া উহার সার কথা উদ্ধার করিব, তাহাই ভাবিতেছি।

মৌলানা সাহেবের লেখা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, আজ আমি মহাত্মাজীর নিকট যাইতে বড় অবসর পাই নাই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বাহির হইতে দেখিয়া আসিয়াছি যে তিনি বহু লোক পরিবৃত হইয়া নিজকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সন্ধ্যা ছয়টার সময় ভোজনান্তে বাসন পরিষ্কার করিতেছি, এমন সময় সুরেন্দ্রজী আসিয়া আমাকে মহাত্মাজীর নিকট তাড়াতাড়ি যাইতে বলিলেন, এবং তিনি নিজে আমার বাসন মলিবার ভার লইলেন।

আমি ভাবিলাম, বিশেষ কোন দরকারি কাজ আসিয়া পড়িয়াছে, সেই জন্য বাসন ফেলিয়া তখনই মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি একখানা বড় রেজিষ্টরী পত্র পড়িতে দিয়া তাহার সারমর্ম্ম মুখে মুখে বলিতে বলিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ (২)

পত্রখানা একজন মুসলমান ভদ্রলোক লিখিয়াছেন। তাহাতে মহাত্মাজীকে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই পত্রের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তিনি সত্যের ভিখারী। একটা মত গ্রহণ করিলেই সত্যলাভ হয় না। সত্যের জন্য প্রয়াস করিতে হয়। সেই মুসলমান ভ্রাতা যত সহজে সত্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন, সত্য তত সহজলভ্য নহে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।" ঐ পত্রের পর তিনি আরও অনেকগুলি পত্র 'ফাইল' করিতে বলিলেন। ইহার পর আরও বলিলেন—"অনেক কাজ জমিয়াছে, তোমাকে অনেক **dictate** * করিবার আছে।" যে ভাবে কথা বলিতেছিলেন তাহাতে মনে হইল যেন তিনি অসুস্থ। আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—"হ্যা, একটু জ্বর হইয়াছে, বিশেষ কিছু নয়, সারিয়া যাইবে।" মধ্যে মধ্যে শরীরের যন্ত্রণা প্রকাশ পাইতেছিল। এমন সময় সান্ধ্য-প্রার্থনার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং তিনি প্রার্থনা স্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রার্থনার পর দেখি, সহর হইতে তাঁহার জন্য এক মোটার আসিলে, তিনি তাহাতে

---

* আমি মুখে বলিয়া যাইব, তুমি লিখিতে থাকিবে।

চড়িয়া বাহির হইলেন। দেবদাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"জ্বরগায়ে কোথায় গেলেন?" দেবদাস বলিল, "সহরে সভা আছে।" জ্বর হইয়াছে, তথাপি সভায় যাওয়া বন্ধ হইতে পারিবে না। কাল অনেক লিখিবার কাজ আছে বলিয়াছেন, তাহার উপর তাঁহার শরীর অসুস্থ, সেই জন্য হয়ত আমাকে সর্ব্বদা তাঁহার সন্নিকটে থাকিতে হইবে; আবার মৌলানা সাহেবের লেখা শেষ করিতে হইবে, এবং আমার নিজের সমস্ত কাপড় ময়লা হইয়া গিয়াছে, তাহাও সাবান দিয়া নিজের হাতেই পরিষ্কার করিতে হইবে। ইহাই এখানকার নিয়ম।

১৫ই অক্টোবার।—আজ বিশেষ কিছু লিখিবার সময় পাইলাম না। প্রাতেই মৌলানা সাহেব তাঁহার ইস্তাহারের জন্য তাগিদ পাঠাইয়াছেন। আমার তাড়াতাড়ি লিখিবার শক্তির অভাব, তাহা তিনি জানেন না। দ্বিপ্রহরে মহাত্মাজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সন্ধ্যা অবধি তাঁহার নিকট বসিয়া চিঠি, টেলিগ্রাম ইত্যাদির কাজ করিলাম। তাঁহার জ্বর বোধ হয় আজ আর নাই। কারণ আজ একটু স্বচ্ছন্দ ভাব দেখিতেছি। এই অক্টোবার মাসেই এখানে একটু শীতের আভাস পাওয়া যাইতেছে। শুনিতেছি, বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা এখানে শীত অধিক।

আজ এক ব্যক্তিকে মহাত্মাজী বলিলেন—"গুজরাতিরা ব্যবসা দ্বারা বাঙ্গলা দেশ হইতে অর্থ লুটিয়া আনিতেছে, ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত পাপ হইতেছে।" বাঙ্গালীরা ব্যবসায়-কার্য্যে

অপটু বলিয়া দিনের পর দিন বাঙ্গলার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে গুজরাতিদের প্রাধান্যলাভ হইতেছে। মহাত্মাজী তাহা পছন্দ করিতেছেন না বলিয়া মনে হইল। অপর এক ব্যক্তিকে তিনি বলিলেন—"কেহ কেহ মনে করে আমি ব্যারিষ্টারী না করিয়া বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু ব্যারিষ্টারী করিলে কি লাভ হইত? অল্পদিনেই শরীরটি নষ্ট হইয়া যাইত, এবং যে অর্থ উপার্জ্জন করিতাম তাহার দ্বারা এক "army of dependents" (এক দল পোষ্য) সৃষ্টি করিয়া যাইতাম। কিন্তু এখন যে জীবন অবলম্বন করিয়াছি, তাহার ফলে গান্ধী-পরিবারে একজনও "loafer" (বেকার) সৃষ্ট হয় নাই, সকলেই কোন না কোন কাজে পটু। অতএব কেবল ব্যবহারিক লাভ বা লোকসানের দিক্ দিয়া দেখিলেও ইহাতে লাভ ব্যতীত লোকসান কিছু হয় নাই।"

১৬ই অক্টোবর।—সমস্ত দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকিলেও, কাল হইতেই মনটা কেমন উদাস হইয়া গিয়াছে। এই অপরিচিত স্থানে আত্মীয়-পরিজন বিহীন হইয়া সর্ব্বদা লোকজনের মধ্যে বাস করিলেও আমি নির্জ্জনবাস করিতেছি। মহাত্মাজীর নিয়ম দেখিতেছি, কাজের পর কাজ দিয়া মনকে মাথা নাড়িবার সময় না দেওয়া। চরকা চালাইলেও মনকে খুব শাসনে রাখা যায়, ইহা তাঁহার বিশ্বাস। সেই জন্য যাঁহারা জীবন উন্নত ও পবিত্র করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা সাধনের সহায়-স্বরূপ চরকা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন, মহাত্মাজীর এইরূপ মত।

আজ হইতে এখানে বড় পাকশালে নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। প্যারীলালজী, স্থরেন্দ্রজী ও "বাকোবা" স্বপাকে আহার করিবেন এবং দিবসের অধিকাংশ সময় কারখানায় চরকা ও তাঁতের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। চরকা ও তাঁতের প্রসার কতদূর হইল, তাহা দেখিয়া দেশ শান্তিময় অবাধ্যতা সংগ্রামের জন্য উপযোগিতা লাভ করিয়াছে কিনা মহাত্মাজী বিচার করিবেন। এখন তিনি দেশকে যে প্রণালীতে পরিচালিত করিবেন, তাহার আদর্শ এই ভাবে প্রথমে নিজ পরিবার মধ্যে স্থাপন করিলেন। কাল সন্ধ্যার সময় আমাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি যাহা পার রান্নাঘরে সাহায্য করিও, নতুবা 'বা' একলা সমস্ত করিয়া উঠিতে পারিবে না।" আমি সমস্তই করিতে প্রস্তত আছি বলিলাম। ইহার পর স্থতা কাটিতেছি কিনা, এবং শরীর কেমন আছে, এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আজ এখন (বৈকালে) মহাত্মাজী আশ্রমে নাই—গুজরাত বিদ্যাপীঠে গিয়াছেন। সেই জন্য আমার এখন অবসর আছে। আমি আজকাল আর তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্ট লিখি না। তিনি সর্ব্বত্রই এখন গুজরাতিতে বক্তৃতা দেন, তাহা সামান্যই বুঝিতে পারি; আমার অনেক সভাতে যাওয়াও প্রয়োজন হইতেছে না। এখানকার সকল লোকই তাঁহার আত্মীয়; হুকুম তামিল করিবার লোকের অন্ত নাই। সেইজন্য দেবদাস অথবা আমার মহাত্মাজীর সঙ্গে চলাফেরা দরকার হইতেছে না। আশ্রমে আসিয়া অবধি দেখিতেছি, প্রায় প্রতিদিন সান্ধ্য-প্রার্থনার পর কোন না

কোন সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মহাত্মাজী (আমেদাবাদ) সহরে যাইতেছেন।

১৮ই অক্টোবার।—সকালে ঠিক ৪টায় সময় নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া প্রার্থনার জায়গায় সকলের বসিবার বিছানা প্রস্তত করিয়া দিয়াছি। প্রার্থনার পর সকালে দেড় ঘণ্টা কাল সূতা কাটিলাম। গতকল্য সন্ধ্যার পর মহাত্মাজীর ঘরে তাঁহারই নিকট রাত্রি ৯॥ টা অবধি বসিয়াছিলাম। কাল তাঁহার মৌনবার ছিল, সেই জন্য তাঁহার নিকট থাকা দরকার হইয়াছিল। তিনি সমস্ত সময়ই কি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আজ প্রাতে তাহা সংশোধন করিলেন, এবং "ইয়ং ইণ্ডিয়া" আপিসে উহা পাঠাইয়া দিবার জন্য আমার হাতে দিলেন। দেখিলাম, সমস্তই এক সপ্তাহের 'নোট' অর্থাৎ ছোট ছোট মন্তব্য। তাহার পর কতকগুলি খবরের কাগজ দিয়া তাহাতে কি আছে দেখিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে দেখাইবার মত কিছু থাকিলে উহা cutting করিয়া অর্থাৎ কাটিয়া দিতে বলিলেন। মাদ্রাজের রাজগোপালাচারীজীকে একখানা পত্র দিতে বলিলেন; ইহা ছাড়া চিঠিপত্রের কাজও কিছু দিয়াছেন। ইহার উপর রান্নাঘরের খুঁটিনাটি কাজ মধ্যে মধ্যে করিতেছি। দেবদাস আমাকে রান্নাঘরের বিশেষ কিছু করিতে দেয় না। পরিশ্রমসাধ্য সমস্ত কাজ নিজেই করিয়া থাকে। তবে অল্পে অল্পে দেখিতেছি, মহাত্মাজীর বাসন মাজা, ফল ছাড়ান, আহার্য্য সামগ্রী ঠিক করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া, এই সকল সেবার কার্য্য আমার হাতে আসিয়া পড়িতেছে।

তাঁহার এই প্রকার সেবা করিতে পারিয়া আমি পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছি। মৌলানা সাহেব আবার এক ইস্তাহার লিখিয়া আমাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে দিয়াছেন। সুপণ্ডিত বিচক্ষণ মৌলানা সাহেব কোন কাজ 'পাক্ এবং কোন কাজ না পাক্' এই বিচারেই ব্যস্ত। অনেক স্থলে তাঁহার সামান্য বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার দেখিয়া আমাদের পূর্ব্বতন নৈয়ায়িকদিগের 'তাল ঢিপ্ করিয়া পড়ে', না 'পড়িয়া ঢিপ্ করে', এইরূপ বিচারের কথা স্মরণ হয়।

১৭শে অক্টোবার।—শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত বম্বেতে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি প্রণাম করিতেই পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় তিনি আমার প্রতি ব্যবহার করিলেন। তাঁহার সহিত কি কি কথা হইয়াছিল এখন সব মনে নাই। তবে তিনি মহাত্মাজীর জীবনের বিশেষত্ব কি, তাহা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম যে সাধারণ লোকের কার্য্য ও মহাত্মাজীর কার্য্য,—এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য অনেক। একটা জিনিষ দেখিয়াছি যে, এই ব্যক্তি আপনার, ঐ ব্যক্তি পর, এরূপ ভাব তাঁহার মোটেই নাই। এমন কি নিজের স্ত্রী-পুত্রের পক্ষেও মহাত্মাজীকে আপনার জ্ঞানে জোর করিয়া তাঁহার উপর বিশেষ কোন দাবি বসাইবার উপায় নাই। তিনি যেন সকলেরই এবং সকলেই তাঁহার চক্ষে সমান। সাধুব্যক্তিদের পক্ষে এইরূপ হয় ইহা পুস্তকে পড়িয়াছি; কিন্তু মহাত্মাজীর জীবনে

প্রতিদিন নানা ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি।

কাল সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার ঘরে যাইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে তিনি ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহার নিকট অনেক চিঠি জমিয়াছিল। নিজেই অনেক চিঠির উত্তর দিয়াছেন। তাহার উপর, "ইয়াং ইণ্ডিয়া"র জন্য সমস্ত দিন প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনিও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাকে কয়েক-খানা পত্র দিয়া কি ভাবে তাহার উত্তর লিখিতে হইবে মুখে মুখে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। উত্তরগুলিতে তাঁহারই সহি থাকিবে অথচ আমাকে লিখিয়া দিতে হইবে। এইরূপে রাত্রি ১০ টা অবধি তাঁহার নিকট বসিয়া যাহা যাহা বলিলেন, করিলাম। তাহার পর অনেকগুলি রিপোর্ট আমার হাতে দিয়া তাহার সারাংশ তখনই মুখে মুখে বলিতে বলিলেন। যে পত্রগুলির জবাব আমাকে লিখিতে দিয়াছেন, তাহা যদি তাঁহার মনোমত করিয়া লিখিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার পরি-শ্রমের অনেক লাঘব হইবে। এই ভাবিয়া উৎসাহ হইতেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষমতার অল্পতা ও কার্য্যের গুরুত্ব চিন্তা করিয়া ভয়ও পাইতেছিলাম। অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশের এক ধরণ মহাত্মাজীর আছে, তাহা অনুকরণ করা সহজ নহে। তার উপর ইংরাজির শুদ্ধি-অশুদ্ধি আছে। যাহা হউক, আজ কতকগুলি চিঠি লিখিয়া দিয়াছি, এবং তিনি সমস্তগুলিই বিশেষ

কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া সহি করিয়া দিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমার শঙ্কা কথঞ্চিৎ দূর হইয়াছে। তাহার পর পুরাতন "ইয়াং ইণ্ডিয়া" ও "টাইম্‌স্ ইয়ার বুক্" হইতে reference (জ্ঞাতব্য বিষয়) বাহির করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহা দিয়াছি। এইরূপ সাহিত্যিক অনুসন্ধান কার্য্য শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য "dawn" (ডন্) পত্রিকা সম্পর্কে অনেক করিয়াছি, সেই জন্য তাহাতে ভয় পাই না। কিন্তু মহাত্মাজীর হইয়া পত্রের জবাব দিতে ভয় করে। নিজের নাম দিয়া চিঠি লেখা অন্য কথা।

আমরা ৩০শে অক্টোবার দিল্লী যাইব, এইরূপ কথা শুনিতেছি। সেখানে ৪ঠা নভেম্বর অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটির সভা হইবে। দিল্লী হইতে দুই একদিনের জন্য লাহোর যাওয়া হইবে। মহাত্মাজীর এখন অন্য কোন স্থানে যাইবার ইচ্ছা নাই। তিনি গুজরাতকেই কেন্দ্র করিয়া কাজ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। গুজরাত হইতেই একটা নূতন কাণ্ড আরম্ভ করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। এখানকার কোন্ জেলায় কিরূপ কাজ হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিতেছেন এবং গুজরাতকে তাঁহার কার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য 'নবজীবনে' নূতন নূতন ভাবে প্রতি সপ্তাহে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। যাহা হউক, এখন গুজরাতের বাহিরে পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, লালা লাজপত রায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়পূর্ণ এক তার পাইয়া তাঁহাকে দুই দিনের জন্য লাহোর যাইতে স্বীকৃত হইতে হইয়াছে।

প্রত্যহ ২।৩ স্থান হইতে টেলিগ্রামে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিতেছে, কিন্তু তিনি সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

২০শে অক্টোবার।—সকাল ৬॥টা—আজ প্রাতে চরকার কাজ না করিয়াই লিখিতে বসিলাম। কারণ কিছু দরকারি কথা লিখিবার আছে। আজ সকালে প্রার্থনার পর মহাত্মাজী অনেকক্ষণ উপদেশ দিয়াছেন। আমি গুজরাতি কিছু বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি একজন আশ্রমবাসীর ও আমার নাম উল্লেখ করিতেছিলেন। সেইজন্য উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার বক্তব্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পরে অপর এক আশ্রমবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সারমর্ম্ম যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিতেছি। মহাত্মাজী ৪০ মিনিটের অধিক কাল উপদেশ দিয়াছিলেন, আশ্রমবাসী আমাকে তাহা ভালরূপ বুঝাইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মোট কথা, আমি যাহা বুঝিতে পারিয়াছি লিখিলাম।

মহাত্মাজী প্রথমে বলিলেন—"সকালে ৪টার সময় নিদ্রা-ভঙ্গের পরই আমার চিত্তে দুইজনের কথা উদয় হইল, এক 'ক' (নাম বুঝিলাম না), দ্বিতীয় 'কৃষ্ণদাস'। 'ক' প্রার্থনায় উপস্থিত আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। উপস্থিত নাই শুনিয়া একটু মৌনী হইলেন। তাহার পর বলিলেন 'ক'-এর চিত্ত সর্ব্বদাই দুঃখপূর্ণ, কিন্তু তাহাকে যে কাজ করিতে দেওয়া যায়, তাহাই বিনাবাক্যে সে করিয়া যায়। কি যে তাহার চিন্তা তাহা সে মন খুলিয়া বলে না। অথচ সে আশা করে যে আমি

(মহাত্মাজী) সমস্ত বুঝিয়া লইব। আমাকে চারিদিকের ব্যাপার লইয়া যেরূপ সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহাতে আমার নিকট আসিয়া সমস্ত খুলিয়া না বলিলে, প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে। সেই জন্য কি প্রকারে যে 'ক'এর দুঃখ দূর করিব তাহা বুঝিয়া উঠিতেছি না। অপর কেহ যদি আমাকে তাহার দুঃখের কথা বলিয়া দেয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তাহার পর মহাত্মাজী বলিতে লাগিলেন, আমার যখন গ্রেপ্তার সম্বন্ধে নানারূপ গুজব উঠিয়াছিল, তখন বলিয়াছিলাম যেন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার পর অনেকে আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন—গত পরশ্বও কেহ কেহ আসিয়া বলিয়াছেন, যে 'নবজীবন' ও 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'র জন্য যেন আমি চিন্তা না করি, তাঁহারা আমার অভাবে এই দুই কাজ সুন্দররূপে পরিচালনা করিতে পারিবেন। 'নবজীবন' সম্বন্ধে আমি কিছু বিচার করিতেছি না, কিন্তু 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' আমি যে ভাবে লিখিতেছি, তাহা রক্ষা করা সহজ হইবে বলিয়া বিবেচনা করি না। তবে কেহ যদি এখন হইতে সেই কাজ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আমি কিছু কিছু শিক্ষা দিয়া যাইতে পারি। প্যারীলাল ও কৃষ্ণদাসকে আমি এই কাজের জন্য মনোনীত করিয়াছি। আমরা যত লোক আশ্রমে আছি, প্রত্যেকের এক একটা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া তাহাতে বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার। আমার

অবস্থা আগামী জানুয়ারী মাসে যে কি হইবে কিছুই বলা যায় না। যদি স্বরাজ আমাদের লাভ হইয়া যায়, তাহা হইলেও যে আমাদের কাজ শেষ হইল তাহা নহে; বরং তাহাতে কাজের আরও বৃদ্ধি হইবে। কারণ দেশের এমন তামসিক অবস্থা দেখা যায় যে দেশবাসীকে জাগ্রত রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই নানা প্রকার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। আর যদি স্বরাজ লাভ না হয়, তাহা হইলেও তোমাদিগকে আশ্রম পরিচালনের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া এক এক জনকে এক এক বিভাগের ভার লইতে হইবে। কারণ স্বরাজ না হইলে আমার যে কি হইবে তাহা এখনও বলিতে পারি না। হয়ত জেলে যাইতে হইবে; আর না হয়, শরীরের উপর এমন একটা চোট্ (shock) লাগিবে যে তাহাতে দেহান্তও হইতে পারে। সেইজন্য এখন হইতে তোমরা আমার অভাবে কে কিরূপ কাজ করিবে বিচার করিয়া লও, এবং আমাকে যাহার যে প্রশ্ন করিবার আছে তাহা করিয়া লও।"

ইহার পর মহাত্মাজী আশ্রমের নিয়মাদি প্রতিপালন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন, এবং প্রাতের প্রার্থনায় অনেকেই যোগ দিতেছেন না, সেইজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মহাত্মাজীর এই উপদেশ প্রদানের পর হইতে আশ্রমে খুবই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক এখানে ওখানে একত্রিত হইয়া সেই বিষয়ই আলোচনা করিতেছে। তিনি যেন সকলের নিকট বিদায় লইতেছেন, ইহা ভাবিয়া সকলের মুখ মলিন এবং চিন্তাভারগ্রস্ত দেখিতেছি।

বেলা প্রায় ৩টার সময় অধিক পরিশ্রমের ফলে অবসন্ন হইয়া মহাত্মাজী বিশ্রামের জন্য একটু শয়ন করিলেন। আমাকে মাছি তাড়াইতে বলিলেন। হুকুম দিবার সময় এত দ্রুত কথা বলেন যে, কি বলিলেন বুঝা মুস্কিল। আমি পাখা লইয়া মাছি তাড়াইতে লাগিলাম। এইরূপ হুকুম তিনি প্রায়ই করেন না। আশ্রমে আজকাল খুব মাছি হইয়াছে, এবং তাহাদের উপদ্রব খুব বেশী হইলেও তাহা সহ্য করাই মহাত্মাজীর অভ্যাস। সেইজন্য কখনও কখনও নিজেরাই অগ্রসর হইয়া মাছি তাড়াইয়া থাকি। রাত্রি ৮টার সময় তিনি শয়ন করিলেন। আমিও তখন পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু আমাকে বলিলেন—"তেল মালিস্ কর।" রাত্রিতে শয়নের পর তাঁহার মাথায় ও পায়ে তেল মাখান হয়। আমি তখনই তেল আনিয়া মাথায় ও কপালে মালিস করিতে লাগিলাম, কিন্তু মধ্যে দুইবার ইঙ্গিতে বুক দেখাইয়া দিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি মাথায় তেল মালিস করিতে লাগিলাম, তিনিও আর কিছু বলিলেন না। এমন সময় 'বা' সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মহাত্মাজী "ছাতি" (বুক) শব্দ উচ্চারণ করিলেন। 'বা' তখন আমাকে বলিলেন যে মাথায় আর তেল দিতে হইবে না। তাহার পর আমাকে শুইতে যাইতে বলিলেন এবং তিনি নিজে মহাত্মাজীর বুকে তেল মালিস করিতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ নিকটে বসিয়া রাত্রি ৯টার সময় আমার কক্ষে আসিয়া নিদ্রা যাইলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিদায়-গ্রহণের উদ্যোগ (৩)

২১শে অক্টোবার।—কাল সন্ধ্যা ৯টার সময় শুইয়াছিলাম, সেইজন্য আজ রাত্রি ৩টার সময় শয্যা ত্যাগ করিতে পারিয়াছি। আজ কাল দেখিতেছি ৬ ঘণ্টার অধিক নিদ্রার প্রয়োজন হয় না। উঠিয়া দেখি, শুভ্র জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি যেন হাসিতেছেন। তখনও আশ্রমের সকলেই নিদ্রিত। দূরে নদীর উপকূলে আমেদাবাদ সহরের শ্মশান। কে এক ব্যক্তি সেই গভীর রাত্রিতে সংস্কৃত স্তব পাঠ করিতে করিতে শ্মশানের ঘাটে স্নান করিতেছিলেন। আমি উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রার্থনার স্থানে উপস্থিত হইলাম, এবং দেশের কথা, আন্দোলনের কথা ও মহাত্মাজীর কথা আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। আন্দোলন সফল না হইলে মহাত্মাজীর দেহান্ত হইতে পারে, এই কথা যে দিন শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় শুনিলেন, তখন হইতে প্রাণপণ করিয়া মহাত্মাজীর দৈহিক সেবা করিবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ আমাকে উৎসাহ দিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস, অকপট ও নিঃস্বার্থ সেবা লাভ হইলে, মহাত্মাজীর অন্তর কখনই শরীর ত্যাগের প্রতি একাগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু ঐরূপ সেবা করি-

বার অধিকার ও শক্তি ভগবান কি আমাকে দিয়াছেন ? এই সমস্ত চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম মহাত্মাজী নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তিনি যে খোলা বারান্দায় শয়ন করেন তাহা প্রার্থনার স্থান হইতে দেখা যায়। আমি দূর হইতে দেখিলাম, তিনি উঠিয়াই এক ঝাড়ু হাতে করিয়া নিজের বসিবার ঘর ঝাঁট্ দিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমি দৌড়িয়া গিয়া ঝাঁটাখানা চাহিলাম। তিনি আমাকে উহা দিলেন এবং আমি ঝাড়ু দিতে আরম্ভ করিলে, নিজেই বসিবার বিছানা করিয়া লইলেন। বিছানা প্রস্তুত হইলে তিনি তখনই ব্যস্তভাবে কি লিখিতে বসিয়া গেলেন। আজ কাল প্রার্থনার সময় ৫টা হইতে ৫৷৷টা হইয়াছে; তখন আসিয়া তিনি প্রার্থনায় যোগ দিলেন। সাড়ে ছয়টার সময় চারিদিক্ ফরসা হইলে আমি তাঁহার নিকট পুনরায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইতেই বলিলেন—"কাল হইতে সকাল ৪টার সময় বসিবার ঘর পরিষ্কার করিয়া বিছানা করিয়া রাখিও।" আমি তাহা করিব বলিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল আমি প্রার্থনার সময় যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা বুঝিয়াছ কি ?" আমি বলিলাম, "বুঝিতে পারি নাই, তবে অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আপনি 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'র কাজের জন্য আমাকে শিক্ষা দিতে চাহেন।" তিনি বলিলেন, "না, কেবল তোমাকে নয়, প্যারীলালকেও আমি শিক্ষা দিতে চাই। আরও কয়েকজনকে কিছু কিছু করিয়া লিখিতে বলিয়াছি। তুমিও আজ হইতে প্রত্যহ কিছু

কিছু লিখিয়া আমাকে দিবে। আমার অনুপস্থিতিতে কাজ কিরূপ চলিতে পারে তাহা আমি দেখিতে চাই। আজকাল 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'র যথেষ্ট প্রভাব। উহা দ্বারা খুব কাজ হইতে পারে। সেই জন্য আমার ইচ্ছা, আমি উপস্থিত না থাকিলেও কাজ কিরূপ চলিবে তাহা যতটা সম্ভব ইতিমধ্যে দেখিয়া লইব।"

আমি বলিলাম,—"আপনি যে ভাবে 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' পরিচালন করেন, উহা যে অপর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইবে তাহা আমার মনে হয় না। আপনার অন্তর হইতে যে সমস্ত কথা বাহির হয়, তাহার স্বতন্ত্র মূল্য আছে। অপরে সেই কথাগুলি প্রকাশ করিলেও, তাহা সেইরূপ আদৃত হইবে না। আমার বিবেচনাতে আপনার বাক্যে শক্তি আছে। আমি ইহাও বলিলাম,—আপনি আমাকে যে প্রকার আদেশ করিলেন, আমি তাহা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিব। কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মানুষের power of assimilation (গ্রহণশক্তি) এবং power of origination (নূতন তথ্যের আবিষ্কারশক্তি), এই দুই শক্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। আমি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বহুকাল থাকিয়া চিন্তারাজ্যের অনেক কথা শুনিয়াছি, সেইজন্য চিন্তারাজ্যের কোন কথার আলোচনা হইলে, তাহা বুঝিয়া লইবার ক্ষমতা আমি কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি। কিন্তু নূতন সমস্যা উপস্থিত হইলে উহা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার যে শক্তি তাহা এখন আমার নাই, এবং সেই সম্বন্ধে আমার সেরূপ আত্ম-প্রত্যয় নাই। এতদ্ব্যতীত আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি

যে আপনি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের "The call of Truth" (সত্যের আহ্বান) প্রবন্ধের উত্তরে তাহাতে যতটুকু সত্য দেখিতে পাইয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়া অসত্যকে আক্রমণ করিয়াছেন। আমাদের সেইরূপ করা দুঃসাধ্য। আমাদের অন্তরে কখনও আসক্তি, কখনও বিরক্তি প্রবল ভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে, এবং সচরাচর তাহারই স্রোতে আমরা চালিত হইয়া থাকি। এই নিমিত্ত সর্ব্বদা সত্য ও অসত্য পৃথক্ করিয়া আমরা দেখিতে পারি না।"

এই সকল কথা শুনিয়া মহাত্মাজী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু প্রযত্ন কর, চেষ্টা করিতে করিতেই বিচার-শক্তির বিকাশ হইবে। জগতে চিরন্তন মূল সত্য দুই চারিটীর অধিক নহে; আর সমস্তই দেশ-কাল-ভেদ অনুসারে সেই সত্যের প্রয়োগ মাত্র। মূল সত্য যাহা, তাহা আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে; কিন্তু 'ব্যবহারিক' সত্য দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন আকার ধারণ করিবে। সেই জন্য যতই তুমি সেই মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততই তোমার "originality" বা "intuition" (স্বাধীন চিন্তা বা সত্য লাভের শক্তি) স্বতঃই অর্জ্জিত হইবে। আমি বাল্যকাল হইতে সত্য এবং অসত্যকে পৃথক্ করিয়া দেখিবার তালিম পাইয়াছি, সেইজন্য ঐরূপ বিচার আমার পক্ষে এক প্রকার স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসত্যের মধ্যেও সত্যের কণিকা পাইলেও আমি তাহার

মর্য্যাদা দিতে পারি। সত্যই আসল বস্তু, সত্যই অহিংসা; একই পদার্থের "positive aspect" (ভাবাত্মক দিক্) সত্য; আর "negative aspect" (অভাবাত্মক অবস্থা) অহিংসা; এক সত্যের মধ্যে সমস্তই রহিয়াছে। অহিংসার পৃথক্ প্রচারের কোন প্রয়োজন নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী বলিয়া আমি পৃথক্ভাবে অহিংসার প্রচার করিতেছি। সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে অহিংসা স্বতঃই লাভ হয়।" ইহার পর পুনরায় তিনি আমাকে 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'র জন্য প্রত্যহ কিছু কিছু লিখিতে বলিলেন। লেখাতে যদি কিছু গ্রহণ করিবার থাকে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, অপর গুলি প্রত্যাখ্যান করিবেন। যাহা আদেশ করিলেন তাহা যে প্রকারে হউক্ আমাকে করিতেই হইবে। ইতঃপূর্ব্বে দেশের বিষয়ে যাহা ভাবিতাম তাহা একরূপ; কিন্তু এবার মহাত্মাজীর সঙ্গে ভারতের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া ভিতরের কেমন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। এখন দেশের সত্তা যেন নূতন ভাবে অনুভব করিতেছি। নিজের স্কন্ধে দায়িত্ব লইয়া পূর্ব্বে কখনও কোন বিষয় চিন্তা করি নাই, কিন্তু এখন সাধ্যানুরূপ তাহাও করিতে হইবে।

২২শে অক্টোবার।—আজ প্রাতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জী আশ্রমে আসিয়াছেন, এবং আসিয়াই বাপুজীর সহিত গোপনে দুই ঘণ্টা কাল কি কথা কহিতেছেন। মালবীয়জী যখন আসিলেন তখন বাপুজী নিজের কক্ষে ছিলেন না। তিনি কোথায় গেলেন বুঝিতে না পারিয়া আমি তাঁহার জন্য ছুটা-

ছুটি করিতে লাগিলাম। আশ্রমে যাঁহারা সপরিবারে থাকেন, তাঁহাদের জন্য একটু দূরে দুই সারি 'ব্যারাকের' মত কোঠা আছে। সেই স্থানে যাইয়া দেখি তিনি এক এক পরিবারের গৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই সেই গৃহের লোকদিগের সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমার ধারণা হইল মহাত্মাজী ঐ ভাবে যেন আশ্রমবাসীর নিকট বিদায়-গ্রহণ করিতেছেন। ঐ অবস্থায় তাঁহাকে আমি মালবীয়জীর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলাম; তখন তিনি তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। মালবীয়জী তাঁহার সেই ফকিরের বেশ দেখিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"আপ্ নে এ ক্যা সুরু কিয়া?" এবং প্রীতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাত্মাজীর হস্তধারণ করিলেন। তাহার পর মহাত্মাজীর কামরায় দুই জনে গোপনে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। একবার আমি দূর হইতে দেখিলাম মালবীয়জীই অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, এবং মহাত্মাজী ধীরভাবে তাহা শুনিতেছেন। বেলা ১২॥টা হইল এখনও তাঁহাদের কথা চলিতেছে। মালবীয়জীর সহিত তাঁহার পুত্র গোবিন্দ আসিয়াছেন। তিনি দেবদাসকে বলিয়াছেন যে বড়লাট রেডিং সাহেব তাঁহার পিতাঠাকুরকে কি সব কথা বলিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য পণ্ডিতজী আসিয়াছেন। গোবিন্দ মালবীয় নাকি ইহাও বলিয়াছেন,—"I am absolutely certain father will be able to satisfy Mahatmaji," অর্থাৎ আমার ধ্রুব বিশ্বাস, পিতাজী

মহাত্মাজীকে তুষ্ট করিয়া সম্মত করিতে পারিবেন। ব্যাপার কি কিছুই বুঝিলাম না। তবে মহাত্মাজীর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে কোন কথা বড় লাট রেডিং বলেন নাই, তাহাতে মনে হয় গ্রেপ্তার এখন হইবে না।

২৩শে অক্টোবার।—আজ প্রাতে মহাত্মাজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছ কি না?" আমি বলিলাম "না"। তাঁহার আদেশ রক্ষা করিতে না পারিয়া চিত্ত চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। আমার ক্ষমতা কত অল্প তাহা আমিই জানি। অথচ আজও প্রাতে প্রার্থনার পর "ইয়াং ইণ্ডিয়া"র কথা উঠিলে তিনি পুনরায় সেই সম্পর্কে আমার নাম করিলেন। একে ভাষাজ্ঞান পরিমিত, তাহার উপর বিষয় দুরূহ। স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি কিরূপে লাভ করিব, এই ভাবনাতে আমি অস্থির হইয়াছি।

২৪শে অক্টোবার।—মালবীয়জী আমাদের সহিত আশ্রমের দৈনন্দিন কার্য্য-পদ্ধতিতেও যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ। তথাপি গতকল্য ৪টার সময় নিদ্রাভঙ্গের ঘণ্টা বাজিলে তিনি আশ্রমের প্রার্থনার স্থলে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মহাত্মাজী মালবীয়জীকে আচার্য্যের আসন দিয়া নিজে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনা করিলেন এবং প্রার্থনার পর মালবীয়জীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মোপদেশ দান ব্রাহ্মণের জাতিগত অধিকার। মালবীয়জী বহুক্ষণ নানাবিধ উপদেশ দিলেন। তিনি গতকল্যই আশ্রম ত্যাগ করিয়া সহরে চলিয়া গিয়াছেন।

আজ সকালে "Under Swaraj" (আন্ডার স্বরাজ) নাম দিয়া এক প্রবন্ধের অনেকটা লিখিয়া ফেলিয়াছি। আজ সোমবার, মহাত্মাজী মৌনী আছেন। ঐ দিন তাঁহার নিকটে আমাকে থাকিতে হয়, কিন্তু লেখাতে নিযুক্ত ছিলাম বলিয়া আমি অধিক সময় তাঁহার নিকট ছিলাম না। ৩টার সময় দেবদাসকে পাঠাইয়া আমাকে তিনি ডাকিলেন, এবং আজাদ সোবানী সাহেব মালাবার মোপ্‌লাদের সম্বন্ধে যে দ্বিতীয় উর্দ্দু manifest বা ইস্তাহারের ইংরাজি করিতে দিয়াছেন, তাহার কতদূর হইয়াছে দেখিতে চাহিলেন। মৌলানা সাহেবের প্রথম ইস্তাহারটি মহাত্মাজী তেমন পছন্দ করেন নাই বলিয়া দ্বিতীয়টির জন্য আমি অধিক পরিশ্রম করি নাই। আমি সেই কথা বলিলে তিনি লিখিয়া দিলেন,—"উহাকে ছোট করিয়া একটি প্যারাগ্রাফ্ (paragraph) কর।" তাহা করিয়া দিলাম। আমি সমস্ত দিন অধিকক্ষণ কেন তাঁহার নিকটে যাই নাই তাহা বুঝাইবার জন্য "Under Swaraj" প্রবন্ধটি যতটা লিখিয়াছি তাহা এবং চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতির গ্রেপ্তার সম্বন্ধে একটি প্যারাগ্রাফ্ লিখিয়াছিলাম তাহা—এই দুইটী লেখা দেখিতে দিয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে লিখিয়া দিলেন—"Under Swaraj" is shaping itself all right. You should finish it. The Chittagong note is not bright enough and is somewhat censorious"—অর্থাৎ "তোমার 'আণ্ডার্ স্বরাজ' প্রবন্ধটি বেশ গড়িয়া

উঠিতেছে, ইহা তুমি সম্পূর্ণ করিয়া ফেল। চট্টগ্রাম ব্যাপারের ছোট মন্তব্যটি তেমন প্রাঞ্জল হয় নাই, এবং উহাতে কিঞ্চিৎ দোষদর্শিতার ভাবও দৃষ্ট হয়।" আমি বলিলাম "আওয়ার্ স্বরাজ" প্রবন্ধটী আর এক প্যারাগ্রাফ্ লিখিয়াই সমাপ্ত করিব মনে করিয়াছি। তাহাতে তিনি লিখিয়া দিলেন—"As it is, it does not read complete or as if it is ending with two or three sentences, but try,"—অর্থাৎ, ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা সম্পূর্ণ, কিম্বা আরও দুই চারি কথায় সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি ইহা সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা কর। আমি বলিলাম, "প্রবন্ধ বড় হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সংক্ষেপে লিখিব মনে করিয়াছিলাম, এখন না হয় বিস্তৃতভাবেই লিখিব।" মাথা নাড়িয়া তিনি আমাকে তাহাই করিতে বলিলেন।

২৫শে অক্টোবার।—"আওয়ার্ স্বরাজ" প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিয়া মহাত্মাজীকে দিয়া আসিলাম। উহা পাইয়া একটু হাসিলেন এই মাত্র। প্রতিদিন আমি কি লিখিব ইহাই এক চিন্তা হইয়াছে। ছোট প্যারাগ্রাফ লেখা কখনও অভ্যাস করি নাই, অথচ সেইরূপ লেখাই বোধ হয় তিনি অধিক আদর করেন। আমার লেখাতে কেমন একটা আড়ম্বর আসিয়া যায়, তাহাতে লেখা ভারি হইয়া পড়ে। তিনি চাহেন চাঁচাছোলা, চট্‌পটে লেখা, ইহাই মনে হইতেছে।

মালবীয়জী পরশ্ব চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মাজী পুনরায় আজ তাঁহাকে আসিবার জন্য তার করিলেন। আমেদাবাদে

কাপড়ের কলওয়ালাদিগের সহিত শ্রমজীবিদের মনকষাকষি চলিতেছে। বাপুজী শ্রমজীবিদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া কলওয়ালাদিগের সহিত একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করিতেছিলেন। পরিশেষে যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন তিনি ধর্ম্মঘটের ভয় দেখাইয়াছেন। তাহাতে কলওয়ালারা নরম হইয়া মালবীয়জীকে সালিশ মান্য করিয়াছে। এই সম্পর্কে পণ্ডিতজীকে বোধ হয় কিছুদিন আমেদাবাদে থাকিতে হইবে।

কলের শ্রমজীবী এবং মালিকদিগের বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি আলোচনা করিয়া একটু শিক্ষালাভ করা যায়। মহাত্মাজীর কলহ করিবার রীতি এক নূতন ধরণের। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ এবং চীৎকার করিয়া বাগ্বিতণ্ডা না করিলে কলহ কি হইল? বাঙ্গলা দেশে এইরূপ একটা বিরোধের কারণ উপস্থিত হইলে আমরা একটা হুলস্থূল কাণ্ড করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু এখানে দেখি, কলওয়ালা-সমিতির সভাপতি কোটিপতি মঙ্গলদাস শেঠ প্রায় প্রত্যহ আশ্রমে উপস্থিত হইতেছেন এবং যে যে বিষয় লইয়া তাঁহাদের মতদ্বৈধ, মহাত্মাজীর সহিত এক আসনে বসিয়া অতি শান্তভাবে তাহার আলোচনা করিতেছেন। দুই জন দুই বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতিনিধি; বিরোধও গুরুতর; কিন্তু কোন আগন্তুক মনে করিবেন যে দুই বন্ধু বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। এরূপ ধীর এবং ভদ্রভাবে কলহ করিতে পারা, ইহা কেবল মহাত্মাজীর বিশেষত্ব। তাঁহার এমনই প্রভাব যে অপরেও তাঁহার নিকট আসিয়া সেই শক্তির বলে শান্ত, শিষ্ট ও ভদ্র হইয়া যায়।

আজ দ্বিপ্রহরে মহাত্মাজীর কামরায় গিয়া দেখি তিনি আনন্দে নিজে নিজেই হাসিতেছেন। যাইতেই আমাকে বলিলেন—"কৃষ্ণদাস, এত টেলিগ্রাম প্রত্যহ আসে, সেই কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতাম, তাহাতে আমার বড় ক্লেশ হইত। উহার কিরূপ সদ্ব্যবহার করা যায় তাহা আমি চিন্তা করিতাম। এখন বেশ একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি ঐ কাগজ দ্বারা এক চিঠির থাম প্রস্তুত করিয়া আমাকে দেখাইলেন, এবং প্রত্যহ যত টেলিগ্রাম আসিবে, তাহা দ্বারা এইরূপ থাম প্রস্তুত করিতে বলিলেন। আমি প্রত্যহই তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং তিনিও চিঠিপত্র লিখিতে ঐ থাম ব্যবহার করিতেছেন। ইহার নাম রাখিয়াছেন "পেটেণ্ট্ থাম"। এই থাম ব্যবহার করিতে তিনি এতই আনন্দ পাই-তেছেন যে উহার পরিবর্ত্তে অতি উত্তম থাম রাখিয়া দিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। তাঁহার কত সূক্ষ্ম বিচার-দৃষ্টি তাহা এই ঘটনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। সেই দেশব্যাপী সঙ্গীন আন্দোলনের মধ্যেও তিনি কিরূপ উদ্বেগবিহীন ও শান্ত অবস্থায় থাকিতে পারিতেন এবং কি ভাবে তিনি প্রাণে স্ফূর্ত্তি পাইতেন এই ঘটনা দ্বারা তাহারও পরিচয় পাওয়া গেল।

মহাত্মাজীর রহস্যপ্রিয়তা ও স্ফূর্ত্তির অপর একটি উদাহরণ এইস্থলে দিতেছি। দেওয়ালির বন্ধ উপলক্ষে বম্বে জাতীয় বিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক আমেদাবাদ বেড়াইতে আসিয়া-ছিলেন। তাঁহারা মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে আসিয়া

ছুটির সময় কি করিবেন, এই প্রশ্ন করিলেন। মহাত্মাজী নিম্ন-লিখিত উত্তর লিখিয়া দিলেন। তিনি সেই সময় মৌনী ছিলেন।

Card, spin, weave—ধুনো, কাটো, বুনো
Spin, weave, card—কাটো, বুনো, ধুনো
Weave, card, spin—বুনো, ধুনো, কাটো

এই উত্তর পাইয়া অধ্যাপকগণ সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন। উঁহাদিগের মধ্যে একজন মহাত্মাজীর উত্তর-সম্বলিত কাগজখণ্ড স্মারক-লিপিরূপে রক্ষা করিবার জন্য লইয়া গেলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

বিদায়-গ্রহণের উদ্যোগ (৪)

১লা নভেম্বর ২টার সময় এখান হইতে ট্রেণে উঠিয়া ২রা নভেম্বর সন্ধ্যার সময় আমরা দিল্লী পৌঁছিব, এইরূপ স্থির হইয়াছে। তাহার পর বোধ হয় ২।৪ দিন পাঞ্জাবে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় আশ্রমে আসিব। মহাত্মাজী এখন গুজরাত ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে আদৌ ইচ্ছুক নহেন। কারণ এখানেই খদ্দরের প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, এবং গুজরাত-বাসীরা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা তাঁহার অহিংস-পদ্ধতিতে অধিক শিক্ষালাভ করিয়াছে। আমার মনে হইতেছে যে নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহার চরম প্রস্তাব করিয়া তিনি শেষ-যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ করিবেন। দিনের পর দিন দেখিতেছি তিনি মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া থাকেন। ভারত পরিভ্রমণ করিয়া আশ্রমে আসা অবধি প্রত্যহ দলে দলে দর্শনার্থী লোক আসিতেছিল। একাদশীর দিন অথবা অন্য পর্ব্বোপলক্ষে লোকের ভিড় বেশী হইত, এবং প্রত্যহই দু-আনি, সিকি, আধুলি হইতে আরম্ভ করিয়া এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশটাকার নোট্ পর্য্যন্ত কত যে প্রণামী পড়িত তাহা বলা

যায় না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কাজের ব্যাঘাত হইতেছিল দেখিয়া আজ কিছুদিন হইল ঐরূপ দর্শনার্থী যাত্রীর প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহাদিগকে আশ্রমের প্রবেশ-দ্বার হইতেই ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

২৬শে অক্টোবর।—পরশ্ব রাত্রি হইতে হঠাৎ অধিক শীত পড়িয়াছে। তাহাতে আমার একটু ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। দেবদাস তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে চা এবং কুইনাইন খাইতে দেয়, তাহাতে সেই ঠাণ্ডা আর নাই। আজকাল এখানে খুব জ্বর হইতেছে। জ্বরের ধরণ অনেকটা ম্যালেরিয়ার মত। আশ্রমে একজন ডাক্তার আছেন, তাঁহার সঙ্গে মহাত্মাজী জ্বরের কারণ সম্বন্ধে প্রায়ই বিচার করিয়া থাকেন। এমন পরিষ্কার শোভন স্থান, এখানে ম্যালেরিয়া আসিল কোথা হইতে? চা এবং কুইনাইনের চোটে আমার মাথাগরম হইয়া রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় নাই। তথাপি নিয়মিত যেমন রাত্রি ৩টার সময় উঠি, সেইরূপ উঠিয়াছি এবং ৪টার পূর্ব্বে মহাত্মাজীর বসিবার বিছানা ইত্যাদি করিয়া দিয়াছি। দিল্লীতে আমরা ডাক্তার আন্‌সারি সাহেবের বাটীতে থাকিব। দিল্লী হইতে মথুরা এবং পানিপথ (Panipat) যাইবারও প্রস্তাব হইতেছে। কিন্তু পাঞ্জাব-ভ্রমণ সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির হয় নাই, দিল্লীতে পৌঁছিয়া উহা স্থির হইবে।

কাল আমি লেখার কাজ মন্দ করি নাই। মহাত্মাজী কি উহা পছন্দ করিবেন? একজন বিলাত-প্রবাসী ভারতবাসী

তাঁহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রের উত্তর লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে বলিলেন। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা তিনি অনুমোদন করিয়াছেন। সেই পত্র মধ্যে যে যে স্থলে আমি "মহাত্মাজী" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তিনি সেই সেই স্থানে তৎ-পরিবর্ত্তে "মিঃ গান্ধী" লিখিয়া দিয়াছেন। অপর এক স্থানে আমি লিখিয়াছিলাম—"India can remain within the Empire, if it is consistent with her dignity and self-respect,"—অর্থাৎ, 'ভারতের আত্ম-মর্য্যাদা ও আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিলেই ভারত এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিতে পারে, নচেৎ নহে।' ইহার পরিবর্ত্তে মহাত্মাজী লিখিয়া দিলেন—"India can remain with the British if it is consistent with her dignity and self-respect,"—অর্থাৎ, 'ভারতের আত্ম-মর্য্যাদা ও আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিলেই ভারত ইংরাজদিগের সহিত একত্রিত ভাবে থাকিতে পারে, নচেৎ নহে।' সেই বিলাত-প্রবাসী ভদ্র-লোক পাঞ্জাব ও খিলাফৎ ব্যাপার গৌণ এবং স্বরাজ-সমস্যা মুখ্য, এইভাবে আন্দোলন পরিচালনের জন্য মহাত্মাজীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

৩১শে অক্টোবর।—কাল এখানে চুল কাটাইয়াছি। গুজরাতি নাপিত চুল এমন করিয়া কাটিয়া দিয়াছে যে শুনিতেছি, আমাকে আর বাঙ্গালী বলিয়া চেনা যায় না। আজ হইতে গুজরাতের নূতন বৎসর আরম্ভ হইল। দেওয়ালীর দিনে এখানে বৎসর শে

হইয়া থাকে। বিজয়ার পর আমাদের যেমন সকলের সঙ্গে দেখা শুনা ও প্রণাম সম্ভাষণ ইত্যাদি করিবার রীতি আছে, এখানেও বৎসরের প্রথম দিনে সেইরূপ করা হয়। কাল ভাবিয়াছিলাম, মহাত্মাজীকে আমিই আজ সর্ব্ব-প্রথম নূতন বৎসরের প্রণাম করিব। প্রত্যূষে ৪ টার সময় অপর দিনের ন্যায় তাঁহার বসিবার বিছানা ইত্যাদি ঠিক করিয়া দিলাম; নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমার সঙ্গেই তাঁহার প্রথম দেখা হইল, তথাপি প্রণাম করিতে কেমন লজ্জাবোধ হইল। তাহার পর প্রার্থনান্তে আশ্রমের সকলে দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গেলেন। সর্ব্বশেষে তাঁহাকে একা পাইয়া আমিও টিপ্ করিয়া এক প্রণাম করিলাম। তিনি মাথা তুলিয়া আমাকে দেখিতেই আমি নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলাম।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে যে সমস্ত সংবাদপত্রের কাটিং (cutting) বা কর্ত্তিত অংশ পাঠাইয়াছেন, তন্মধ্যে এই আন্দোলনের ফলে ম্যান্‌চেষ্টারের কাপড়ের বাজার কিরূপ টল্‌মল্ করিতেছে, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ একটি কাটিং কাল রাত্রিতে মহাত্মাজীকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। পাঠান্তে তিনি—"সব্ হোগা ভাই, সব্ হোগা।"—হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন। কলিকাতার "সার্ভেন্ট" কাগজের অপর একটি কাটিং তাঁহাকে পড়িতে দিয়াছি, পড়িয়া তিনি নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। উহাতে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের চরকা সম্বন্ধে অভিমত লেখা আছে। ডাক্তার রায় মহাশয়ের এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে

বলা যায় না। তাঁহার এক সুদীর্ঘ পত্র এখানে আসিয়াছে, তাহার প্রথমেই বড় করিয়া লেখা—"Confidential", অর্থাৎ—'গোপনীয়'।

সকালে বেলা নয়টা আন্দাজ দুই জন সাহেব ও দুই জন মেম মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কিন্তু আজ সোমবার, সেই জন্য তিনি তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগকে আশ্রম পরিদর্শন করাইবার ভার আমার উপর পড়িল। মেম সাহেবরা চরকার কাজ দেখিয়া উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। আমি তখন তাঁহাদিগকেও চরকা অভ্যাস করিতে অনুরোধ করিয়া বসিলাম। সকলেই ইহাতে হাসিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে মহাত্মাজীর ইংরাজি চিঠি-পত্রের ভার আমার উপর আসিয়া পড়িতেছে। ইহাতে আমার কাজ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। আজ কাল মোটামুটি এই নিয়মে কাজ করিতেছি। রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া নিজের প্রার্থনা ইত্যাদি করিয়া লই। পৌনে ৪টায় মহাত্মাজীর কামরায় আসিয়া তাঁহার বসিবার স্থান ইত্যাদি ঠিক করি; তাহার পর প্রার্থনার স্থানের বিছানা ও মহাত্মাজীর আসন করিয়া দিই। পৌনে ৫টা হইতে ৬টা অবধি আশ্রমের প্রার্থনা। ৬॥টার সময় মহাত্মাজীকে তাঁহার প্রাতরাশ, অর্দ্ধসের ছাগলের দুধ ও ফল দেই। এই সময় তাঁহার নিকট প্রায়ই লোকজন থাকে না বলিয়া কাজকর্ম্ম ও চিঠিপত্র সম্বন্ধে তাঁহাকে যে প্রশ্ন করা দরকার, করিয়া লই। যদি

অন্য লোক থাকে এবং তিনি কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে নিজে জলযোগ করিয়া লই। তাহার পর ৮॥ অবধি মহাত্মাজীর দপ্তরের চিঠিপত্র লিখি। ৮॥ হইতে ১ঘণ্টা পাক-শালার কাজকর্ম্ম একটু একটু করি। তাহার পর অনেক টেলিগ্রাম আসে, সেই সকলের জবাব তিনি যেরূপ বলিয়া দেন দিয়া দেই। ১১টার সময় নিজে আহার করিতে বসি। সেই সময় মহাত্মাজী অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য সূতা কাটেন। ১১॥টার সময় তাঁহার স্নানের জন্য গরমজল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখি। ১২টার সময় তিনি দ্বিপ্রহরের ভোজন করেন। তখনও সকালের মত ছাগদুগ্ধ অর্দ্ধসের, কিছু ফল এবং তদুপরি ছাগলের দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃতে ভাজা ছোট ছোট ৫।৬ খানি 'ভাকৃরি' আহার করেন। ইহার পর তিনি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল খবরের কাগজ পড়েন। এই সময় ডাকের পত্রাদি আসে। ১॥টার সময় একটু নিদ্রা যা'ন; নিদ্রাভঙ্গের পরই তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন,—"কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছি?" প্রায়ই ৩০ বা ৪০ মিনিট্ কাল তিনি নিদ্রা যান। আমি তাহা জানাইয়া দিলেই তিনি বলিয়া উঠেন—"এত্না নিদ্ হুয়া?" ৩টা হইতে ৩॥টা মধ্যে দৈনিক পত্র হইতে সেই দিনের সংবাদ দেখিয়া লই। মাদ্রাজের দৈনিক "হিন্দু" পত্র হইতে প্রত্যহ তাঁহাকে মালাবারের মোপ্লা বিদ্রোহের সংবাদ বলিয়া দিতে হয়। তদ্ব্যতীত, ১২টা-১টার সময় যে সমস্ত ডাকের চিঠিপত্র আসে, তাহার বড় বড় পত্র এবং রিপোর্ট গুলির সারাংশ আমাকে মুখে মুখে বলিতে বলেন, তাহাও বলি এবং যে সমস্ত পত্রের

জবাব আমাকে দিতে বলেন তাহা নিজের কাছে রাখি। এইরূপে ৫টা-৫॥টা অবধি কাজ চলিতে থাকে। ৩টা হইতে দর্শনার্থীর দল আসিতে আরম্ভ হয়। তাহাদের দ্বারা কামরা পূর্ণ হইয়া যায়। ৬টার সময় সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তিনি ভোজন করেন। ভোজন পূর্ব্বকার মত দুগ্ধ ও ফল। ৭টার সময় সন্ধ্যার প্রার্থনা। প্রার্থনার পর তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম হয়। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আজকাল তিনি প্রত্যহ রাত্রি ৮টার সময় মোটারে সহরে চলিয়া যান। আমি সেই সময় তাঁহার দপ্তরের কাগজ-পত্র গুছাইয়া রাখি। রাত্রি তিনটার সময় উঠিতে হয় বলিয়া আমি ৯টার মধ্যেই নিদ্রা যাই। দেবদাস এবং 'বা' তাঁহার প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকেন।
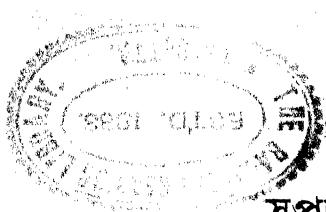
সপ্তদশ অধ্যায়

অল্‌-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস 'ওয়ার্কিং কমিটি'

(দিল্লী)

৪ঠা নভেম্বর তারিখে দিল্লীতে 'অল্‌-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি'র সভা বসিবে, সেই জন্য ১লা নভেম্বর মহাত্মাজী দিল্লী যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীমতী অনসূয়া বেন চলিয়াছেন। বরোদার বৃদ্ধ আব্বাস্‌ তায়েবজী সাহেবও একই ট্রেণে যাইবেন বলিয়া 'বার্থ' রিজার্ভ করিতে দেবদাসকে তার করিয়াছেন। সেই তারের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। মহাত্মাজী বলিলেন যে তায়েবজী সাহেব মহাত্মাজীর সহিত একই কামরায় 'বার্থ' লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। দেবদাস বলিল—"না; যদি অন্যত্র 'বার্থ' পাইবার সুবিধা না হয় তাহা হইলে মহাত্মাজীর কামরায় 'বার্থ' লইতে হইবে, এইরূপই তায়েবজী সাহেবের ইচ্ছা। তায়েবজী সাহেব ষ্টেশনে আসিয়া মহাত্মাজীর কামরায় তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিলেন, "বাপ্‌রে বাপ্‌! বাপুজী, তোমার সঙ্গে কি ভদ্রলোকে চড়ে? ষ্টেশনে ষ্টেশনে লোকের ধাক্কা সাম্‌লাইতেই দফা নিকাশ হইয়া যাইবে।" যাহা হউক্, সে যাত্রা তায়েবজী সাহেব কোন প্রকারেই সেই দুরূহ এবং অপ্রীতিকর কর্ত্তব্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না।

দেবদাস এবং আমি ব্যতীত আশ্রমের প্যারীলালজীও মহাত্মাজীর সহিত চলিয়াছেন, তিনি দিল্লী হইতে কিছুদিনের জন্য অবকাশ লইয়া পাঞ্জাবে নিজের বাটীতে যাইবেন। দেবদাস ও প্যারীলালজী পূর্ব্বেই ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন। মহাত্মাজী শেষ মুহূর্ত্ত অবধি লেখাপড়ার কাজ করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার দপ্তর গুছাইয়া লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অপেক্ষা করিতে হইল, এবং তাঁহারই সহিত আশ্রমের টঙ্গায় চড়িয়া সাবরমতি ষ্টেশনে আসিতে হইল। সেই সময় অর্দ্ধপথে আসিয়া তিনি হঠাৎ শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি সতীশ বাবুকে চিঠি-পত্র লেখ ত ?"

আমি—"আজ্ঞা হাঁ।"

মহাত্মাজী—"চরকা সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ অভিজ্ঞতা, তাহা আমাকে লিখিবার জন্য আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। এই বিষয়ে কবিবর রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহা ভিত্তিহীন, এ কথা আমি সতীশ বাবুকে বলিয়াছি। চরকা লোকের মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় কেন হইবে? গীতাতে আছে—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥" ইত্যাদি। সেইরূপ যদি প্রতিক্ষণ ভিতরে চিত্ত স্থির রাখিয়া বাহিরে কর্ম্ম করিবার অভ্যাস না হয়, তাহা হইলে স্বতঃই মনে নানা বৃত্তির ক্রিয়া হয় এবং তাহাতেই জন্ম-মৃত্যুর ধাক্কা আসিয়া যায়। সেই জন্য আমার মনে হয়, বাহিরে হাত চালাইয়া চরকার কাজ করিলেও মানসিক বা

আধ্যাত্মিক কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে না। সতীশবাবুর এই বিষয়ে কি অভিজ্ঞতা তাহা আমার জানা বিশেষ দরকার।"

আমি—"তিনি আমাকে এখনও এ বিষয়ে কিছু লেখেন নাই; তবে আপনার কার্য্যের সহিত তাঁহার সহানুভূতি আছে তাহা আমি জানি। তিনি এই আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগদান না করিলেও যথাসাধ্য আপনার কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। আপনার গ্রেপ্তার হইলে 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'র ভার কিয়ৎপরিমাণে আমার উপর দিবার ইচ্ছা আপনি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমার শক্তি কোথায়! আমি অগত্যা তাঁহাকেই লিখিয়াছি যে তাঁহাকে আসিয়া এই কার্য্যেও সাহায্য করিতে হইবে।"

মহাত্মাজী—"লিখা হ্যায়? বহুৎ আচ্ছা কিয়া।" 'বহুৎ' কথাটির উপর তিনি খুব জোর দিলেন।

আমি—"কিন্তু তিনি উহাতে সম্মত হইবেন কিনা জানি না। পূর্ব্বে তিনি অনেক দেশের কাজ করিয়াছেন। কিন্তু এখন এইরূপ প্রকাশ্যভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার নাই। তবে ভগবদিচ্ছা হইলে অন্য কথা।"

ইহার পর বাঙ্গলার স্বদেশী যুগের আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক কথা হইল। তিনি আগ্রহ-সহকারে সমস্ত শুনিতে লাগিলেন; আমিও মন খুলিয়া বলিতে লাগিলাম।

ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া মহাত্মাজী বসিলেন। দেবদাস তাঁহার নিকটে রহিলেন। প্যারীলালজী, আমি এবং কর্ণাটক প্রান্তের শ্রীযুক্ত মজলি মহাশয় স্বতন্ত্র এক স্থানে

আমাদের আসন ঠিক্ করিয়া লইলাম। পথে স্থানে স্থানে মহাত্মাজীকে দর্শন করিবার জন্য যে প্রকার লোকের ভিড় হইয়াছিল তাহার বর্ণনা আর কি করিব? পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণনা হইতেই পাঠক তাহার ছবি মনে মনে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারিবেন। পূর্ব্বে বহুবার মহাত্মাজী এই পথে যাতায়াত করিয়াছেন; তথাপি লোকের আগ্রহের নিবৃত্তি হইতেছে না। দেবদাসের মতে (লোকের ভিড় সম্বন্ধে) এই পথটি "worst line" অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা 'খারাপ লাইন'। রাজপুতানার সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মাড়বার, আজমীর, কিষণগড়, জয়পুর, আলোয়াড় প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় জনসমুদ্রের আলোড়ন দেখিয়া মনে মনে অতীতের কত সুখস্বপ্ন উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নের মত তখনই বিলুপ্ত হইল। উর্দ্দুতে এক বচন আছে, "হনোজ্ দিল্লী দূরস্ত",—অর্থাৎ দিল্লী এখনও বহুদূর; অথচ যেন দেখিতে দেখিতে ট্রেণে আমরা প্রায় ৩০ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিয়া ২রা নভেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় দিল্লীতে উপস্থিত হইলাম। তখন ষ্টেশনে জনতার ভীষণ গর্জ্জনে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল, এবং ঘূর্ণিবায়ুর মুখে বাতাহত শুষ্ক পত্রাবলি যেরূপ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে, সেইরূপ এস্থলেও জনসমষ্টি সঞ্চালিত হইতে লাগিল। সেই প্রলয়-দৃশ্যের অন্তরালে কয়েকটি বিচক্ষণ ব্যক্তি শৃঙ্খলা বিধানে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া আমরা বিনা আয়াসে আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে সমর্থ হইলাম।

দিল্লীতে মহাত্মাজী ডাক্তার আন্সারি সাহেবের অতিথি হইলেন। সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে দরিয়াগঞ্জের ১নং কুঠীতে ডাক্তার সাহেবের বাস। এখানেই সহর পূর্ব্বদিকে শেষ হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, ডাক্তার সাহেবের কুঠীর পার্শ্বেই দিল্লীর পুরাতন প্রাচীর অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় এখনও দণ্ডায়মান আছে। প্রাচীরের পর যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় উন্মুক্ত প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, এবং তন্মধ্যে কালবরণা কালিন্দী আঁকিয়া বাঁকিয়া বহুদূরে শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যমুনার কুক্ষি হইতে উদ্ভূত বলিয়া বোধ হয় সহরের এই প্রান্তের নাম 'দরিয়াগঞ্জ'।

পরদিন প্রাতে দেখিলাম, পূর্ব্বদিকের সেই দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তের মধ্য হইতে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। ডাক্তার আন্সারি সাহেবের কুঠির কিঞ্চিৎ উত্তর পশ্চিমে মোগল বাদশাহদিগের জুমা মস্জিদ্, দুর্গ ও বাসভবন এখনও পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিয়া নবনির্ম্মিত সৌধাবলীর ন্যায় অক্ষতদেহে দণ্ডায়মান। কিন্তু হায়! কোথায় আজ সেই মোগল প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য! ট্রেণে আসিবার সময় দিল্লীর সন্নিকট স্থানে স্থানে বহু জনপদ, দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ নয়নপথে পতিত হইল। তাহার পর প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সহরের পূর্ব্বদিকে সেই অনন্ত মরুপ্রান্তের ন্যায় সমভূমি দেখিতে পাইয়া মনে হইতে লাগিল,—সত্যসত্যই কি দিল্লী ভারতের মহাশ্মশান!

এ ভূমির কি মাহাত্ম্য! চিরকাল ভারতে কেন্দ্রীভূত পার্থিব শক্তি প্রাধান্য লাভ করিবার অভিলাষে দিল্লী অধিকার

করিয়া জয়-ঘোষণা করিয়াছে ; আবার দিল্লীর মাটিতেই ধীরে ধীরে তাহা প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। পার্থিব শক্তি লোক-সেবায় নিযুক্ত না হইয়া যখন লোক-নিগ্রহ অথবা ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধি বা ভোগলালসা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, তখন অচিরেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই চিরন্তন সত্যের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তস্বরূপই যেন পুরাতন দিল্লী নির্জীব হইয়াও অদ্যাবধি দেহ-ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

কোন উচ্চ আদর্শের পথ অনুসরণ করিতে না পারিলে কোনও জাতি অধিক কাল তাহার জাতীয় সমগ্রতা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। গ্রীসের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতার স্পৃহা, রোমের শান্তি ও শৃঙ্খলা-বিধানে চেষ্টা, এই দুই বৃত্তি গ্রীক্ ও রোমীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ ছিল। যখন তাহা মন্দীভূত হইয়া পড়িল, তখনই গ্রীস্ ও রোমের জাতীয় সমগ্রতা নষ্টপ্রায় হইতে লাগিল। সেইজন্য মহাত্মাজী ভারতের সম্মুখে এক নূতন ও মহান্ আদর্শের নিশান তুলিয়া ধরিয়াছেন। পরাধীন জাতির স্বরাজ লাভের চেষ্টা পৃথিবীতে চিরকাল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু শান্তিময় বিগ্রহ দ্বারা স্বরাজলাভ করিবার যে পন্থা মহাত্মাজী আবিষ্কার করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে উহা এক সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। সাধারণতঃ কোন প্রকার বিগ্রহ বা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে মানব-চরিত্রের অসৎবৃত্তিগুলিই প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। কিন্তু শান্তিময় বিগ্রহে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই প্রধান কার্য্য ; সেইজন্য অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন

করিয়া সৎ প্রবৃত্তির প্রভাব বৃদ্ধি করাই তখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তাহাতেই ঐ শান্তিময় বিগ্রহ মানবের আত্মোৎকর্ষ-বিধানের সহায়স্বরূপ। এই উচ্চ আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের রাজনৈতিক জীবন সংগঠিত হইলে ভারতের জাতীয় সমগ্রতা রক্ষা সম্ভবপর হইবে। নতুবা, বর্ত্তমানে ব্রিটিশ্ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের জনমত যেরূপ সমষ্টিবদ্ধ হইতেছে, তাহাতে ঐ রাজশক্তি অপসারিত হইলে এই বিশাল দেশের অখণ্ড একতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীর ন্যায় অল্পকালেই বিলুপ্ত হইতে পারে।

ভারতের চতুর্দ্দিক্ মন্থন করিয়া মহাত্মাজী প্রথম জমি প্রস্তুত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই জমিতে বীজরোপণের ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি দিল্লী আসিয়াছেন। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি গভর্ণমেণ্টকে জনমতের অধীন করিয়া পাঞ্জাব, খিলাফৎ ও স্বরাজের দাবী পূর্ণ করিতে বাধ্য করিবেন, এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া তিনি পরবর্ত্তী কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন, এবং "শান্তিময় অবাধ্যতা" সংগ্রাম আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে নিখিল জাতীয় কংগ্রেস কমিটিতে এক মন্তব্য উপস্থিত করিবেন, তাহার খসড়া আসিবার সময় তিনি ট্রেণে বসিয়া লিখিয়াছেন। এবার তিনি বস্তুতঃই আগুন লইয়া খেলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমে তাঁহাকে প্রায়ই নিবিষ্ট-চিত্তে ও চিন্তান্বিতভাবে থাকিতে দেখিয়াছি, ইহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ১৯১৯ সালে "রাউলাট্ আইন" (Rowlatt Bill) লইয়া আইন-ভঙ্গ ব্যাপারে দিল্লী, পাঞ্জাব, আমেদাবাদ, ভিরামগাম প্রভৃতি স্থানে যে

অরাজকতা ও হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল, সেই সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া মহাত্মাজী অতি সন্তর্পণে চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ঐ হিসাবেই তাঁহার প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। ষ্টেশন হইতে রাত্রিতে বাসায় পৌঁছিয়াই তিনি আমাদিগকে ঐ খসড়া পরিষ্কার নকল করিয়া দিতে বলিলেন। প্যারীলালজী, শ্রীযুক্ত মজ্‌লি ও আমি সেই কার্য্যে নিযুক্ত রহিলাম। এদিকে মহাত্মাজী হাকিম আজমল খাঁ সাহেব ও ডাক্তার আন্‌সারি প্রভৃতি দিল্লীর মহামান্য নেতৃবর্গের সহিত অনেক রাত্রি অবধি পরামর্শ করিতে ও আলোচনায় ব্যাপৃত রহিলেন।

পরদিন (৩রা নভেম্বর) প্রাতে ৮টা হইতে বেলা ১টা অবধি 'ওয়ার্কিং কমিটি'র সভায় ঐ প্রস্তাবের বিচার হইতে লাগিল। বেলা ৩টার সময় কিছুক্ষণের জন্য মহাত্মাজী 'সেণ্ট্রাল খিলাফৎ কমিটি'র সভায় গেলেন। তাহার পর পুনরায় সন্ধ্যা ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা অবধি 'ওয়ার্কিং কমিটি'র কার্য্য পূর্ব্ববৎ মহাত্মাজীর কামরায় চলিতে লাগিল। ভারতের প্রধান জননায়কগণ তন্ন তন্ন করিয়া মহাত্মাজীর খসড়ার বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে লাগিলেন এবং অধিকাংশের মতানুসারে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা যেরূপ আকার ধারণ করিল, তাহাই পরদিবস (৪ঠা নভেম্বর) অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে উপস্থিত করা হইল। পুণার শ্রীযুক্ত কেলকার ও বম্বের শ্রীযুক্ত বিঠ্‌ঠলভাই পেটেল মহাশয়দ্বয় "শান্তিময় অবাধ্যতা" (civil disobedience) অস্ত্র ব্যবহারে পূর্ণ সহানু-

ভূতি-সম্পন্ন হইলেও, ঐ নিমিত্ত যে দেশের বিশেষরূপ যোগ্যতা অর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা তাঁহারা মনে করিতেছেন না। সেইজন্য যে সমস্ত সর্ত্তের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া মহাত্মাজী "শান্তিময় অবাধ্যতা"র প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা পদে পদে বাধা দিতে লাগিলেন। উক্ত প্রস্তাবের এক স্থানে এইরূপ সর্ত্ত ছিল যে ব্যক্তিগত ভাবে যদি কেহ "শান্তিময় অবাধ্যতা" কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বিদেশীয় বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া হাতেকাটা সূতা হইতে প্রস্তুত হাতেবোনা খদ্দর-বস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে। মহাত্মাজীর অনুরক্ত শ্রীযুক্ত শেঠ্ যমুনালালজী এই সর্ত্ত আরও কড়া করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, ঐরূপ সত্যাগ্রহীর পরিবারবর্গও বিদেশীয় বস্ত্র বর্জ্জন করিবে, এইরূপ উপদেশ লিপিবদ্ধ হউক্। যমুনালালজীর এই প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত কেল্‌কার মহাশয় আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। অতঃপর দ্বিতীয় একটী সর্ত্তের বিচার আরম্ভ হইল। সার্ব্বজনীন "শান্তিময় অবাধ্যতা" অনুষ্ঠান করিতে হইলে যে জেলা বা তালুককে কেন্দ্র করিয়া উহা করিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ শতকরা নব্বই জন লোকের খদ্দর-ব্রতে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক, এইরূপ মহাত্মাজী প্রথমে লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু সকলের মতে ইহা নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলালজীর প্রস্তাব মত—"and therein a vast majority of the population must have adopted full Swadeshi and must be clothed out of cloth

hand-spun and hand-woven in that district or Tehsil," [অনুবাদ] এবং সেখানে জনসংখ্যার বহুলাংশে অধিক লোক পূর্ণ স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিয়া সেই জেলা বা তহসীলের প্রস্তুত চরকাসূতা হইতে সেই তহসীল বা জেলাতে প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার করিবে,—এইরূপ লিপিবদ্ধ করা হইল।

মহাত্মাজীর খসড়ার অপর একটি সর্ত্ত নেতৃমণ্ডলীর মধ্যস্থলে তপ্ত গোলার ন্যায় পতিত হইল। মহাত্মাজী লিখিয়াছেন যে যিনি ব্যক্তিগত শান্তিময় অবাধ্যতা (individual civil disobedience) অনুষ্ঠান দ্বারা সত্যাগ্রহী হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে প্রথম চরকার সূতাকাটার জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। পণ্ডিত মতিলালজী এই প্রস্তাব পাঠ করিয়াই হাসিতে লাগিলেন। লালা লাজ্‌পত্‌ রায় মহাশয়ের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। তিনি এখন আর মহাত্মাজীর কথার বিশেষ প্রতিবাদ করেন না। সূতা কাটা অভ্যাস করিতে হইবে শুনিয়া তিনি কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইলেও কতদিনে উহা শিক্ষা হইতে পারে তাহা জানিবার জন্য মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হাকিম সাহেবও মহাত্মাজীকে ঐ প্রশ্ন করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও দেশভক্ত বেঙ্কটাপ্পায়া এই প্রস্তাব উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন। যমুনালালজী স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। বিঠ্ঠলভাই পেটেল ও কেল্‌কার মহাশয়দ্বয় একেবারে হৈ চৈ করিয়া উঠিলেন। মহাত্মাজীর পক্ষ লইয়া দেশবন্ধু দাশ মহাশয় তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন

যে তিনি নিজেও চরকায় পাক দিয়া তিন গজ পরিমাণ সুতা বাহির করিয়াছেন এবং আরও অভ্যাস করিলে ঐ কাজ বিশেষ শক্ত হইবে না বলিয়া বুঝিয়াছেন। অবশেষে এই প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত কেল্‌কার ও বিঠ্‌ঠলভাই ইহার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। মতিলালজী, লালাজী, হাকিম সাহেব, ডাক্তার আন্‌সারি সাহেব, ইঁহারা নিরপেক্ষ রহিলেন। দেশবন্ধু দাশ মহাত্মাজীর পক্ষে ভোট দিলেন। তদ্ব্যতীত, রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবু, বেঙ্কটাপ্পায়া, যমুনালালজী প্রভৃতি সভ্যের ভোট ঐ প্রস্তাবের অনুকূল হওয়াতে উহা রেজলিউশনের অঙ্গীভূত হইয়া গেল।

দেশবন্ধু দাশ মহাশয় মহাত্মাজীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া যেরূপ তর্ক, বিচার ও আলোচনা করিতে লাগিলেন তাহাতে মহাত্মাজীর শ্রম লাঘব হইতে লাগিল। বস্তুতঃ তিনি যেরূপ দৃঢ়তার সহিত মহাত্মাজীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, সেইরূপ অপর কাহাকেও করিতে দেখিলাম না। অপর একটি বিষয়ের বিরুদ্ধে পেটেল মহাশয় নানারূপ আপত্তি ও কূট তর্ক করিতে লাগিলেন। তখন দেশবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—"Mr. Patel, I don't understand the meaning of your opposition."—অর্থাৎ, 'মিঃ পেটেল, আপনি ইহার বিরুদ্ধতা কেন করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতেছি না।' পেটেল মহাশয় তখনই উত্তর দিলেন—"It is because, Mr. Das, I still stand where you were six months ago"—অর্থাৎ, 'মিঃ দাস, ইহার কারণ আর কিছু নহে, মাত্র এই যে ছয়মাস পূর্ব্বে আপনার

ও আমার মত একরূপই ছিল, কিন্তু আপনি তাহা ত্যাগ করিয়াছেন ; আমি তাহা ত্যাগ করি নাই।

দেশবন্ধু মহাশয় মহাত্মাজীর পক্ষ দৃঢ়তা-সহকারে সমর্থন করিলেন বটে, কিন্তু 'শান্তিময় অবাধ্যতা' রূপ সংগ্রামের দায়িত্ব নেতৃবর্গ ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কি না, এই সন্দেহ মহাত্মাজীর প্রাণে রহিয়া গেল। সেই জন্য তিনি অতি সতর্কতার সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, ইহা তাঁহার সমস্ত কথাবার্ত্তা দ্বারা পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তিনি সমবেত নেতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে যাহা বলিয়া দিলেন তাহা এইরূপ— "গুজরাতের সুরাৎ জেলার বাড়্‌ডোলি নামক তালুকে তিনি 'শান্তিময় অবাধ্যতা' বা বিদ্রোহের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবেন। তিনি স্বয়ং এই কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবেন। এই বিষয়ে তিনি সমগ্র ভারতের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন ; এবং বাড়্‌ডোলিতে তিনি কি ভাবে সংগ্রাম পরিচালন করেন, তাহা সকলে শান্তভাবে একদৃষ্টিতে দেখিতে থাকিবে, ইহাই প্রত্যাশা করিতেছেন। দেশের এইরূপ 'moral support' বা আন্তরিক সহৃদয়তাই তাঁহার সাফল্যলাভের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বাড়্‌ডোলিতে যখন তিনি ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন তখন যেন কোন স্থানে শান্তিরক্ষার কোন প্রকার ব্যাঘাত না জন্মে, ইহাই সকলের লক্ষ্যের বিষয় হইবে। যদি শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।"

মহাত্মাজী পুনরায় বলিলেন—"সমষ্টিভূত অবাধ্যতা একটা

ভূমিকম্প বা খণ্ডপ্রলয়ের ন্যায় ব্যাপার। যেখানে উহা আরম্ভ হইবে সেখানে বর্ত্তমান রাজত্ব আর থাকিবে না। সেখানকার পুলিশ, সিপাহী বা কর্ম্মচারী ইত্যাদি সকলকেই সরকারের চাকরি ত্যাগ করিয়া স্বরাজের অধীনে কাজ করিতে হইবে; অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে। সেই স্থানের থানা, কাছারি প্রভৃতি সমস্তই জাতীয় সম্পত্তিরূপে অধিকৃত হইবে, অথচ কোনরূপ বলপ্রয়োগ হইবে না। সরকার যদি হুকুম দেয় যে 'ডান্ দিকে যাও', তবে বাম্ দিকে যাইতে হইবে; ইহারই নাম অবাধ্যতা। কিন্তু এই অবাধ্যতা শান্তিময়। ক্রোধ, হঠকারিতা বা ঔদ্ধত্য করিয়া অবাধ্যতা করিলে 'সবিনয়' বা শান্তিময় (civil) অবাধ্যতা হইবে না। তাহা তখন অবিনয় (criminal) হইয়া যাইবে। সেই জন্য সকলে এই 'অবাধ্যতা' আচরণ করিবার অধিকারী নহেন।" অতএব মহাত্মাজী পুনরায় সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "না দেখিয়া, না বুঝিয়া, এবং শিক্ষা না করিয়া কেহ যেন 'সবিনয় অবাধ্যতা' কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন। ভারতের সকল প্রান্ত প্রস্তুত এবং সজ্জিত হইয়া বাড়্‌ডোলির দিকে কেবল দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহার পর বাড়্‌ডোলিতে যখন স্বরাজের পতাকা নির্ব্বিঘ্নে উড়িতে থাকিবে, তখন বাড়্‌ডোলির পরবর্ত্তী তালুকা ঐ প্রণালী অনুসরণ করিয়া স্বরাজ স্থাপন করিবে; এবং এইরূপে ক্রমশঃ ভারতের সর্ব্বত্র ঐ শক্তি বিকাশলাভ করিবে। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে কোন

স্থানে কিছুমাত্র শান্তিভঙ্গ হয়, তবে এই শান্তিময় বিদ্রোহের কার্য্য পরিচালনা করা নিরাপদ্ ও সম্ভবপর হইবে না। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে ভারতের চতুর্দ্দিকে এক শান্তির সুর বাজিয়া উঠিবে। কিন্তু যদি কোথাও দেশবাসীর পক্ষ হইতে কোনস্থানে শান্তি নষ্ট করা হয় বা তাহার উদ্‌যোগ হয়, তাহা হইলে বীণাযন্ত্রের তার ছিঁড়িলে বীণা যেরূপ বে-সুর হইয়া যায়, সেইরূপ আমাদেরও সব পণ্ড হইয়া যাইবে।"

প্রাতে ৬॥ টা হইতে প্রায় সমস্ত দিন একবারে একাসনে বসিয়া মহাত্মাজী এই সকল বিষয় আলোচনায় নিযুক্ত রহিলেন। রাত্রি ৯॥ টার সময় 'ওয়ার্কিং কমিটি'র সভা ভঙ্গ হইলেও অপর লোকের সমাগম ও বিচার-বিতর্কের বিরাম হইল না। মহাত্মাজীর শরীর আর কত সহিবে? ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ৭ টার সময়, যখন 'সবিনয় অবাধ্যতা' লইয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা চলিতে-ছিল, তখন আমি মহাত্মাজীর সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া (দিল্লীর) চাঁদনী চকে যাইয়া শেঠ্ যমুনালালজীর বাসায় আহার করিয়া আসিলাম। রাত্রি ৯॥টার পরেও লোকজন আসিতেছে দেখিয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একটু কড়া হইয়া, মহাত্মাজীর কামরার দরজায় হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, এবং অপর কাহাকেও আর ঘরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাহার পর যখন মহাত্মাজীর শয্যা প্রস্তুত হইল তখন তিনি "Good Night" বলিয়া রাত্রির মত বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি তৈল লইয়া মহাত্মাজীর মাথায়, বুকে এবং

পায়ে মালিশ করিতে লাগিলাম। তিনি একবার কষ্টের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"একদম্ মৈ থগ্ গয়া। কেত্‌না বর্‌দাস্ত করু?" তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে অল্পক্ষণেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটি, দিল্লী

৪ঠা নভেম্বর, শুক্রবার। মুসলমান সভ্যদিগকে জুমার নমাজের জন্য দ্বিপ্রহরে মস্‌জিদে উপস্থিত হইতে হইবে। সেই জন্য স্থির হইল যে অল্-ইণ্ডিয়া-কমিটির সভা প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা অবধি বসিবে। ৯টার পূর্ব্বে সভাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য সকাল হইতেই আমরা প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচারী মহাশয় অল্-ইণ্ডিয়া সমিতির এই সভা রহিত করিবার আদেশ দিয়া সংবাদপত্রে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কংগ্রেস-ওয়ার্কিং-কমিটি এবং কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ইহাদের পরস্পরের কি ক্ষমতা তৎসম্বন্ধে ওয়াকিং-কমিটির অপরাপর সভ্যদিগের সহিত বিজয়রাঘবাচারীজীর প্রথমাবধিই মতবিরোধ ছিল। এই সময় সেই বিরোধ ঘনীভূত হইয়া পড়িল। নাগপুর কংগ্রেসের নূতন নিয়মানুসারে ওয়ার্কিং-কমিটির সৃষ্টি সেই বৎসর প্রথম হইল। তৎপূর্ব্বে কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট স্বাধীনভাবে স্বীয় মতানুযায়ী যে সমস্ত কার্য্য করিতেন, এখন ওয়ার্কিং-কমিটি তাহা করিবার অধিকার লাভ করিলেন। নূতন

নিয়মানুসারে এই ওয়ার্কিং-কমিটি 'অল্‌-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটি' দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে, এবং অল্‌-ইণ্ডিয়া-কমিটির প্রতিনিধি-স্বরূপ উহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। বিজয়রাঘবাচারীজী তাহা অগ্রাহ্য করিলেন এবং ওয়ার্কিং-কমিটির সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্টের যে অধিকার ছিল, সেই অধিকারের দাবি করিতে লাগিলেন। উক্ত মতান্তরের ফলে কংগ্রেস-নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বিজয়-রাঘবাচারী মহাশয় এই সময় দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন না; তথাপি স্থির হইল যে লালা লাজপত রায় মহাশয় ঐ সভায় সভাপতিরূপে মনোনীত হইবেন।

কিন্তু নূতন সভাপতি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত হইতে না হইতে বম্বের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা মহাশয় চীৎকার করিয়া সভ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন যে, কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মহাশয় যখন ঐ সভা রহিত করিয়াছেন তখন সেই সভা আহ্বান করিবার অপর কাহারও ক্ষমতা নাই। পণ্ডিত মতিলালজী এবং শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু দাশ ঐ আপত্তির খণ্ডন করিলেন। যখন যমুনাদাস মেটা মহাশয় পুনরায় এই আপত্তি করিলেন যে অল্‌-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটি হইতে ওয়ার্কিং-কমিটি উদ্‌ভূত হইলেও উহা অল্‌-ইণ্ডিয়া-কমিটির সমস্ত ক্ষমতা ক্রমশঃ আত্মসাৎ করিতেছে এবং সেই হেতু ওয়ার্কিং-কমিটির কোন সভ্যেরই সভাপতি না হওয়া কর্ত্তব্য। যদি স্বনামখ্যাত নেতৃমণ্ডলীর সমক্ষে অপর কেহ সভা-পতি হইতে ইতস্ততঃ করেন, তাহা হইলে "আমি আমাকেই

সভাপতিরূপে প্রস্তাব করিতেছি” বলিয়া মেটা মহাশয় নিজ আসন গ্রহণ করিলেন। এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া সভাতে হাস্যের রোল উঠিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ প্রস্তাব কেহই সমর্থন করিলেন না। অতঃপর লালা লাজপত রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে বেরার প্রান্তের নেতা শ্রীযুক্ত আনে (Mr Aney) অপর এক প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে অল্-ইণ্ডিয়া-কমিটির সভ্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নাগপুর কংগ্রেসে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বাঙ্গলা এবং মাদ্রাজ প্রান্তের সভ্য-নির্ব্বাচন কালে তাহা প্রতিপালিত হয় নাই। সেই জন্য কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মহাশয় ঐ দুই প্রদেশের নির্ব্বাচন মঞ্জুর করেন নাই। অতএব বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ প্রান্তের সভ্যেরা যথাবিধি নির্ব্বাচিত সভ্য নহেন, এই কারণে তাঁহারা সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউন; আনে মহাশয় এই প্রস্তাব করিলেন। বিচার-যুক্তি সহকারে সুদক্ষ আইন-ব্যবসায়ীর ন্যায় তিনি তাঁহার বক্তব্য পেশ করিলেন, এবং তাহা যথারীতি সমর্থিত হইল। একজন বাঙ্গালী সভ্য এই সময় তারস্বরে আনে মহাশয়ের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। অতঃপর নির্ব্বাচন-সম্বন্ধীয় নূতন নিয়মাবলীর প্রণেতা মহাত্মাজী ঐ সমস্ত নিয়মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তখন ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়া গেল। মহারাষ্ট্রীয় সভ্যগণ এই সমস্ত obstructive tactics অর্থাৎ বিঘ্নোৎপাদক কল-কৌশল ব্যবহার দ্বারা স্বীয় শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই প্রকার কার্য্যপ্রণালী প্রয়োগের

উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া সকলে দলবদ্ধভাবে কার্য্য করিতেছিলেন।

সভার সংগঠন-সম্বন্ধীয় সমুদয় আপত্তির নিরসন হইলে এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন্ মহাশয় একটি প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে বলা হইল যে, ঐ সভায় সমস্ত কার্য্য রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দীতে পরিচালিত হউক এবং প্রত্যেক কংগ্রেস-কমিটিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হউক যে ইংরাজির পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা ব্যবহৃত হইবে। টেণ্ডন্ মহাশয় বিশুদ্ধ হিন্দীতে অতি সুন্দর একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে এক বাঙ্গালী সভ্য "আমিও বাঙ্গলায় উত্তম বক্তৃতা দিতে পারি" এইরূপ ভূমিকা করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। হিন্দী বক্তৃতার জবাব-স্বরূপ সেই বাঙ্গলা বক্তৃতা শুনিয়া সভাতে হাসির ধূম পড়িয়া গেল। মহাত্মাজী তখন অনন্যোপায় হইয়া বিচারের ভার ওয়ার্কিং-কমিটিকে দেওয়া হউক, এই প্রস্তাব করিয়া সভাকে সেই ভাষা-বিভ্রাট হইতে রক্ষা করিলেন।

এইরূপে হাসি তামাসা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সভার প্রধান ও গুরুতর বিচার্য্য বিষয়, 'সবিনয় অবাধ্যতা' সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের আলোচনায় সভা প্রবৃত্ত হইল। কেহই ঐ প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন না। কিন্তু মহাত্মাজীর সর্ত্ত-গুলিকে শ্লথ করিবার প্রবল চেষ্টা হইতে লাগিল। চরকা, তাঁত ও খদ্দরের কার্য্যে কৃতকার্য্যতা দ্বারা সবিনয় অবাধ্যতা বা

শান্তিময় বিদ্রোহ করিবার যোগ্যতা প্রমাণ করিতে হইবে, মহাত্মাজীর এই সর্ত্তের বিরুদ্ধে বহু তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, সবিনয় আইনভঙ্গ অনুষ্ঠান মাত্র এক স্থানে হওয়া উচিত নহে; একযোগে বহু স্থানে হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারিবে না। ইঁহারা কেবল কি উপায়ে গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে পারা যায় তাহারই চিন্তা করিতেছিলেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে ঐ কার্য্যের শাস্তিস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট যাহাতে দেশবাসীর প্রতি কঠোর আচরণ করিতে না পারে তাহাও চিন্তা করিতেছিলেন। এই সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তার অন্তরালে এক প্রকার ভাবের খেলা চলিতেছিল। তাঁহাতে অবিনয় (criminal) অবাধ্যতার পথ সহজ হইতে পারিত, কিন্তু উহা দ্বারা সবিনয় (civil) বা শান্তিময় অবাধ্যতা অনুষ্ঠানের কোন প্রকার সহায়তা হইতে পারিত না। সেই জন্যই মহাত্মাজীর সর্ত্তের এত কড়াকড়ি ছিল। শান্তিময় অবাধ্যতা ব্যাপার কি, তাহা এই দেশে পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে মহাত্মাজী প্রথম এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং সেই অস্ত্রের বলে তিনি আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্দ্ধর্ষ শক্তির বিরুদ্ধে শান্তিময় যুদ্ধ ঘোষণা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। সকলেই ইহাতে বিশেষরূপে উৎসাহী। অথচ যিনি এই যুদ্ধে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ, এবং যাঁহার উপর ইহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তিনি দেশের শক্তিবৃদ্ধি ও শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে

যে সকল উপায় অবলম্বন অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রচার করিতে-ছেন, তাহার প্রতি বাধাপ্রদান কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা আমার বোধগম্য হইতেছিল না। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে যদি সমষ্টি-ভূত শান্তিময় বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রদর্শিত নির্দ্দিষ্ট পন্থাও অনুসরণ করিতে হইবে। আমার মনে হইতে লাগিল, শান্তির পথ ধরিয়া মহাত্মাজী যে বিদ্রোহ প্রবর্ত্তন করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃতি যে কেবল 'অবাধ্যতা' নহে, তাহা তখনও সভ্যেরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। নতুবা মহাত্মাজীর সর্ত্ত লইয়া সভায় এই প্রকার প্রবল আপত্তি উঠিতে পারিত না।

সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে মহাত্মাজীর সান্ধ্যভোজন সভাস্থলেই হইবে, এইরূপ আদেশ পাইয়া দেবদাস ও আমি বাসায় চলিয়া গেলাম। তাহার পর আমাকে অপর এক কার্য্যের জন্য বাসাতেই থাকিতে হইল। এদিকে সেই রাত্রির বৈঠকেই 'সবিনয় অবাধ্যতা' প্রস্তাব অল্-ইণ্ডিয়া-কমিটির অনুমোদন প্রাপ্ত হইল। পর দিন (৫ই নভেম্বর) পুনরায় বেলা ১১টা হইতে ১॥ টা অবধি ঐ সভা বসিল, এবং ঐ দিন অপর কয়েকটি মন্তব্য গৃহীত হইল। এই দুই দিনের অধিবেশনে লালা লাজপত রায় মহাশয় যেরূপ কৌশল, কৃতিত্ব ও দক্ষতার সহিত সভার অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয় ব্যাপার বলিয়া আমি মনে করি। বেলা ১॥ টার পর মহা-ত্মাজী সভাস্থল হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায়

বৈকালে ৪॥ টার সময় ওয়ার্কিং-কমিটির সভা মহাত্মাজীর কামরায় বসিল। তখন আবার লোকে লোকারণ্য।

৪ঠা নভেম্বর তারিখের অল্-ইণ্ডিয়া-কমিটির দিল্লী অধিবেশনে 'সবিনয় অবাধ্যতা'-মূলক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল তাহার ইংরাজি মূল নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা—

"Whereas there is not much over one month for the fulfilment of the national determination to establish Swaraj before the end of the year, and whereas the Nation has demonstrated its capacity for exemplary self-restraint by observing perfect non-violence over the arrest and imprisonment of the Ali Brothers and other leaders, and whereas it is desirable for the Nation to demonstrate its capacity for further suffering and discipline sufficient for the attainment of Swaraj,

"The All-India Congress Committee authorises every Province, on its own responsibility, to undertake Civil Disobedience, including non-payment of taxes, in the manner that may be considered the most suitable by the respective Provincial Congress Committees subject to the following conditions.

অনুবাদ—"এই অল্‌-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটি প্রান্তীয় কংগ্রেস-কমিটি সমূহকে নিম্নলিখিত অধিকার প্রদান করিতেছেন। নিম্নলিখিত সর্ত্তসকল প্রতিপালনে সমর্থ হইলে যে কোন প্রান্তীয় কংগ্রেস-কমিটি স্বীয় দায়িত্বাধীনে এবং স্বীয় শক্তি-অনুসারে যে কোন শ্রেণীর শান্তিময় অবাধ্যতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে; এমন কি আবশ্যক হইলে গভর্ণমেণ্টের খাজনা বন্ধও করিতে পারিবে।"

(1) "In Individual Civil Disobedience, the individual must know hand-spinning and must have completely fulfilled that part of the programme which is applicable to him or her, *e. g.*, he or she must have entirely discarded the use of foreign cloth and adopted only hand-spun and hand-woven garments, must be a believer in Hindu-Muslim unity, and in the unity amongst all the communities professing different religions in India, as an article of faith, must believe in Non-violence as absolutely essential for the redress of the Khilafat and the Punjab wrongs and the attainment of Swaraj; and, if a Hindu, must by his personal conduct show that he regards untouchability as a blot upon nationalism.

অনুবাদ—ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তি শান্তিময় অবাধ্যতা অনুষ্ঠান করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে সর্ব্ব-প্রথম নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি প্রতিপালন করিতে হইবে,—(১) বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করতঃ কেবল হাতে-কাটা স্থতার দ্বারা প্রস্তুত ও হাতে-বোনা বস্ত্র সত্যাগ্রহী পরিধান করিবেন। (২) হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন, পরন্তু ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত যত শ্রেণীর সমাজ আছে তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনের আবশ্যকতা সত্যাগ্রহী ধর্ম্মবিশ্বাস রূপে গ্রহণ করিবেন। (৩) অহিংস-পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারাই পাঞ্জাব অত্যাচারের প্রতিকার ও খিলাফত দাবিপূরণ এবং স্বরাজলাভ অবশ্যম্ভাবী হইবে, দৃঢ়রূপে সত্যাগ্রহী ইহা বিশ্বাস করেন। (৪) যে স্থলে সত্যাগ্রহী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সেই স্থলে তিনি স্বীয় আচরণে প্রতিপন্ন করিবেন যে তিনি ভারতের অস্পৃশ্যতা ভারতীয় রাষ্ট্রীয়তার কলঙ্ক-স্বরূপ মনে করেন।

(2) "In the event of Mass Civil Disobedience, a District or Tehsil should be treated as a unit, and therein a vast majority of the population must have adopted full Swadeshi and must be clothed out of cloth hand-spun and hand-woven in that District or Tehsil, and must believe in and practise all other items of Non-Co-operation.

"Provided that no Civil Resister should expect

to be supported out of public funds, and members of the families of Civil Resisters undergoing sentence will be expected to support themselves by carding, hand-spinning and hand-weaving, or any other means.

অনুবাদ—যাঁহারা সত্যাগ্রহী-শ্রেণীভুক্ত হইবেন, সাধারণের অর্থ-সাহায্যে তাঁহাদিগের ভরণপোষণ হইবে, এরূপ তাঁহারা যেন মনে না করেন। তদ্ব্যতীত, যে সমস্ত সত্যাগ্রহী কারাবাস ভোগ করিবেন, তাঁহাদিগের পরিজনবর্গ স্বহস্ত দ্বারা তূলা ধুনিয়া, সূতা কাটিয়া বা কাপড় বুনিয়া কিম্বা অন্য যে কোন উপায়ে হউক স্বীয় স্বীয় জীবিকার্জ্জন করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন, ইহাই কমিটির আশা।

"Provided further that upon application by any Provincial Congress Committee, it is open to the Working Committee to relax the conditions of Civil Disobedience, if it is satisfied that any condition should be waived."

অল্-ইণ্ডিয়া কমিটির এই মন্তব্য অনুসারে যদিও প্রত্যেক প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটি অবাধ্যতা অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, তথাপি মহাত্মাজী সকলকেই বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে ঐ অধিকার মত কার্য্য করিবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। সেইজন্য সকলকেই তিনি কেবল চরকা ও খদ্দরের

কার্য্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়া, যে যে সর্ত্তের পূর্ণতা লাভ হইলে অবাধ্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তিময় আকার ধারণ করিতে পারিবে, তাহাই অগ্রে সমাপ্ত করিতে হইবে বলিয়া দিলেন। এইভাবে সর্ব্বত্র শান্তিময় বিদ্রোহ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনের চেষ্টা চলিতে থাকিবে; কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়্‌ডোলিতে মহাত্মাজী স্বয়ং সেই শান্তিময় বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়া দিবেন। সেই সময় অপর সকল প্রান্ত বাড়্‌ডোলিতে কি ভাবে কার্য্য হইতেছে কেবল তাহা লক্ষ্য এবং তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইতে থাকিবে। এইরূপে প্রান্তীয় নেতৃগণ মহাত্মাজীর উপদেশমত নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শেঠ্ যমুনালালজী বিদায়ের সময় আমাকে বলিলেন—"কৃষ্ণদাসজী, আপনি তো বাপুজীর সঙ্গ ত্যাগ করিবেন না, নতুবা বাপুজীর অনুমতি লইয়া আপনাকে আমি ওয়ার্ধা লইয়া যাইতাম।" আমিও শেঠ্‌জীর নিকট শেষ বিদায় লইয়া রাখিলাম। কারণ, শান্তিময় বিদ্রোহ বাড়্‌ডোলিতে আরম্ভ হইয়া গেলে যদি গোলাগুলি চলিতে থাকে তাহা হইলে আমি মহাত্মাজীর পার্শ্বেই থাকিব এইরূপ আশা করিতেছিলাম। শুনিলাম, ইহারই মধ্যে মীমাংসার সর্ত্তস্বরূপ তুর্কীকে স্মার্ণা ও থ্রেস্ মুক্ত করিয়া দিতে গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃত আছে, এই প্রস্তাব লইয়া পণ্ডিত মালবীয়জী আসিয়াছিলেন। মালবীয়জী বিশেষ উৎসাহ-সহকারে মহাত্মাজীকে ইহাতে স্বীকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শুনি-

লাম, মহাত্মাজী দুই চারি কথায় পণ্ডিতজীকে উক্ত প্রস্তাবের ব্যর্থতা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ২৩শে নভেম্বর তারিখ গভর্ণমেণ্টের নিকট Ultimatum অর্থাৎ সম্বন্ধচ্ছেদক শেষ পত্র প্রেরিত হইবে এবং তৎপূর্ব্ব দিন, ২২শে তারিখে স্থরাৎ সহরে 'ওয়ার্কিং কমিটি'র এক বৈঠক হইবে, ইহাও স্থির হইল। সমস্ত নেতা সেখানে পুনরায় সমবেত হইবেন। আমরা তখন মনে করিতে লাগিলাম যে ভগবদিচ্ছায় যদি এই শান্তিময় বিদ্রোহ সফলতা লাভ করে, তাহা হইলে যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে জগতের চিন্তাস্রোত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, এবং ইহা এক চিরস্মরণীয় ঘটনারূপে ইতিহাসে আবহমানকাল কীর্ত্তিত হইবে।

উনবিংশ অধ্যায়

পাঁচ দিনের সফর

৫ই নভেম্বর দিল্লীতে অল্-ইণ্ডিয়া কমিটির কার্য্য সমাপ্ত করিয়াই গুজরাতে আসিয়া শান্তিময় বিদ্রোহের আয়োজন সম্পূর্ণ করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা মহাত্মাজী পোষণ করিতেছিলেন। তখন নানা স্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিতেছিল। তাহা সমস্তই তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু লালা লাজপত রায় মহাশয়ের অনুরোধ মত ৯ই নভেম্বর তারিখে পাঞ্জাব রাষ্ট্রীয় বিদ্যাপীঠের উপাধি-বিতরণ উপলক্ষে অন্ততঃ একদিনের জন্য তাঁহাকে লাহোর যাইবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল। এদিকে ৬ই তারিখ দিল্লীতে নিখিল-ভারতীয় হিন্দুসভার ষষ্ঠ অধিবেশন হইবে এবং ৭ই তারিখ সোমবার তাঁহার মৌনবার, এইজন্য এই দুইদিন তাঁহাকে দিল্লীতেই থাকিতে হইল। তাহার পর তিনি ৮ই নভেম্বর দিল্লী হইতে বেলা ৮টার সময় রওনা হইয়া ১১টার সময় মথুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমস্ত দিন তিনি মথুরা কন্‌ফারেন্সের কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন এবং সন্ধ্যার সময় পেশোয়ার মেল ধরিয়া মথুরা হইতে লাহোর যাত্রা করিলেন।

দিল্লী ত্যাগের কিছু পূর্ব্বে অতি ব্যস্তভাবে একজন খানসামা একখানা পত্র লইয়া ডাক্তার আন্‌সারি সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত

হইল, এবং তখনই ঐ পত্রের জবাবের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। পত্রখানি (Miss Gertrude Emerson) মিস্ গারট্রুড্ এমার্সন্ নাম্নী কোনও এক মার্কিন মহিলা মহাত্মাজীকে লিখিয়াছেন। ইনি কিছুকাল যাবৎ মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি দিল্লী আসিয়াছেন। মহাত্মাজী তখন ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত। মিস্ এমার্সনের পত্র পাইয়াই তিনি কোন্ দিন কোথায় থাকিবেন তাহা তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলেন। তদনুসারে যে মেলে মহাত্মাজী মথুরা হইতে লাহোর যাইতেছিলেন, মিস্ এমার্সনও সেই মেল ধরিয়া মহাত্মাজীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং ফিরোজপুরের জনসভায় উপস্থিত হইয়া মহাত্মাজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিয়া লাহোর অবধি তাঁহার অনুগমন করেন। পরে এই শ্রদ্ধাবতী মহিলা সত্যাগ্রহাশ্রমে উপস্থিত হইয়া একদিন বহুক্ষণ একান্তে মহাত্মাজীর সহিত আলাপ করেন এবং নানা প্রশ্ন করিয়া তাঁহার উত্তর লিখিয়া লইয়াছিলেন। ইনি ভারতবর্ষ হইতে কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্ (Constantinople) হইয়া ইউরোপ যাইতেছেন। বিদায় কালে, মহাত্মাজীর শীঘ্র কারাবাসের সম্ভাবনা আছে, এই বলিয়া যখন মহাত্মাজী বিদায় চাহিলেন, তখন জাতি এবং বর্ণের এত বৈষম্য-সত্ত্বেও, সেই বিদুষী মহিলার প্রাণ সহানুভূতিতে দ্রব হইয়া গেল।

মিস্ এমার্সন্ ব্যতীত অপর একজন ইংরাজ ধর্ম্মযাজক

এই সময় একদিন বহু চেষ্টার পর মহাত্মাজীর সহিত দিল্লীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারতের নিম্নশ্রেণীর সাধারণের মধ্যে যে চরিত্রশোধন ও সমাজ-সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি মহাত্মাজীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইনি শীঘ্রই বিলাতে যাইবেন এবং মহাত্মাজীর পক্ষ হইতে বিলাতের অধিবাসিবর্গকে যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা হইলে সেই বাণী তিনি বহন করিবেন বলিয়া সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এই আন্দোলনের স্মারক-চিহ্ন-স্বরূপ খদ্দরের এক সাদা টুপি তিনি বাজার হইতে ক্রয় করিয়াছেন এবং তাহা পকেটে করিয়া আনিয়াছেন। মহাত্মাজীকে উহা দেখাইয়া বলিলেন যে ঐ টুপি তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। মহাত্মাজী সেই উদারপ্রাণ ইংরাজ ধর্ম্মযাজককে বলিয়া দিলেন যে তিনি কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না এবং তিনি ইংলণ্ডের শত্রু নহেন। তিনি ভারতের জন্য যাহা যাহা করিতেছেন তাহার ফলে পরিণামে ইংলণ্ডেরও মঙ্গল হইবে। পরবর্ত্তিকালে আরও কয়েকবার তাঁহাকে এইরূপ সম্পূর্ণ অপরিচিত কয়েকজন ভিন্ন দেশবাসীর সহানুভূতি ও প্রশংসা লাভ করিতে দেখিয়াছি।

কিন্তু ভারতের শ্বেতাঙ্গসম্প্রদায়ের অপর এক মূর্ত্তিও এই সময় দেখিয়াছিলাম, তাহা এই স্থলে বর্ণনা করিতেছি। মথুরা হইতে লাহোর যাইবার পথে দিল্লী ষ্টেশনে পেশওয়ার মেল এক ঘণ্টার অধিক কাল অবস্থান করে। তখন রাত্রি ৯টা

বাজিয়া গিয়াছে এবং মহাত্মাজীও শয়ন করিয়াছেন। আমি মহাত্মাজীর কামরার ঠিক পার্শ্বের কামরাতে যাইবার চেষ্টা করিতেছি; এমন সময় একজন সশস্ত্র গুর্খা সিপাহী দ্বার অবরোধ করিয়া আমাকে বাধা দিল। মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেবের সহচর আনোয়ারুদ্দিন তাহা দেখিতে পাইয়া ধমক্ দিয়া গুর্খাকে হটাইয়া দিলেন। গুর্খা তখন রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে তাহার সাহেবের নিকট চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একজন ইংরাজ রাজপুরুষ (বোধ হয় কোন উচ্চপদস্থ সৈনিক-কর্ম্মচারী) আসিল, এবং আসিয়াই কর্কশ ভাবে আমাকে কামরা হইতে নামিয়া যাইতে হুকুম করিতে লাগিল। আমি ভদ্রভাবে আপত্তি করিলাম। সাহেব তাহাতে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। আমি তখন দেবদাসের নিকট গোলমালের খবর দিলাম। দেবদাস তখনই আমার সঙ্গে আসিয়া ঐ কামরায় উঠিয়া বসিল। তখন পুনরায় সেই ইংরাজ রাজ-পুরুষ প্রথমে ভয় প্রদর্শন দ্বারা এবং পরে একজন রেলওয়ে সাহেব কর্ম্মচারীর সাহায্যে আমাদিগকে কামরা হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। উহাতে তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। মধ্যে দেবদাস হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "We are Mr. Gandhi's servants", অর্থাৎ, আমরা গান্ধীর ভৃত্য। মহাত্মাজীর নাম শুনিয়াই সাহেব দুই জনের চক্ষুঃস্থির। রেলের কর্ম্মচারী সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "Is Mr. Gandhi travelling by this train? Then, it is all right.

You take your seats."—অর্থাৎ, মিঃ গান্ধী কি এই ট্রেণে যাইতেছেন? তাহা হইলে আর কোন গোল নাই, আপনারা বসুন। এই বলিয়া তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। অপর সাহেবটিও তখন ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলেন। গুর্খা সিপাহী প্রভুর ঐরূপ অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে হতপ্রভ হইয়া বসিয়া রহিল এবং রাত্রির অবশিষ্ট সময় আমরা এক কামরায় থাকিলেও আমাকে সে আর কোনরূপ ক্লেশ দিতে ভরসা পাইল না।

পরদিন (৯ই নভেম্বর) প্রত্যূষে ফিরোজপুর আসিয়া সভার ও অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া ৯॥টার সময় অপর এক ট্রেণ ধরিয়া মধ্যাহ্নে মহাত্মাজী লাহোর পৌঁছিলেন। লাহোরে তিনি লালা লাজপত রায় মহাশয়ের অতিথি হইলেন। লালাজী তৎপ্রতিষ্ঠিত Tilak School of Politics (তিলক্ স্কুল অব্ পলিটিক্স্)-এর বাসস্থানরূপে স্বীয় বাটীর কিয়দংশ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সেই স্কুল-বাটীতেই আমাদের অবস্থানের ব্যবস্থা হইল এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র সকল আমাদের সেবাকার্য্যে নিরত রহিলেন। মহাত্মাজী যেখানে উপস্থিত হ'ন সেখানেই লোকজনের ধুম লাগিয়া যায় এবং উহা যেন উৎসবের স্থান হইয়া পড়ে। এখানেও সেইরূপ ব্যাপার। চারিদিকের সেই গোলমালের মধ্যে লালাজী মহাত্মাজীকে একেবারে দখল করিয়া বসিলেন। দুই দিন লাহোরে অবস্থানকালে আমাদিগকে মহাত্মাজীর সেবার জন্য বড় কিছু করিবার দরকার হয় নাই।

লাহোরে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মহাত্মাজী

প্রথম লাহোরের স্ত্রী-সভাতে চলিয়া গেলেন। আবার বৈকাল ৫টার সময় সুপ্রসিদ্ধ ব্রেড্‌ল হলে (Bradlaugh Hall) রাষ্ট্রীয় বিত্থালয়ের উপাধি-বিতরণ সভাতে তিনি উপস্থিত হইলেন। ঐ সভায় যাইবার সময় তিনি আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন— "যানা হ্যায়?" মহাত্মাজীর সেবার জন্য যেখানে তিনি হুকুম করিবেন, সেইখানেই যাইতে আমি প্রস্তুত; কিন্তু আমার নিজের কোথাও যাইবার জন্য সেরূপ ইচ্ছা হয় না, প্রয়োজনও বোধ হয় না। সেই কারণ তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব বুঝিতে না পারিয়া মৌনী রহিলাম। তিনি তখন "আচ্ছা ভাই, ছয় বাজে মিস্ এমার্সন্ আবেগা, উন্‌কো attend কর্‌না," এই বলিয়া সভায় চলিয়া গেলেন। এই উপাধি-বিতরণ সভায় আমি না যাওয়ায় তিনি প্রীত হইলেন না ভাবিয়া বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। পরিশেষে প্যারীলালজী মিস্ এমার্সনের অভ্যর্থনার ভার লইয়া বাসায় রহিলেন এবং আমি দেবদাসের সঙ্গে ব্রেড্‌ল হলের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি মিস্ এমার্সন্ মহাত্মাজীর নিকটেই বসিয়া আছেন। এদিকে ব্রেড্‌ল হল্ লোকে লোকারণ্য। আমরা দূর হইতে কোন বক্তৃতা শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু সেই রুদ্ধ গৃহে বহু সহস্র লোক মধ্যে মধ্যে সমস্বরে গর্জ্জন ও চীৎকারধ্বনি করিতেছিল, তাহার প্রভাব শরীরের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিলে যে প্রকার উত্তেজনা ও মত্ততার সৃষ্টি হয়, তাহাই কেবল অনুভব করিয়া আসিলাম।

পরদিবস "তিলক স্কুল অব্ পলিটিক্সের" দ্বারোদ্ঘাটন অনু-ষ্ঠানে (Opening Ceremony) তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেইদিনই আবার পাঞ্জাব-প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটির সভার সহিত পরামর্শ; ব্যবসায়ীদিগের সহিত পরামর্শ; উদাসী মহান্তদিগের সহিত পরামর্শ; হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের সহিত পৃথক্ ভাবে বিচার; ইত্যাদি বহুবিধ ব্যাপারে যোগদান করিয়া মহাত্মাজী কর্ম্মের এক ঘূর্ণাবর্ত্তে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর সন্ধ্যা হইলে তিনি জন-সাধারণের এক সভায় উপস্থিত হইলেন। সেই সভার বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি অবর্ণনীয়। মহাত্মাজী যখন দেখিলেন যে জনতা কিছুতেই শান্ত হইতেছে না, তখন তিনি কোন বক্তৃতা প্রদান না করিয়াই সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন। সভাভঙ্গের পর সেই অগণিত ইতস্ততঃ-সঞ্চালিত জনসমষ্টির পেষণে লোকের প্রাণনাশের সম্ভাবনা যথেষ্টই হইয়াছিল। বাস্তবিক যদি কেহ সেই উত্তাল জনসমুদ্র হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার ভাগ্যই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে। এইরূপে অতি ক্লেশে সভাস্থল অতিক্রম করিয়া আমরা সোজা ষ্টেশনাভি-মুখে চলিয়া আসিলাম এবং রাত্রি ৮৷৷টার ট্রেণে লাহোর হইতে যাত্রা করিলাম।

সেই সময় ভারতের চতুর্দ্দিকে যে প্রকার আশা, উৎসাহ এবং একতার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখিলাম, পাঞ্জাবে অনেক বিষয়ে হিন্দু-মুসল-

মানের মধ্যে মতবিরোধ এবং মনোমালিন্য রহিয়া গিয়াছে। তাহা দূর করিবার জন্য মহাত্মাজী বিশেষ প্রয়াস করিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি তেমন কৃতকার্য্য হইলেন কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এদিকে লরেন্স ষ্টেচিউ (Lawrence Statue) লইয়া লাহোর মিউনিসিপ্যালিটির সহিত গভর্ণমেণ্টের যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার সূত্রপাত তখন হইতেই হইয়াছে। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া Civil Disobedience বা সবিনয় অবাধ্যতার অনুষ্ঠান সহজেই আরম্ভ করা সম্ভবপর ছিল; এবং অতি সতর্কতার সহিত সে কার্য্য করা যাইতে পারে মহাত্মাজীও বলিলেন। কিন্তু ইহাও তিনি তৎসহ বলিয়া দিলেন যে যদি ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই স্থির হয়, তাহা হইলে এক সঙ্গে পাঁচ জনের অধিক সত্যাগ্রহী সেই মূর্ত্তির নিকট যাইতে পারিবে না। অধিক মাত্রায় নির্য্যাতন হইলে লাহোরের জনতা তাহা অবিচলিত ভাবে সহ্য করিয়া শান্তি রাখিতে পারিবে কিনা, তদ্বিষয়ে মহাত্মাজীর ঘোর সন্দেহ ছিল, তাহা বুঝিলাম। পূর্ব্বদিন ব্রেড্‌ল হলের উপাধি-বিতরণ সভায় যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতার অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতেও মহাত্মাজী লাহোরের সাধারণের কিরূপ সংযমের অভাব তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিলেন। উক্ত সভায় প্রবেশাধিকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট্ বিতরণ হইয়াছিল। কিন্তু বহু লোক সংখ্যার আধিক্যে স্বেচ্ছাসেবক-দিগকে অভিভূত করিয়া অন্যায়রূপে সভাতে প্রবেশলাভ করিয়া-ছিল। মহাত্মাজী প্রবেশকারীদিগকে সভাগৃহ ত্যাগ করিতে

অনুরোধ করিলেন ; তথাপি তাহারা সেই অনুরোধ রক্ষা করে নাই। লাহোরে অবস্থানকালে মহাত্মাজী এই সমস্ত ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে স্পষ্টই বুঝিলেন যে জনমণ্ডলীর এই প্রকার অশান্ত ভাব এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হইলে শান্তিময় অবাধ্যতা কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কিছুতেই নিরাপদ্ হইবে না।

১০ই নভেম্বর রাত্রি ৮॥টার সময় লাহোর ত্যাগ করিয়া সমস্ত রাত্রি ও সমস্ত দিন ট্রেণে যাপন করিয়া ১১ই নভেম্বর রাত্রি ১২টার সময় আমরা আজমের পৌছিলাম। সেই গভীর নিশীথে মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার্থ সহর আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে দেখিলাম এবং বাদ্য ও বাজির সমারোহে অসংখ্য লোক শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া গেল। এই রাত্রিতে মহাত্মাজী নিদ্রা গেলেন না এবং রাত্রিতেই আজমেরের সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পরদিবস প্রাতের ট্রেণে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৬ই নভেম্বর তিনি বাড়্ডোলিতে উপস্থিত হইবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং ২৩শে তারিখে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে। সেইজন্য একদিনও তিনি অন্য কাজে বা অন্যত্র ব্যয় করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক।

বিংশ অধ্যায়

করি কি?

১২ই নভেম্বর প্রাতে আজমের ত্যাগ করিয়া সেই তারিখেই রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আমরা আশ্রমে পৌছিলাম। তাহার পরদিন ১৩ই তারিখ রবিবারে 'সবিনয়-অবাধ্যতা' বিষয়ক 'অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি'র প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে গুজরাত-প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটির এক সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে মহাত্মাজী উপস্থিত হইলেন। কোন্ স্থানে অবাধ্যতার অনুষ্ঠান প্রথম আরম্ভ হইবে, তাহা লইয়া সভাস্থলে গুজরাতের কায়রা (Kaira) জেলার আনন্দ (Anand) তালুকা এবং সুরাৎ জেলার বাড়্ডোলি তালুকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। পাঠক মনে করিবেন না যে এই দ্বন্দ্বে দ্বেষ, বিরক্তি, ক্রোধ বা রূঢ়তার পরিস্ফূরণ ছিল। বস্তুতঃ এরূপ বিনম্র দ্বন্দ্ব পূর্ব্বে আমি কোথায়ও দেখি নাই। আনন্দ তালুকার পক্ষে ওকালতি করিবার সময় বৃদ্ধ আব্বাস্ তায়েবজী সাহেব প্রথমে মহাত্মাজীকে কিছু মিষ্ট সমালোচনা করিলেন,—"তোমার আর কি সর্ত্ত আছে বল? এবার আর তোমাকে ফাঁকি দিতে দিব না—যাহা করিতে হইবে একেবারে বলিয়া দাও। কোটি

টাকা চাহিয়াছিলে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহা আমরা তুলিয়া দিয়াছি। খদ্দর পরিতে বলিয়াছ, এই দেখ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বুড়া হাড় মাটি করিতেছি। এখন চল, স্থানীয় অবস্থা দেখিয়া আর কি করিতে হইবে বলিয়া দাও। দেখিও, নূতন আবদার তুলিয়া আমাদিগকে আবার যেন অতল জলে ফেলিয়া না দেও।” তায়েবজী সাহেবের এই সমালোচনা ও ভর্ৎসনার মধ্যে যে মধুরতার অভিব্যক্তি ছিল, তাহাতে সকলের মন মুগ্ধ করিল, এবং কিরূপ গভীর আকর্ষণে মহাত্মাজী সকলের প্রাণ একসূত্রে সম্বদ্ধ করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। বরোদা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সপ্ততি-বর্ষ-বয়স্ক তায়েবজী সাহেব নিজের ভোগৈশ্বর্য্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া নবীন যুবকের ন্যায় অতুল উৎসাহে যেরূপ মহাত্মাজীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া কে না আশ্চর্য্য হইবেন?

তায়েবজী সাহেব বলিলেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে কায়রা জেলাই সর্ব্বপ্রথমে আইনভঙ্গের নিশান তুলিয়াছিল। সেই সূত্রে আনন্দ তালুকার লোকেরা আইনভঙ্গের ‘কসরৎ’ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছে; অতএব তাহাদিগকেই প্রথম এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার অধিকার ও সম্মান দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বাড়্‌ডোলির পক্ষ হইতে সুরাতের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কল্যাণজী ভাই অতি সুন্দর এক যুক্তির অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইংরাজেরা প্রথম সুরাতে আসিয়া তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, এবং সুরাৎ হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহাদের আধিপত্য ভারতময় বিস্তৃতি

লাভ করিয়াছে। এখন সেই আধিপত্য ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে যাহা করা দরকার তাহা সুরাৎ জেলাই করিবে, ইহাই সে জেলার মৌলিক এবং স্বভাবগত অধিকার। যে দ্বার দিয়া প্রবেশ, সেই দ্বার দিয়াই নিষ্ক্রমণ, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। তাহাতে সুরাতের পূর্ব্ব অপরাধ স্খালিত হইবে। কল্যাণজী ভাইয়ের এই মৌলিক যুক্তি শ্রবণে সকলে আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষীয়ের বক্তৃতার পর দুই তালুকাই সবিনয় অবাধ্যতা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাই স্থির হইল যে মহাত্মাজী প্রথম বাড়্ডোলি যাইবেন, তাহার পর আনন্দ তালুকা পরিদর্শন করিবেন এবং দুই তালুকার মধ্যে যে স্থান তাঁহার অধিকতর কার্য্যোপযোগী বোধ হইবে, সে স্থান হইতেই ঐ অবাধ্যতা কার্য্য আরম্ভ করিবেন। তিনি ১৬ই নভেম্বর বাড়্-ডোলি যাইবেন, পূর্ব্ব হইতে তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু উভয় তালুকাই সম্যক্ প্রস্তুত হইবার জন্য দুইদিন অধিক সময় প্রার্থনা করিল। এদিকে ১৭ই নভেম্বর তারিখে যুবরাজ ভারত পরিদর্শন মানসে প্রথমে বম্বে পদার্পণ করিবেন। সেই সময় মহাত্মাজী যাহাতে বম্বে উপস্থিত থাকেন, তজ্জন্য বম্বে হইতে পুনঃ পুনঃ তার আসিতে লাগিল। কিন্তু মহাত্মাজী কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে ১৫ই তারিখ এমন এক সনির্ব্বন্ধ অনুরোধপূর্ণ টেলিগ্রাম আসিল যে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সেই জন্য তিনি এইরূপ স্থির করিলেন যে ১৭ই নভেম্বর প্রাতে বম্বে পৌছিয়া পুনরায় সেই দিনই রাত্রের

ট্রেণে বম্বে ত্যাগ করিয়া ১৮ই প্রাতে সুরাৎ পৌছিবেন এবং উহার পর সুরাৎ হইতে বাড়্ডোলিতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

বাড়্ডোলির কার্য্য সমাধা না করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমনের আর আশা নাই; বহু দিন কোথায় কি অবস্থায় থাকিতে হইবে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই, এই প্রকার বিচার করিয়া আশ্রম হইতে যাত্রার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় ১৪ই তারিখে বেনারস্ হইতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক জরুরি তার পাইলাম। তিনি লিখিলেন, আমি যেন তাঁহার এক বিশেষ পত্রের অপেক্ষায় আশ্রমে উপস্থিত থাকি। ১৫ই তারিখ তাঁহার দ্বিতীয় এক তার আসিল—"I prefer your not going out",—অর্থাৎ তোমার অন্যত্র না যাওয়াই ভাল মনে করি। আমি বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐ কথা অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে; অথচ প্রত্যহ আমি মহাত্মাজীর কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া থাকি এবং মহাত্মাজীও আমার উপর ঐ কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। অপর কাহারও হস্তে উহা ন্যস্ত না করিয়া অথবা সেরূপ কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে—মহাত্মাজীকে ইহা না বুঝাইয়া, আমি হঠাৎ কি করিয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিব যে তাঁহার সঙ্গে আমার যাওয়া হইবে না, কিম্বা ঐ কাজ আমার দ্বারা হইবে না। ১৫ই নভেম্বর বৈকালে যখন আমার নিকট ঐ টেলিগ্রাম আসিল তখন মহাত্মাজী এবং আশ্রমের অপর সকলে সুপ্রসিদ্ধ দানবীর স্বর্গীয় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ মহাশয়ের

সাম্বৎসরিক স্মৃতি-উৎসবে যোগদান করিতে (আমেদাবাদ) সহরে গিয়াছিলেন। আমি একা মহাত্মাজীর কুটীরে পাহারা দিতেছিলাম। সেই অবস্থায় ঐ টেলিগ্রাম পাইয়া দুই বিপরীত কর্ত্তব্যের টানে পড়িয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। একদিকে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশ, অপরদিকে মহাত্মাজীর দৈনন্দিন কার্য্যের দায়িত্ব, কোন্ দিক্ রক্ষা করি? কিছুদিন হইতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে পত্র লিখিয়া বুঝাইতেছেন যে, "কোন বিশেষ দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে নিজের শক্তি কতদূর তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য"। তিনি ইহাও লিখিতেছেন যে, "অন্তরের অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; অর্থাৎ,—সেই কার্য্যে প্রাণের সাড়া প্রকৃতপক্ষে আছে কি না, অথবা সাময়িক উত্তেজনার বশে তাহা করা হইতেছে, ইহা বুঝিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক"। অতঃপর আরও লিখিয়াছেন,—"মহাত্মাজীর সেবক হিসাবেই আমাকে তিনি পাঠাইয়াছেন, অতএব সেবাকার্য্যের কোন ত্রুটী না হয়, তাহাই সর্ব্বদা আমাকে ধ্যান করিতে হইবে। ঐ সেবা ব্যতীত কোন স্বাধীন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার অর্পণ করিবার জন্য মহাত্মাজী যদ্যপি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাহা বিশেষ বিচার ও বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে"। বিচার অপেক্ষা আরও এক উৎকৃষ্ট পন্থার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "অন্তরের গভীর স্তর হইতে আত্মার বাণী শুনিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে আর কোনও ভয় থাকে না। তখন সমস্ত পার্থিব শক্তি একত্রিত

হইয়া বাধা প্রদান করিলেও আত্মার বলে বলীয়ান্ হইয়া মানুষ নির্ভয়ে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হয়"। তাঁহার এই উপদেশের মর্ম্ম আমার বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলেও নিঃসন্দেহে সত্যের আহ্বান পাইবার অধিকার আমার আছে কিনা, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার পক্ষে সেই অধিকার লাভ স্বপ্নের অসাধ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই অবস্থায় নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া দুর্ভাবনায় রাত্রিতে মহাত্মাজীর পার্শ্বেই তাঁহার কুটীরের বারান্দায় পড়িয়া রহিলাম। সন্ধ্যার পর তিনি আমেদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেন; আসিয়া অতি প্রফুল্লভাবে হাসিয়া হাসিয়া আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অপর কোন দিন হইলে আমি উহাতে কৃতার্থ হইয়া যাইতাম; কিন্তু সেই রাত্রিতে তাঁহার প্রশ্নাবলীর কোন প্রকারে উত্তর দিলাম মাত্র। এত দয়া ও আত্মীয়তার প্রতি উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, নিদ্রা যাইব না, দেখি অন্তর হইতে কোন কিছু জানিতে পারি কিনা? কিন্তু পোড়া শরীর এমনই দুর্ব্বল যে অল্পক্ষণেই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম এবং অজ্ঞাতসারে নিদ্রাভিভূত হইলাম।

পরদিবস আমাদের যাইবার দিন। নিজে কিছুই যখন ঠিক্ করিতে পারিলাম না, তখন অগত্যা প্রাতের প্রার্থনান্তে মহাত্মাজীকে কিছুক্ষণ একাকী পাইয়া ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া বসিলাম, এবং শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ২।৩ খানা পত্র এবং টেলিগ্রাম তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম এবং আমার

কর্ত্তব্য কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—"যে পত্রের প্রতীক্ষা করিতে সতীশবাবু লিখিয়াছেন তাহাতে কি আছে দেখ। রবিবার আমরা আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছি। অতএব আজ সঙ্গে যাওয়াতে ক্ষতি নাই। রবিবারের পর যদি যাইতে না চাও, যাইও না।"

তাহার পর আবার বলিলেন,—"বাড়্ডোলি গেলে যদি আমাকে গ্রেপ্তার করে, তবে আমার সেক্রেটারিকেও গ্রেপ্তার করিবে এমন কোন কথা নাই। ওয়াল্‌টেয়ারে যখন মহম্মদ আলীকে গ্রেপ্তার করিল, কৈ তাহার সেক্রেটারিকে ত গ্রেপ্তার করে নাই?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"হাঁ, কোন দায়িত্ব লওয়ার পূর্ব্বে যদি ভিতর হইতে সুস্পষ্ট হুকুম আসে, তাহার উপর আর কথা নাই। কিন্তু ঐরূপ "higher inspiration" (প্রেরণা বা বাণী) আসা সহজ নহে। তাহা তখনও আসিতে পারে যখন একটা "crisis" (বিষম সমস্যা) আসিয়া গিয়াছে, "mental anguish and torture" (আত্যন্তিক মানসিক জ্বালা ও যন্ত্রণা) হইতেছে। সেই অবস্থায় আত্মা হয় পরমাত্মার দিকে চলিয়া যাইবে, না হয় শরীরকে আসিয়া অবলম্বন করিবে। ওদিকে গেলে সত্য লাভ হইয়া যায়, আর শরীরের দিকে আসিলে সংসারী হইতে হয়।"

পুনরায় বলিলেন—"আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলে তোমার পক্ষে কি কাজ উপযুক্ত হইবে তাহা আমি ভাবিতে-

ছিলাম। চিন্তা করিয়া দেখিলাম 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'র কাজে তুমি বেশ লাগিয়া থাকিতে পার, সেই জন্য তাহার কথা বলিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে যদি তাহাতে উৎসাহ না পাও, তবে তাহা করিও না।"

মহাত্মাজী সর্ব্বশেষে এই কথাগুলি বলিলেন,—"সতীশবাবুর কথা হইতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় আমি যে "final dispositions" (সাময়িক শেষ ব্যবস্থা) করিব, তাহাতে হঠাৎ তুমি কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া না ফেল, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। বেশ তাহাই হইবে। আজ সঙ্গে যাওয়াতে কোন বাধা দেখিতেছি না।"

মহাত্মাজীর এই কথার পর আর আমার কিছু বলিবার রহিল না। অতএব শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক টেলিগ্রাম দ্বারা জানাইলাম যে, "মহাত্মাজীর অভিপ্রায় মত আজ তাঁহার সঙ্গে বম্বে যাইতেছি এবং তাঁহার সঙ্গে আশ্রমে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছি।"

অতঃপর দ্বিপ্রহরে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সেই পত্র আসিয়া পড়িল। তাহাতে তিনি লিখিলেন,—"অধর্ম্ম ও অত্যাচারের প্রতিকারকল্পে শেষ ব্যবস্থাস্বরূপ Civil Disobedience (সবিনয় অবাধ্যতা) অনুসরণ করার বিরুদ্ধে তাঁহার কিছু বলিবার নাই। তবে সাময়িক উত্তেজনা অথবা প্রতিশোধ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ অবাধ্যতা করিতে গেলে, তাহা civil (সবিনয়) এবং non-violent (শান্তিময়) রূপে রক্ষা করা সম্ভবপর

হইবে না। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যতপ্রকার অবাধ্যতা হইতে পারে উহাই চরম অবাধ্যতা। সমগ্র দেশ সেই চরম অবাধ্যতা অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে অসহযোগ প্রণালীর স্তরে স্তরে যে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ও সহজসাধ্য আত্ম-বলিদানের শিক্ষা আছে, তাহা আরও কিছুদিন নেতৃবর্গের অভ্যাস করা প্রয়োজন। এই প্রাথমিক আত্ম-বলিদান শিক্ষা যখন জননায়কমণ্ডলীর পক্ষে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যাইবে, তখন তাঁহারা নির্ভয়ে সাধারণ জনমণ্ডলীকে ঐ চরম আত্ম-বলিদানরূপ সবিনয় অবাধ্যতা সমরে আহ্বান করিবার শক্তি ও যোগ্যতা লাভ করিবেন। কিন্তু যতদিন সরকারি স্কুল, কলেজ, আদালত, কাউন্সিল সভা ও দরবার ইত্যাদির মোহ দেশে বিদ্যমান, ততদিন বুঝিতে হইবে যে জননায়কমণ্ডলীমধ্যে আত্ম-বলিদান অভ্যাস সে প্রকার প্রসারলাভ করে নাই। অতএব আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে যতদিন দেশের মধ্যে এ অবস্থা বিদ্যমান, ততদিন দেশের হাওয়া ও দেশবাসীর হৃদয় গভর্ণমেণ্টের অনুকূল, এবং সেই কারণে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ততদিন গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই জননায়কগণ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবেন। পক্ষান্তরে, আত্ম-বলিদানের ক্রমিক শিক্ষা অভ্যাস না করিয়া জননায়কগণ দেশবাসীকে সাময়িক উত্তেজনা বা প্রতি-শোধ কামনার পথে পরিচালিত করিতে পারেন। তাহার ফলে দেশে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ বা বিদ্রোহ সৃষ্টি হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা সবিনয় বা শান্তিময় বিরুদ্ধতা বা বিদ্রোহ

হইবে না। অসহযোগীর পক্ষে উহা নিষিদ্ধ। অতএব আত্ম-বলিদানের প্রাথমিক শিক্ষার অপরিপক্ক অবস্থায় সমষ্টিভূত অবাধ্যতার ফল বিষময় হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন"।

আমার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিলেন,—"সাধারণ উত্তেজনার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া আমি হঠাৎ যেন কিছু না করি, এবং সমস্ত দিক্ বিবেচনা না করিয়া যেন আমি বাড়্ডোলির 'সবিনয় অবাধ্যতা' সংগ্রামে সত্যাগ্রহী শ্রেণীভুক্ত না হই"।

১০ই নভেম্বর তারিখের "Young India" তে "The Momentous Issue" (গুরুতর সমস্যা) নামে এক প্রবন্ধে মহাত্মাজী লিখিয়াছেন—"He (the civil resister) invites imprisonment and other uses of force against himself ; this he does because and when he finds the bodily freedom he seemingly enjoys to be an intolerable burden."

অনুবাদ :—সত্যাগ্রহী কারাবাস ও শরীরের উপর অন্য প্রকার নির্য্যাতন বরণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, কারণ তখন তাহার তথাকথিত শারীরিক স্বাধীনতা তাহার পক্ষে দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়ে।

অপর স্থলে তিনি লিখিয়াছেন—"Civil resistance is a most powerful expression of a soul's anguish" অর্থাৎ, শান্তিময় অবাধ্যতা-পদ্ধতি অন্তরাত্মার মর্ম্মান্তিক ক্লেশের তীব্রতম অভিব্যক্তি।

মহাত্মাজীর এই দুই বচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বুঝাইয়া লিখিলেন যে "bodily freedom" (শারীরিক স্বাধীনতা) আমার পক্ষে "intolerable" (যন্ত্রণা-দায়ক) কি না, এবং বাস্তবিক ঐ বিষয়ে আমার "souls anguish" (আত্মার জ্বালা) আছে কি না, তাহা সত্যভাবে আমাকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ইহার পর তিনি লিখিলেন যে অসত্যভাবে, অর্থাৎ লোকের দেখাদেখি অথবা উত্তেজনার বশে কাজ করিলে সেই কার্য্যের প্রতি ভগবদ্দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না, এবং সেই কার্য্য কখনই সফল হইবে না; প্রত্যুত, উহার দ্বারা দেশের অমঙ্গল ঘটিবে। পরিশেষে মহাত্মাজীর পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিলেন—"One perfect civil resister is enough to win the battle of Right against Wrong" অর্থাৎ একটি মাত্র খাঁটি সত্যাগ্রহী দ্বারাই অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধে জয়লাভ হইতে পারে। তিনি মহাত্মাজীর উক্ত বাক্যকে প্রমাণ স্বরূপ করিয়া লিখিলেন যে খাঁটি সত্যাগ্রহী না হইয়া নকল সত্যাগ্রহী হইলে কিছুদিনের জন্য দলপুষ্টি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রীয়-সমস্যা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার আশা সুদূরপরাহত।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রে এই সকল কথা পড়িয়া নিজের কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি আরও সন্দেহের দোলায় দুলিতে লাগিলাম এবং হৃদয়ে শঙ্কা ও উৎকণ্ঠার বোঝা বহন করিয়া মহাত্মাজীর সঙ্গে বম্বে যাত্রা করিলাম।

একবিংশ অধ্যায়

বম্বের দাঙ্গা

১৭ই নভেম্বর প্রাতে বম্বে পৌঁছিয়া দেখি পরিষ্কার আকাশ এবং চতুর্দ্দিক্ কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া সহরের সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশন হইতে বাসায় যাইবার পথে সচরাচর যে সকল দৃশ্য দেখিয়াছি, তদ্ব্যতীত অপর কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম না। কিন্তু আজ যুবরাজ প্রথম ভারতে পদার্পণ করিতেছেন; তাঁহার অভ্যর্থনাকল্পে বম্বেতে আজ রাজশক্তি কত আয়োজন, কত উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদিগের সেই উৎসব ও আনন্দের ঘটা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যে গভীর দুঃখ-দৈন্য আজ ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে লৌহশলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তৎপ্রতি তাহারা একেবারে উদাসীন। শিশুর হস্তে পুতুল দিয়া যেরূপে তাহার ক্রন্দন রোধ করিতে হয়, সেইরূপ ভারতের বর্ত্তমান সঙ্কটে যুবরাজকে ভারতে আনয়ন করিয়া নানা প্রকার তামাসার সাহায্যে লোকের মন ভুলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নতুবা যখন অশান্তি ও বিদ্রোহিতার ঘনঘটা দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, সেই অসময়ে যুবরাজকে ভারত পরিভ্রমণে আহ্বান করিবার অপর কি যুক্তি থাকিতে পারে?

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সরকারের এই কূটনীতি ভেদ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ঐ সময় এক দেশব্যাপী হরতালের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। এই সূত্রে দেশের সর্ব্বত্র রাজমত ও জনমতের সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব প্রবল ও প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। বম্বের সাধারণ জনমণ্ডলী যাহাতে সরকারের রাজনৈতিক চালবাজির দ্বারা প্রতারিত না হয়, সেই জন্য যে সময় যুবরাজ বম্বেতে পদার্পণ করিলেন, ঠিক সেই সময় সহরের অপর প্রান্তে মহাত্মাজীর সভাপতিত্বে এক জনসভার আয়োজন করা হইল। ইতিমধ্যে পূর্ব্ব রাত্রিতে হরতালের আদেশ প্রচার করিবার অভিযোগে বিশ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার, এবং স্বরাজ-সভার অপিস হইতে অবৈধ উপায়ে 'হরতাল'-সম্বন্ধীয় কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষের সমস্ত বিজ্ঞাপন অপসারিত হইল।

কিন্তু এত করিয়াও সরকারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। দেখা গেল যে ইউরেসিয়ান্, এংলোইণ্ডিয়ান্ ও পার্শী-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর জনসাধারণ যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগদান করিল না। এদিকে "এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্" মিল্‌সের ময়দানে যে জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বম্বে আসিয়া মহাত্মাজী কিছুক্ষণ বাসায় বিশ্রাম করিয়া সেই সভায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় শান্তিরক্ষা ও অহিংসার প্রয়োজনীয়তা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বাড়্‌ডোলিতে শীঘ্রই 'শান্তিময় অবাধ্যতা'র অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিবেন; তখন হয়ত সেখানে গোলাগুলি চলিবে, কিন্তু

বাড়্ডোলিতে যাহাই হউক না কেন, বঙ্গের লোকেরা যেন তাহাতে বিচলিত না হয়, ইহাই তাঁহার বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। সভাস্থলে কোন কোন ব্যক্তিকে তখনও বিদেশী টুপি এবং বিলাতি বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সভার একপার্শ্বে বিলাতি বস্ত্রের এক স্তূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব ও পণ্ডিত নেকিরাম শর্ম্মা প্রভৃতি কয়েকজন নেতার বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, মহাত্মাজী সেই বস্ত্রস্তূপে অগ্নিপ্রদান করিয়া সভা ত্যাগ করিলেন। শ্রীযুক্ত রেবাশঙ্করজীর সহিত আমি অপর এক মোটারে বাসায় আসিতেছিলাম। তখন দেখিলাম বড় বড় মোটার লরিতে বহু সংখ্যক কলের মজুর হৈ চৈ করিয়া সভাস্থল হইতে সহরের দিকে যাইতেছে। তাহাদের ব্যবহার অসংযত; এবং এক এক জন দলপতি বাঁশী বাজাইয়া তাহাদের দল পরিচালন করিয়া লইয়া যাইতেছে। চারিদিকে অসংখ্য লোক; সেই ভিড়ের মধ্যে এই ব্যাপারের গুরুত্ব তখন কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইল না। কিন্তু বাসায় আসিবার পথে অপর এক স্থানে আমাদের মোটারে কতকগুলি ঢিল্ আসিয়া পড়িল এবং সেইজন্য মোটার থামান হইলে, ৫।৭ জন অল্পবয়স্ক কলের মজুর আসিয়া লাঠি দিয়া আমাদের মোটারে আঘাত করিতে লাগিল। সেই সময় খদ্দর-পরিহিত এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি উহাদিগকে ধমক্ দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন বেলা ১১॥টা। আমরা ভাবিলাম, ইহা স্থানীয়

দুষ্ট বালকদিগের দুষ্টামি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেইজন্ম বাসায় আসিয়া ঐ কথা আর মনে রহিল না।

কিন্তু বেলা ১টার সময় মহাত্মাজীর নিকট সংবাদ আসিল যে সহরের নানা স্থানে ভীষণ দাঙ্গা ও অরাজকতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি কয়েকজন সহচরকে সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন। তাহার পর বৈকাল ৫টার সময় তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দাঙ্গা মিটাইতে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। বাসায় আসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন যে যতলোক আজ মোটারে চড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিল, সকলকেই গুণ্ডারা নানা প্রকার কষ্ট দিয়াছে, এমন কি খদ্দর-পরিহিত লোকেরাও এই অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। তবে পার্শীরা দেশের জনমতের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগদান করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের উপরই আক্রমণ অত্যধিক হইয়াছে। ঐ অভ্যর্থনা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় তাহাদের বিলাতি পোষাক ও টুপি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক পার্শীকে প্রহার-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইয়াছে এবং দুই একজন পার্শী স্ত্রীলোকদের উপরও অত্যাচার হইয়াছে, এইরূপ শুনা গেল। বহু মদের দোকান ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে। একখানা মোটার ও দুইখানা ট্রামগাড়ী অগ্নিসাৎ করিয়াছে। এক পুলিশ ষ্টেশন ও অপর একটি বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছে। চারিজন পুলিশ লাঠির আঘাতে নিহত হইয়াছে এবং অপর দুইজন এইরূপ জখম হইয়াছে যে তাহাদেরও

জীবনের আশা অল্প। শেষোক্ত দুইজন পুলিশ প্রহরী মুমূর্ষু অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়াছিল, সেই সময় মহাত্মাজী ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে তখন অসংখ্য লোকের গোলমাল ও চীৎকার চলিতেছিল; তদুপরি মহাত্মাজীকে দেখিয়া সেই জনতা "মহাত্মা গান্ধীকী জয়" এই উল্লাসধ্বনি দ্বারা গগন নিনাদিত করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে বলিলেন এবং পুলিশ দুইজনের মুখে জল দিয়া কিছুক্ষণ তাহাদিগের শুশ্রূষা করিলেন। তাহার পর তিনি উহাদিগকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। রাত্রি ১০টা অবধি চতুর্দ্দিকে এইরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিতে লাগিল। এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া মহাত্মাজীর অবস্থা কিরূপ হইল তাহা আর কি বর্ণনা করিব? তিনি নিতান্ত নিরাশ ভাবে রাত্রি ১টা অবধি এত আক্ষেপ, এত খেদ করিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া অবিচলিত থাকিতে পারে এইরূপ পাষাণ-হৃদয় বোধ হয় নাই। ক্ষোভে, দুঃখে অবসন্নপ্রায় হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন যে ৮ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্টের সহিত শেষ বোঝাপড়া করিয়া ফেলিবেন এইরূপ সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া তিনি কার্য্য-পরিচালনা করিতেছিলেন,—কিন্তু সে আশা আজ মিটিয়া গেল। এইজন্য তিনি নিজেই নিজের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। কারণ আজ তাঁহার বক্তৃতার সময় কাহারও কাহারও মাথায় বিলাতি টুপি ছিল দেখিয়া তিনি যখন দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন

তাঁহারই সম্মুখে ঐ টুপি অপর লোকেরা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল। তদ্ব্যতীত, পূর্ব্বেও বহুবার বিলাতি টুপি বলপূর্ব্বক লওয়া হইয়াছে দেখিয়াও তাহার তিনি প্রতিবাদ করেন নাই। এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াই আজ বম্বেতে এই দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিল। প্রথম হইতেই এই প্রকার জোর-জবরদস্তি বন্ধ করিয়া দিবার বুদ্ধি তাঁহার কেন হইল না, ইহা বলিতে বলিতে তিনি মর্ম্মান্তিক খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তদ্ব্যতীত, মহাত্মাজীর বিশ্বাস হইয়াছে যে এই ব্যাপারের অন্তরালে দাঙ্গা পরিচালনার জন্য দল আছে। কারণ তিনি দেখিয়াছেন, সভাসমিতিতে যাহারা সচরাচর উপস্থিত হয়, এই-রূপ শ্রেণীর ভদ্রলোক কোন কোন স্থানে দলপতি হইয়া দাঙ্গা-কারীদিগের নেতৃত্ব করিতেছিল। তাহাতেই তিনি আরও হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন। এক স্থানে তিনি দাঙ্গাকারীদিগকে দলভঙ্গ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা তর্ক করিল এবং তাঁহার কথা শুনিল না। এই ঘটনায় মহাত্মাজীর চিত্তে এমন এক দাগ পড়িয়াছে যে কিছুতেই এখন বাড়্‌ডোলিতে সমষ্টিভূত শান্তিময় অবাধ্যতার কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে না, এইরূপ তিনি মনে করিতেছেন। তাঁহার এই সকল হতাশোক্তি শ্রবণ করিতে করিতে ভারতের দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া চিত্ত স্থির রাখা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল।

পরিশেষে, মহাত্মাজী শ্রীভগবান্‌কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শ্রীভগবান্ এক মহা বিপদ্ হইতে তাঁহাকে

রক্ষা করিয়াছেন এবং এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই এত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বম্বে সহরে উপস্থিত করিয়াছেন। যদি তিনি (মহাত্মাজী) আজ আমেদাবাদে থাকিতেন, তাহা হইলে এই বম্বের ঘটনা সামান্য মনে করিয়া হয়ত ইহা অগ্রাহ্য করিতেন ; কিন্তু যে ভীষণ অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন তাহা তিনি কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। এখন বাড়্‌ডোলিতে সবিনয় অবাধ্যতার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে আরও কি বিপদ্ ঘটিতে পারে কে বলিতে পারে ?”

সেই রাত্রিতেই মহাত্মাজীর স্বরাৎ ও বাড়ডোলি যাইবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করা হইল এবং তখনই বম্বের এই দুঃসংবাদ সহ তিনি দেবদাসকে স্বরাৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং সবিনয় অবাধ্যতা কার্য্যের আয়োজন বর্ত্তমানে স্থগিত থাকিবে, এই আদেশ দেবদাসের মারফৎ প্রেরণ করিলেন। রাত্রি এগারটার পর একদল উৎসাহী অসহযোগী যুবক আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল যে সহর একপ্রকার শান্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও মহাত্মাজীর দুশ্চিন্তা উপশমিত হইল না।

পরদিবস (১৮ই নভেম্বর) দিবাগমে প্রভাতের শান্ত ও সমুজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিলে প্রকৃতি যেন হাসিতেছেন এই প্রকার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এই হাসি কিসের হাসি ? তুমি দেবী, এই সৌন্দর্য্যের ভানে আর মনুষ্যের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। সৌন্দর্য্যের অন্তরালেই তুমি নৃশংসতা লুক্কায়িত রাখ ; নতুবা তোমার এমন সুন্দর পর্ব্বত, উপত্যকা

ও নির্ঝর-সমন্বিত অপরূপ বনমধ্যে হিংস্র শ্বাপদকুলের বাসস্থলী রচনা করিতে না। সেইরূপ, সেই নির্ম্মল কিরণমণ্ডিত উজ্জ্বল দিবসের কুক্ষিতে কত নিষ্ঠুরতা, কত নৃশংসতা লুক্কায়িত ছিল, তাহা পূর্ব্বে কে বুঝিতে পারিয়াছিল ?

প্রাতে সহরের অবস্থার সংবাদ যে প্রকার আসিতে লাগিল তাহাতে বোধ হইল বুঝি লোকের ক্ষিপ্ততার অবসান হইয়াছে; বুঝি সকলে শান্তভাবে পুনরায় দৈনন্দিন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে। কিন্তু সেই স্তব্ধতা যে প্রলয়-তরঙ্গ-প্রবাহিত বায়ুর পূর্ব্বকালীন স্তব্ধতা তাহা তখন কেহই ধারণা করিতে পারে নাই। আঘাত করিলেই প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বের দিন পার্শী, ইউরেসিয়ান ও ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত বম্বেবাসিগণ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকারীদিগের অতর্কিত আক্রমণ বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না; কিন্তু আজ তাহারা উপযুক্ত যুদ্ধসজ্জা করিয়া প্রতিশোধ পিপাসায় উন্মত্তপ্রায় হইল।

এদিকে শান্তি স্থাপনের জন্য সর্ব্বত্র অসহযোগী-মহলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ ও নেতৃবৃন্দ রাস্তা-ঘাটে পরিভ্রমণ করিয়া সহরের উত্তেজনা নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বদিবসের ঘটনা যেরূপ স্বপ্নের ন্যায় আচম্বিতে হইয়া গেল, তাহাতে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল, এবং যথোপযুক্ত প্রতীকারের চেষ্টা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু আজ সকলে প্রাণপণ করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বেলা ৯॥ টার সময় খিলাফৎ কমিটির আপিস্ হইতে

মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবের শ্যালক মোয়াজ্জম আলী সাহেব দুইজন সহকর্ম্মীর সহিত মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন যে তাঁহারা সহরের স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন যে সর্ব্বত্রই শান্তি অব্যাহত রহিয়াছে। এইরূপ আরও কেহ কেহ আসিয়া মহাত্মাজীকে আশ্বাসবাণী শুনাইয়া তাঁহার উদ্বেগ ও চিন্তা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া গেলেন। কিন্তু সাড়ে নয়টার সময় মোয়াজ্জম আলী সাহেব থাকিতে থাকিতে সহসা ঘরের টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল এবং পেরেল মহল্লার কলের মজুরেরা ট্রামগাড়ী চলিতে দিতেছে না ও নিকটবর্ত্তী পার্শী-মহল্লা আক্রমণ করিবে এরূপ আশঙ্কা আছে, এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিল। তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে না হইলে শীঘ্রই দাঙ্গাফেসাদ, রাহাজানি ও অগ্নিকাণ্ডের অভিনয় হইবে, এই কথা শুনাইয়া সংবাদপ্রেরক কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিল। মহাত্মাজী তখন "A Deep Stain" বা "গভীর কলঙ্ক-কালিমা" নাম দিয়া পূর্ব্বদিবসের ঘটনা যাহা যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহার বিবরণ ইংরাজীতে লিখিতেছিলেন। সেই-জন্য তিনি মৌলানা আজাদ সোবানী ও মোয়াজ্জম আলী সাহেব এবং অপর ৫।৬ জন যুবককে তৎক্ষণাৎ পেরেল যাইয়া দাঙ্গা নিবা-রণের জন্য নিয়োগ করিলেন এবং প্রবন্ধটি লেখা সমাপ্ত হইলেই তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত হইবেন, এইরূপ বলিয়া দিলেন।

মৌলানা সাহেব সদলবলে চলিয়া গেলে আরও কি সংবাদ আসে তাহার অপেক্ষায় আমরা ব্যাকুলভাবে কালক্ষেপ করিতে

লাগিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা পরেই দেখি মোয়াজ্জম আলী সাহেব তাঁহারই অপর দুই সহকর্ম্মী সহ একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এ কি ভীষণ দৃশ্য! সকলেরই দেহ রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে! কোথায় তাহাদের মোটার? কোথায় মৌলানা আজাদ সোবানী? কোথায় অপর তিন জন সঙ্গী? মোয়াজ্জম আলী সাহেব অপেক্ষাকৃত অল্প আহত হইয়াছেন, তাহাতেই তিনি ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন যে একদল পার্শী, ইউরেসিয়ান ও ইহুদী তাঁহাদের মোটার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, এবং সকলকেই নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব ও অপর কয়জন জীবিত আছেন কিনা তাহা ইঁহারা বলিতে পারিলেন না। অপর দুইজন খিলাফৎ কর্ম্মী নিজেদের মস্তক ও দেহময় ক্ষত দেখাইয়া আর্ত্তস্বরে, রুদ্ধকণ্ঠে, প্রলাপীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"আমরাও রক্ত দিয়াছি,—আমরাও রক্ত দিয়াছি।" ইঁহাদের শুশ্রূষা আরম্ভ হইলে একে একে অপর তিনজন যুবকও আসিয়া উপস্থিত হইল। হায়! এ কি তাহাদের অবস্থা! একজনের শরীরময় ক্ষত এবং নাসিকার অস্থি ভগ্ন দেখিয়া তাহার জীবন সংশয় এইরূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। অপর দুইজনেরও সুস্থ, সুঠাম দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া জড়পিণ্ডবৎ হইয়া গিয়াছিল। মহাত্মাজীকে দেখিয়া ইহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তিনি সকলেরই নিকট বসিয়া সান্ত্বনা দিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।

এদিকে মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেবের কোন সংবাদ না পাইয়া আমাদের দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু তখন রাস্তায় একক যমের মুখে কে যাইবে? মহাত্মাজী কিছুই না বলিয়া নিজের আসনে স্থির ও গম্ভীরভাবে বসিয়া একমনে প্রবন্ধ-রচনায় নিযুক্ত রহিলেন। তিনি লিখিলেন—

"I am writing this in the midst of six Hindu and Mussalman workers who have just come in with broken heads and bleeding, and one with a broken nasal bone and other lacerated wounds and in danger of losing his life. They went to Parel led by Moulana Azad Sobani and Moazaam Ali to pacify the mill-hands who, it was reported, were holding up tram-cars there. The workers however were unable to proceed to their destination. They returned with their bleeding wounds to speak for themselves." —

অনুবাদ:—আমি এখন ছয়জন হিন্দু এবং মুসলমান কর্ম্মীর সঙ্গে একস্থানে বসিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। রক্তাক্ত দেহে তাহারা সকলে এইমাত্র আসিয়া পঁহছিল। তাহাদিগের মস্তক ফাটিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একজনের নাসিকার অস্থি ভগ্ন এবং সর্ব্বশরীর এরূপ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে যে তাহার প্রাণ সংশয়।

পেরেল মহল্লার কলের মজুরেরা তথাকার ট্রামগাড়ির চলাচল বন্ধ করিতেছিল শুনিয়া ইঁহারা মৌলানা আজাদ সোবানী ও মোয়াজ্জম আলী সাহেবের নেতৃত্বাধীনে তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য যাইতেছিলেন, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারেন নাই, রক্তাক্ত দেহে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহাতেই তাহাদিগের সমস্ত ঘটনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

তাহার পর মহাত্মাজী লিখিলেন—"Thus the hope of reviving mass civil disobedience has once more been dashed, in my opinion, to pieces. The atmosphere for mass civil disobedience is absent. It is not enough that such an atmosphere is to be found in Bardoli and therefore it may go on side by side with the violence in Bombay. This is impossible."

অনুবাদ:—আমার বিবেচনায় সমষ্টিভূত সবিনয় অবাধ্যতা অনুষ্ঠানের পুনঃ প্রবর্ত্তনের আশা দ্বিতীয়বার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ঐরূপ অনুষ্ঠানের উপযোগী অবস্থা এক্ষণে আর দেশে নাই। বাড্‌ডোলিতে উহার অনুকূল অবস্থা আছে, ইহাই যথেষ্ট নহে। বম্বে সহরে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে থাকিলেও বাড্‌ডোলিতে শান্তি অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া সেইখানে অবাধ্যতার অনুষ্ঠান চলিতে পারে এইরূপ যুক্তি সম্পূর্ণ

ভ্রমাত্মক। বাড়্ডোলিতে ঐরূপ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করা একে-বারেই অসম্ভব।

২২শে নভেম্বর তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির স্থরাৎ অধিবেশনে সবিনয় অবাধ্যতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে, এবং কমিটি বাড়্ডোলিকে তাহার অধিকার প্রদান করিবেন, ইহা পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মাজী এই প্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন যে, "বম্বের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বর্ত্তমানে সমষ্টীভূত অবাধ্যতা আদৌ অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে কিনা, তাহা 'ওয়াকিং কমিটি'কে নূতন করিয়া বিচার করিতে হইবে। তাঁহার ইহাই ব্যক্তিগত অভিমত যে দেশে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে জনমণ্ডলীর উপর নেতৃবর্গের প্রভাবও অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার, এবং যতদিন নেতৃবর্গ সেই প্রভাব অর্জ্জন করিতে সক্ষম না হইবেন, ততদিন শান্তিময় বিদ্রোহের অনুষ্ঠান হইতেই পারে না। ঐ কারণ বর্ত্তমানে উক্ত অবাধ্যতার অনুষ্ঠান অসম্ভব, ইহাই তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত। জনসাধারণের মধ্যে শান্তির ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রসারলাভ না হইলে তিনি দায়িত্ব লইয়া 'সবিনয় অবাধ্যতা' সমরে অগ্রসর হইতে পারেন না। এইরূপ বলা তাঁহার পক্ষে খুবই লজ্জাকর, তাহা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার যাহা ক্ষমতা তাহা সরলভাবে ব্যক্ত করিলে অপরে যাহাই মনে করুন, ভগবানের চক্ষে তিনি খাঁটি থাকিবেন। গভর্ণমেণ্টের সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘবদ্ধ হিংসানীতি (organised violence) তিনি অন্যায় মনে

করেন। কিন্তু সাধারণ জনমণ্ডলীর অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হিংসা-প্রবণতা (unorganised violence) তিনি ততোধিক অমার্জ্জনীয় মনে করেন, এবং এই উভয়বিধ আসুরী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যা'ন, তাহাও তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করেন।"

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বঙ্গের দাঙ্গা (২)

সেই আহতের আর্ত্তনাদ ও রক্তপাতের মধ্যস্থলে বসিয়া মহাত্মাজী যে "A deep stain" 'গভীর কলঙ্ককালিমা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমষ্টীভূত শান্তিময় বিদ্রোহিতার অনুষ্ঠানকল্পে অহিংস ও নিরুপদ্রব পন্থা অপরিহার্য্য। মহাত্মাজীর এই শিক্ষা অসহযোগী মহলে সর্ব্বত্র সেই পরিমাণে আদৃত না হওয়াতেই বঙ্গেতে এই বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধ পাঠে ঐ শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে এই বিশ্বাসে সকলকে পুনরায় উহা পাঠ করিতে আহ্বান করিতেছি।

*　　*　　*

বঙ্গানুবাদ

"গভীর কলঙ্ককালিমা"

উত্তেজনার বিশেষ কারণ সত্ত্বেও বঙ্গে-অধিবাসিগণ অহিংস ব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এই বলিয়া সরল প্রাণে গতকল্য প্রাতে আমি এক জনসভাতে তাহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছিলাম। বঙ্গেই আমার আশা-ভরসার স্থল। এই

আশা সুখস্বপ্নের ন্যায় আমি এতদিন পোষণ করিয়া আসিতে-ছিলাম। কিন্তু হায়! যে ক্ষণে আমি ঐ প্রকারে নগরবাসী-দিগের সুখ্যাতি প্রচার করিতেছিলাম, ঠিক সেই ক্ষণেই সহরের অপর এক প্রান্তে বম্বের সুনাম ও সুযশ অতল কলঙ্কসাগরে নিমজ্জিত হইতেছিল। সেই প্রান্তে যে সহরবাসিগণ এক বীভৎস কাণ্ড অভিনয় করিতেছিল তখন তাহা আমার জানা ছিল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনাগুলি আমি প্রথম বিবৃত করিতেছি। পূর্ব্ব রাত্রিতে স্বেচ্ছাসেবকগণ সত্বাধিকারিগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নির্দ্দেশমত কংগ্রেস বিজ্ঞাপনপত্রসমূহ স্থানে স্থানে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল; ইহাই তাহাদিগের অপরাধ। এই অপরাধে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে দলপতিসহ গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ সকল বিজ্ঞাপনে সহরবাসীকে যুবরাজের অভ্যর্থনা বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। প্রাতে দেখা গেল যে বিজ্ঞাপনপত্র গুলি নষ্ট করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, রাত্রিতে কোনও গুপ্ত উপায়ে স্বরাজ-সভার অপিসে প্রবেশপূর্ব্বক অন্যান্য যত কিছু অব্যবহৃত বিজ্ঞাপনপত্র ছিল, সমস্তগুলি অজ্ঞাতসারে অপসৃত হইয়াছিল। অথচ ঐ সমস্ত পত্র যে বে-আইনি সরকার এইরূপ কোন ঘোষণা করেন নাই। বলা বাহুল্য, যে জনমতের বিরুদ্ধে যুবরাজকে ভারতে আনয়ন এবং কৃত্রিম অভ্যর্থনাকল্পে বহুতর রাজকীয় অনুষ্ঠানাদির সৃষ্টি ও আড়ম্বর এবং তাহারই ফলে সাধারণের অর্থশ্রাদ্ধ, এই সমস্তই নাগরিকদিগের প্রাণে অসহ্য উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। তথাপি বম্বে আত্ম-সম্বরণ করিতে

সমর্থ হইল। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে বঙ্গের পক্ষে এইরূপ ব্যবহার বিশেষ প্রশংসার বিষয়। সহরের এক প্রান্তে সরকার স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া বহুল আড়ম্বর সহকারে যুবরাজের অভ্যর্থনা ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। এবং একই কালে বঙ্গের অপর এক প্রান্তে পূর্ব্বোক্ত প্রাতঃকালীন সভাতে স্তূপীকৃত বিদেশীয় বস্ত্র অগ্নিসাৎ করা হইতেছিল। মনে হইল, ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারের কার্য্যকলাপের জ্বলন্ত প্রতিবাদ।

কিন্তু যখন যুবরাজ সুসজ্জিত রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, এবং বিলাতি বস্ত্রের স্তূপ ভস্মীভূত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই সহরের অন্য এক ভাগে কলের মজুরেরা বিদ্রোহীভাবে কর্ত্তৃপক্ষীয়ের আদেশ অমান্য করতঃ বল-প্রয়োগ দ্বারা একে একে সমস্ত কল শূন্য করিয়া কল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। ইতর লোকের জনতা এইরূপে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া ট্রাম-গাড়ী চড়াও করিয়া নিরীহ আরোহীদিগকে পীড়ন করিতেছিল ও ট্রাম-চলাচল বন্ধ করিয়া দিতেছিল এবং যে সকল লোক বিদেশী টুপি পরিয়াছিল, সেই জনতা তাহাদের পাগ্‌ড়ী জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছিল, এবং নিরীহ ইউরোপীয়ান ভদ্রলোকদিগকে ঢিল ছুঁড়িয়া আঘাত করিতেছিল। হায়! এই সমস্ত ঘটনা তখন আমার বিন্দুমাত্র জানা ছিল না। যতই বেলা হইতে লাগিল, ঐ ক্ষিপ্ত জনতা প্রথম সিদ্ধিলাভের উন্মাদনার ফলে, অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সেই অবস্থায় তাহারা বহু ট্রামগাড়ী এবং একটী মোটর গাড়ী পোড়াইয়া দিল, বহু মদের দোকান

ভাঙ্গিয়া চুরমার করিল, এবং দুইটী মদের দোকান জ্বালাইয়া দিল।

বেলা ১টার সময় আমি এই দাঙ্গার সংবাদ পাইলাম। তখনই আমি কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া মোটরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম এবং পার্শী ভগিনীদিগের প্রতি যে ভাবে উৎপীড়ন হইয়াছিল, সেই হৃদয়-বিদারক ও নিতান্ত লজ্জাকর কাহিনী শুনিলাম। তাহাদিগের মধ্যে দুই একজন প্রহৃতও হইয়াছিলেন এবং কাহারও পরিধেয় শাড়ী গাত্র হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। জনৈক পার্শী ভদ্রলোক যখন ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কম্পিত ওষ্ঠে, অথচ প্রত্যেক কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ঐ ঘটনাকাহিনী আমার নিকট বিবৃত করিতেছিলেন, তখন আমার গাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে যে দেড় সহস্রেরও অধিক লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদের কেহই উহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইল না। জনৈক প্রৌঢ় পার্শী ভদ্রলোক আমাকে আবেগ-ভরে বলিতে লাগিলেন—"আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে এই প্রকার উচ্ছৃঙ্খল জনতার কবল হইতে রক্ষা করুন।" পার্শী ভগিনীদিগের উপরে দুর্ব্বিনীত ভাবে হস্ত-ক্ষেপ হইয়াছিল, এই সংবাদ শেলের ন্যায় আমার হৃদয় বিদ্ধ করিল। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন আমার নিজেরই ভগিনী ও কন্যাগণ কোন দুর্ব্বিনীত জনতাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। সত্য বটে, পার্শীদিগের মধ্যে কেহ কেহ যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহারা

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত পোষণ করিতে পারিবে,—কেহই তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না,—এইরূপ অধিকার কি তাহাদিগের ছিল না? জোর-জবরদস্তি করিয়া আমার মত স্বীকারের জন্য অপরকে বাধ্য করাইবার যে চেষ্টা, তাহা ত স্বরাজের লক্ষণ নহে। ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত মোপ্‌লা যখন জোর করিয়া হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল, তখন সে পুণ্য অর্জ্জন করিতেছে বলিয়া মনে করিতেছিল। কিন্তু যদি কোন অসহ-যোগী বা তাহার কোন সহকারী ব্যক্তি অপরের প্রতি বল-প্রয়োগ করে, তবে তাহার সেই অপরাধের কৈফিয়ৎ কি?

জোড়াপুকুরের নিকট পৌছিয়া দেখিলাম, একটী মদের দোকান চূরমার হইয়া গিয়াছে, এবং দুই জন পুলিশ গুরুতর ভাবে আহত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় দুইটী খাটের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, কেহই তাহাদিগকে দেখিবার নাই। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ সেই জনতা আমাকে বেষ্টন করিয়া "মহাত্মা গান্ধীকী জয়" বলিয়া বিকট চীৎকার-ধ্বনি করিতে লাগিল। ঐ শব্দ শুনিলেই আমার কানে বড় বাজে। কিন্তু গতকল্য যখন ঐ জনতা সম্মুখস্থিত দুইজন অসুস্থ ভ্রাতা দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ প্রাণপণে ঐ ভাবে চিৎকার করিতে লাগিল, তখন আমার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল এবং ঐ ধ্বনি এতই কর্কশ বোধ হইতেছিল যে তাহা আর ব্যক্ত করা যায় না। তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করাতে তাহারা চুপ করিল। তখন ঐ দুই আহত ব্যক্তির

জন্য জল আনা হইল, এবং সেই মুমূর্ষু সিপাহী দুইজনকে হাঁসপাতাল লইয়া যাইবার জন্য আমার দুই জন সঙ্গী ও জনতার মধ্যে কয়েকজনকে বলিয়া দিলাম। তাহার পর ঐ স্থান হইতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, অপর একস্থানে অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। তথাকার জনতা দুইটী ট্রামগাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছে, তাহাই জ্বলিতেছে। ফিরিবার সময় দেখিলাম একখানা মোটারগাড়ী জ্বলিতেছে। আমি সেই জনতাকে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিলাম, বলিলাম যে তাহাদের ঐ প্রকার কার্য্যের দ্বারা তাহারা পাঞ্জাব, খিলাফৎ ও স্বরাজ এই তিন মহদুদ্দেশ্যের মর্য্যাদা হানি করিয়াছে। তাহার পর আমি নিরাশ প্রাণে ও অনুতপ্ত হৃদয়ে বাসায় আসিলাম।

বেলা প্রায় ৫টার সময় কয়েকজন নির্ভীক সিন্ধী-যুবক আসিয়া সংবাদ দিল যে ভিণ্ডি বাজারে এক ইতর লোকের জনতা পথিকের মাথায় বিদেশী টুপি দেখিলেই তাহাদিগকে পীড়ন করিতেছে এবং যাহারা টুপি সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিতেছে, তাহাদিগকে গুরুতর প্রহার করিতেছে। একজন বৃদ্ধ তেজস্বী পার্শী ভদ্রলোক উক্ত জনতাকে উপেক্ষা করিয়া পাগ্‌ড়ী পরিহার করিতে অস্বীকৃত হন। তাহার ফলে তিনি জনতা কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছিলেন। মৌলানা আজাদ সোবানী ও আমি ভিণ্ডি বাজারে গেলাম এবং সেই জনতাকে বুঝাইতে লাগিলাম; বলিলাম যে নিরীহ ভদ্রলোকদিগকে পীড়ন করাতে তাহারা ধর্ম্ম হইতে

ভ্রষ্ট হইতেছে। তখন সেই জনতা যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল, এইরূপ ভান করিল।

পুলিশ প্রহরী সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত সংযত হইয়া কার্য্য করিতেছিল। আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলাম। পরে ফিরিবার পথে এক ভীষণ দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম, এক মদের দোকান দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে এবং দমকলের লোক-দিগকেও অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে জনতা বাধা দিতেছে। পণ্ডিত নেকীরাম শর্ম্মা ও অপর কয়েকজনের বিশেষ চেষ্টাতে দোকানের লোকেরা ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে পারিল।

কেবল সহরের গুণ্ডা বা অল্পবয়স্ক বালক লইয়াই যে এই জনতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নহে। উহা যে মূঢ়লোকের সমষ্টি-মাত্র, তাহাও নহে। তাহাদের সকলেই যে কলের মজুর, এরূপও নহে। প্রকৃত পক্ষে উহা এক মিশ্র জনতা। অপর কাহারও কথা মানিতে তাহারা প্রস্তুতও ছিল না, ইচ্ছুকও ছিল না। ঐ সময়ের জন্য তাহাদিগের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল। ঐ জনতাকে একটী জনতা এইরূপ না বলিয়া, কয়েকটী বিভিন্ন জনতার সংমিশ্রণে উহা ন্যূনকল্পে বিশ সহস্র লোকের এক বিপুল জন-সংঘট্ট বলাই ঠিক। তখন ইহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, অনিষ্ট করা ও ধ্বংস করা।

আমি শুনিয়াছি যে দাঙ্গাকারীরা বন্দুকের গুলিও চালাইয়া-ছিল এবং তাহাতে কাহারও কাহারও মৃত্যুও ঘটিয়াছে। ফিরিঙ্গী পাড়ায় যাহারা খদ্দরের টুপি ও সার্ট খুলিয়া যায় নাই তাহাদিগের

সকলকেই গুরুতর প্রহার লাভ করিতে হইয়াছিল। আমি এই-রূপও শুনিয়াছি যে ঐ কারণে বহুলোকের অবস্থা সাঙ্ঘাতিক হইয়াছে। আমি এখন ছয়জন হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মীর সহিত একস্থানে বসিয়া এই লেখা লিখিতেছি। তাহাদিগের মাথা ফাটিয়া গিয়াছে এবং রক্তাক্তদেহে তাহারা এইমাত্র আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজনের নাসিকার অস্থি ভগ্ন এবং সর্ব্বশরীর এত ক্ষতবিক্ষত যে তাহার প্রাণ-সংশয় হইয়াছে। পেরেল মহল্লার কলের মজুরেরা তথাকার ট্রামগাড়ীর চলাচল বন্ধ করিতেছিল শুনিয়া ইহারা মৌলানা আজাদ সোবানী ও মোয়াজ্জম আলী সাহেবের নেতৃত্বে তাহাদিগকে শান্ত করিতে যাইতেছিল। কিন্তু কর্ম্মীরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিল না। রক্তাক্ত ও ক্ষত-দেহেই তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদিগের দেহই তাহাদিগের সকল কথা ব্যক্ত করিতেছে।

এই প্রকারে সমষ্টীভূত শান্তিময় অবাধ্যতা অনুষ্ঠানের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার আশা পুনরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ অনুষ্ঠানের উপযোগী অবস্থা এখন আর দেশে নাই, ইহাই আমি সবিশেষ বুঝিতেছি। বাড়্‌ডোলিতে শান্তিময় অবাধ্যতা অনুষ্ঠানের অনুকূল অবস্থা বর্ত্তমান বলিয়া বম্বে সহরে জুলুম অত্যাচার চলিতে থাকিলেও বাড়্‌ডোলিতে ঐরূপ অনুষ্ঠান চলিতে পারে, একথা বলিলে যথেষ্ট হইবে না। ঐরূপ করা একেবারেই অসম্ভব। বাড়্‌ডোলি ও বম্বে, ইহারা পরস্পর পৃথক্ ও অসম্বদ্ধ-রূপে অবস্থিত, এই ভাবে ইহাদিগকে দেখিলে ঠিক হইবে না।

ইহারা প্রত্যেকেই সমগ্র ভারতের এক বিরাট্, অবিভক্ত সমষ্টির অংশ বিশেষ। মালাবার পৃথক্ করিয়া লওয়া সম্ভব ছিল বটে; মালেগাঁও-এর ব্যাপার উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল বটে; কিন্তু বম্বের ঘটনা অগ্রাহ্য করিয়া চলা একেবারে অসম্ভব।

অসহযোগীদিগেরও দায়িত্ব গুরুতর। ইহাদিগকেও জবাবদিহি করিতে হইবে। জনতা দুর্ব্বৃত্তাচরণ হইতে যাহাতে বিরত বা নিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য অসহযোগীরা ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না লইয়া, এমন কি অনেক স্থলে স্বীয় জীবন-নাশের যথেষ্ট আশঙ্কা সত্ত্বেও সর্ব্বত্র উপস্থিত হইয়া চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা আমি স্বীকার করিতেছি। ইহাও সত্য যে তাহাদিগের চেষ্টার ফলে অনেক মূল্যবান্ জীবনও রক্ষা পাইয়াছিল। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে শান্তিময় অবাধ্যতা অনুষ্ঠানে পুনঃ প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে ঐ যুক্তি যথেষ্ট নহে। উহার দ্বারা এই দাঙ্গার সম্পূর্ণ জবাবদিহিও হইতে পারে না। আমাদিগের চেষ্টার ফলে সমগ্র দেশে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত হইয়াছে এইরূপ আমরা দাবী করি। জনসাধারণের অন্তরে যে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি আছে, তাহার উপর আমাদিগের অহিংস আচরণ দ্বারা আমরা প্রভাব বিস্তার করিয়া ঐ প্রবৃত্তি দমিত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমরা অভিমান করি। কিন্তু ঠিক এই সময় যখন আমাদিগের জয় হইবার কথা, তখনই আমাদিগের পরাজয় হইয়া গেল। গতকল্যই আমাদিগের পরীক্ষার দিন ছিল। কেহই যুবরাজের দেহের প্রতি কোন প্রকার অমর্য্যাদা প্রদর্শন বা তাহার অনিষ্ট সাধন

করিতে পারিবে না, এই ভাবেই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। আমাদিগের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া গেল। কারণ, যে সমস্ত ইংরাজ বা অন্য কেহ যুবরাজের অভ্যর্থনাতে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদিগের একজনের দেহেও যদ্যপি হস্তক্ষেপ কিম্বা একজনও যদ্যপি অপমানিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যুবরাজের প্রতিও অনুরূপ ব্যবহার হইল, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ অভ্যর্থনায় যোগদান না করার পক্ষে আমাদিগের যেরূপ অধিকার, সেইরূপ যোগদানে উহাদের তুল্য অধিকার। এই ব্যাপারে আমার নিজেরও যে দায়িত্ব আছে তাহাও আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। এই বিদ্রোহিতার প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য আমি যে পরিমাণে দায়ী অপর কেহ সে পরিমাণে নহে। সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিয়া উহার নিয়মিতভাবে পরিচালন আমার শক্তির অতীত, ইহাই আমি বুঝিতেছি। ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করিতে হইবে। আমার পক্ষে এই সংগ্রাম মূলতঃ ধর্ম্মেরই সংগ্রাম। প্রার্থনা ও উপবাসে আমি বিশ্বাসী। আজ হইতে যতদিন স্বরাজ লাভ না হয় ততদিন আমি প্রতি সোমবার ২৪ ঘণ্টার জন্য উপবাস-ব্রত গ্রহণ করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প।

যতকাল সাধারণ জনমণ্ডলীর উপর সম্পূর্ণরূপে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে আমরা সক্ষম না হইব, ততকাল সমষ্টীভূত শান্তিময় অবাধ্যতার কথা উত্থাপন করা একেবারে যুক্তিযুক্ত হইবে কি না দেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমি-

টাকে এই বিষয়ের পুনর্ব্বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমি নিজে বিচারপূর্ব্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা এই যে, সমষ্টীভূত অবাধ্যতার অনুষ্ঠান বর্ত্তমানে অসম্ভব। যতদিন সাধারণের পূর্ণরূপে শান্তির স্পৃহা জাগ্রত না হয়, ততদিন শান্তিময় অবাধ্যতারূপ সংগ্রাম পরিচালন করিয়া সুফল লাভ করিব, সেই শক্তি আমার নাই ; ইহা আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি। কি করিব ইহাই আমার চিন্তার বিষয়। আমার অক্ষমতাই নিজ মুখে আমাকে প্রচার করিতে হইতেছে, ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর ব্যাপার, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যাহা নহি, সেই ভাবে লোক-সমক্ষে উপস্থিত না হইয়া, আমি প্রকৃতপক্ষে যাহা তাহাই যদি প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমার ভাগ্যবিধাতা আমার প্রতি অধিক প্রসন্ন হইবেন, ইহা নিশ্চয়। গভর্ণমেণ্টের সুনিয়ন্ত্রিত, সঙ্ঘবদ্ধ পশুশক্তির সহিত সম্পর্কিত হইয়া চলা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু সাধারণ জনমণ্ডলীর অনিয়ন্ত্রিত, উচ্ছৃঙ্খল পশুশক্তির সহিত সম্পর্কিত ভাবে থাকা আমার পক্ষে ততোধিক অসম্ভব। অতএব উভয়বিধ আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাই, ইহাই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শান্তিস্থাপনের চেষ্টা

প্রায় তিন ঘণ্টাকাল পরে মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব নির্ব্বিঘ্নে, অক্ষতদেহে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে আমরা সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। তিনি সংবাদ দিলেন যে, যে সমস্ত লোকের মস্তকে সাদা খদ্দরের টুপি (গান্ধী টুপি) আছে, পার্শী ও ফিরিঙ্গী দাঙ্গাকারীরা তাহাদিগকেই বাছিয়া বাছিয়া নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতেছে। মৌলানা সাহেবের মাথায় টুপি ছিল না, তাহাতেই তিনি রক্ষা পাইয়াছেন এবং দাঙ্গার গোলমালের মধ্যে নিকটে একটি ভাঙ্গা ট্রামগাড়ীর আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। মহাত্মাজী ফকিরের বেশ গ্রহণ করা অবধি মৌলানা সাহেবও নমাজের সময় ব্যতীত অন্য সময় টুপির ব্যবহার পরিহার করিয়াছিলেন।

ভগবান আজ রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা মহাত্মাজী যদি প্রবন্ধ লেখাতে নিযুক্ত না থাকিয়া ঐ সময় পেরেলে যাইবার জন্য বহির্গত হইতেন এবং পার্শী ও ইউরেসিয়ান্ যুবকদিগের দ্বারা প্রহৃত হইতেন, তাহা হইলে কেবল বম্বেতে নহে, সমগ্র ভারতে রক্তনদীর প্রবাহ কেহই রোধ করিতে সমর্থ হইত না।

পার্শী এবং ইউরেসিয়ানগণ যে পরিমাণে এইরূপ দলবদ্ধ হইয়া

খদ্দর-পরিহিত, নিরস্ত্র অসহযোগীদিগকে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, সেই পরিমাণে উহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান জনতা উত্তেজিত হইয়া পড়িল। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পার্শী মহল্লা আক্রমণ করতঃ লুঠ-তরাজ, অগ্নিকাণ্ড এবং আরও নানাপ্রকার বীভৎস ব্যাপারের অভিনয় করিয়া তাহাদের ধর্ম্মের গৌরব এবং ভারতের যশঃ কলঙ্কিত করিল। এই সমস্ত দুর্ঘটনা বিবৃত করিয়া পুস্তকের পৃষ্ঠা মলিন করিতে ইচ্ছা হয় না। আঘাত-প্রতিঘাত, হিংসা-প্রতিহিংসা, এই দুইয়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া বম্বের হিন্দু-মুসলমান, পার্শী ও খৃষ্টান জনসাধারণ পরস্পর অনিষ্ট-সাধনে বদ্ধপরিকর হইল।

পার্শীরা আত্মরক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট বন্দুক ও রিভলভার পাইয়া তাহার সাহায্যে স্থানে স্থানে আক্রমণ করিল এবং বহুসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান হতাহত হইল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকারীদিগের অস্ত্র কেবল লাঠি এবং ইষ্টকাদি, তথাপি সংখ্যার বলে তাহারা কোন কোন পার্শীগৃহে প্রবেশ করতঃ নানারূপ নৃশংস অত্যাচার করিতে লাগিল। দাঙ্গার সময় পুলিশ নিকটে থাকিলেও তাহা নিবারণের চেষ্টা তাহারা করিল না। কোন কোন স্থানে দেখা গেল, তাহারা সাক্ষাৎভাবে পার্শীদিগের সহায়তা করিয়াছে। দিবা দ্বিপ্রহরে পুলিশ চৌকির সম্মুখেই বম্বের সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ী গোবিন্দ বসন্তজীর দোকান সশস্ত্র পার্শী যুবকেরা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিল এবং গোবিন্দজীকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় রাখিয়া গেল। উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত পার্শী যুবকগণ

সেইরূপ মহাত্মাজীরও প্রাণ-সংহারের চেষ্টা করিতে পারে, এই আশঙ্কাতে মহাত্মাজীর বাটীর দ্বারে স্বেচ্ছাসেবকের পাহারা বসান হইল। সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী বাসভবন হইতে কেহ গুলি নিক্ষেপ করিতে না পারে তজ্জন্যও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইল। পার্শীদিগের এই প্রতিশোধ-পিপাসার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। এই দাঙ্গা তাহারা আরম্ভ করে নাই। তাহার পর যে ভাবে তাহাদিগের স্ত্রীজাতির সম্মান দলিত হইয়াছে, তাহাতে এই প্রকার জিঘাংসা ও উন্মত্ততা উহাদের পক্ষে স্বাভাবিক বলিতে হইবে। পরিশেষে, কোনও সময়ে ভারতে যাহা হয় নাই এই দাঙ্গার ফলে তাহাও হইয়া গেল। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান আক্রমণ হইতে ধর্ম্মরক্ষার জন্য পার্শীগণ দেশত্যাগ করিয়া ভারতে আশ্রয় লইয়াছিল। এতাবৎকাল কেহ তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার পবিত্রতা নষ্ট করে নাই। কিন্তু এইবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকারীরা পার্শীমন্দির "আতস বৈরামে" প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে রক্ষিত পার্শীদের সনাতন পবিত্র অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা পার্শীদিগের ক্ষোভ এবং মনস্তাপের কারণ আর কিছু হইতে পারে না। একজন শান্তপ্রকৃতি, বয়োবৃদ্ধ পার্শী এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাঁহাদের সমগ্র সম্প্রদায় সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেও প্রস্তুত।

মহাত্মাজী এই অবস্থায় কি করিবেন? কেহ শারীরিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া, কেহ বা স্বীয় ধনসম্পত্তি অপহৃত,

লুণ্ঠিত বা পরহস্তগত হইল দেখিয়া, কেহ বা পুত্র, কেহ বা কন্যা-রত্ন হারাইয়া মহাত্মাজীকে অভিসম্পাত ও আর্ত্তনাদপূর্ণ পত্র লিখিতে লাগিল। তিনি সেই সকল পত্র উপস্থিত সকলের সমক্ষে পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। তাহাদিগের সেই মর্ম্মান্তিক যাতনা তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল। দাঙ্গা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আহার ত্যাগ করিয়াছেন এবং "A Deep Stain" বা "গভীর কলঙ্ক-কালিমা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এখন হইতে তিনি প্রতি সোমবার ২৪ ঘণ্টা কালের জন্য উপবাসী থাকিবেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখার ন্যায় অরাজকতা যেরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহার উপশমের নিমিত্ত তিনি কি ব্যবস্থা করিবেন? সমস্ত দিনের চিন্তা ও পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া তিনি আমাকে তাঁহার ললাটে ও পৃষ্ঠভাগে তেল মালিস করিতে বলিলেন। কিন্তু একটুও কি বিশ্রামলাভের উপায় আছে? তখনই শ্রীযুক্ত যমুনাদাস দ্বারকাদাস মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া গোপনে রাত্রি দশটা অবধি কি গুপ্তমন্ত্রণা করিয়া গেলেন। তাহার পর মহাত্মাজীর শয়ন করিতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও অবসন্ন দেখিয়া আমি রাত্রিতে তাঁহার নিকট পড়িয়া রহিলাম। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় হঠাৎ উঠিয়া তিনি ঘরের আলো জ্বালিয়া দিলেন। তাহাতে আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কাগজ ও লিখিবার সরঞ্জাম লইয়া দ্রুতবেগে কিছু লিখিয়া ফেলিলেন

এবং আমাকে তাহার তিনখানা নকল করিতে আদেশ করিলেন। বম্বের কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মথুরাদাস ত্রিকমজী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে আমার নিকট ঐ লেখা আবৃত্তি করিয়া যাইতে বলিলেন এবং লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোনরূপ যুক্তি, তর্ক, আপত্তি বা প্রশ্ন করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। এরূপ গম্ভীর স্বরে মহাত্মাজী ঐ কথাগুলি বলিলেন যে উহার উপর কিছু বলা নিতান্ত দুঃসাহসিক ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভবপর হইত না। তিনি ইংরাজীতে যাহা লিখিলেন, তাহা অবিকল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

MEN AND WOMEN OF BOMBAY

"It is not possible to describe to you the agony I have suffered during the past two days. I am writing this now at 3-30 A. M. in perfect peace. After two hours' prayer and meditation I have found it.

"I must refuse to eat or drink anything but water, till the Hindus and Musalmans of Bombay have made peace with the Parsis, the Christians and the Jews, and till the non-co-operators have made peace with the co-operators.

"The Swaraj that I have witnessed during

the last two days has stunk in my nostrils. Hindu-Muslim unity has been a menace to the handful of Parsis, Christians and Jews. The non-violence of the non-co-operators has been worse than the violence of co-operators. For with non-violence on our lips we have terrorised those who have differed from us, and in so doing we have denied our God. There is only one God for us all, whether we find Him through the Koran, the Bible, the Zend-Avesta, the Talmud, or the Gita. And He is God of Truth and Love. I have no interest in living save for proving this faith in me. I cannot hate an Englishman, or any one else. I have spoken and written much against his institutions, especially the one he has set up in India. I shall continue to do so if I live. But you must not mistake my condemnation of the system for that of the man. My religion requires me to love him as I love myself. I would deny God if I did not attempt to prove it at this critical moment.

"And the Parsis? I have meant every word

I have said about them. Hindus and Musalmans will be unworthy of freedom if they do not defend them and their honour with their lives. They have only recently proved their liberality and friendship. The Musalmans are especially beholden to them, for the Parsis have, compared to their numbers, given more than they themselves to the Khilafat funds. Unless Hindus and Musalmans have expressed full and free repentance, I cannot face again the appealing eyes of Parsi men and women that I saw on the 17th instant as I passed through them. Nor can I face Andrews when he returns from East Africa, if we have done no reparation to the Indian Christians whom we are bound to protect as our own brothers and sisters. We may not think of what they or the Parsis in self-defence or by way of reprisals have done to some of us.

"You can see quite clearly that I must do the utmost reparation to this handful of men and women who have been the victims of forces that have come into being largely through my instru-

mentality. I invite every Hindu and Musalman to do likewise. But I do not want any one to fast. Fasting is only good when it comes in answer to prayer, and as a felt yearning of the soul. Invite every Hindu and Musalman to retire to his home, ask God for forgiveness and to befriend the injured communities from the bottom of his heart.

"I invite my fellow-workers not to waste a single word of sympathy for me. I need or deserve none. But I invite them to make a ceaseless effort to regain control over the turbulent elements. This is a terribly true struggle. There is no room for sham or humbug in it. Before we can make any further progress with our struggle, we must cleanse our hearts.

"One special word to my Musalman brothers. I have approached the Khilafat as a sacred cause. I have striven for Hindu-Moslem unity, because India cannot live free without it and because we would both deny God if we considered one another as natural enemies. I have thrown my-

self into the arms of the Ali brothers because I believe them to be true and God-fearing men. The Musalmans have to my knowledge played the leading part during the two days of carnage. It has deeply hurt me. I ask every Musalman worker to rise to his full height, to realise his duty to his faith and see that the carnage stops.

"May God bless every one of us with wisdom and courage to do the right at any cost."

I am,

Your servant,

19th November, 1921. M. K. Gandhi.

অনুবাদ:—বঙ্গের নরনারীগণ, গত দুই দিবস আমি যে প্রকার মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়াছি তাহা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। এখন রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকা। এই সময় পূর্ণ শান্তিতে আমি এই পত্র লিখিতেছি। দুই ঘণ্টাকাল প্রার্থনা ও ধ্যানের পর আমি এই শান্তি লাভ করিয়াছি।

"বঙ্গের হিন্দু এবং মুসলমানগণ যত দিন না পার্শী, খ্রীষ্টান্ ও ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত বঙ্গবাসীর সহিত, এবং যত দিন না বঙ্গের অসহযোগিগণ সহযোগপন্থাবলম্বীদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিবেন, ততদিন আমি মাত্র জলগ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ

করিব। অপর কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিব না, ইহাই আমার স্থির সঙ্কল্প।

"গত দুই দিবস যে প্রকার স্বরাজের নমুনা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার পূতিগন্ধ আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। পার্শী, খ্রীষ্টান্ ও ইহুদীগণের সংখ্যা অতি অল্প। এখন দেখিতেছি যে হিন্দু-মুসলমানের একতা ঐ মুষ্টিমেয় দেশবাসীর পক্ষে বিষম উদ্বেগ ও ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরও দেখিতেছি যে, তুলনায় সহযোগীদিগের হিংসা-পদ্ধতি অসহযোগীদিগের অহিংসপদ্ধতি অপেক্ষা অধিক জঘন্য। কারণ আমরা অহিংসার বাক্য উচ্চারণ করিলেও কার্য্যতঃ বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর বলপ্রয়োগে তাহাদিগের প্রাণে ভীতিসঞ্চার করতঃ তাহাদিগকে শাসনাধীনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপ কার্য্য দ্বারা আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের আরাধ্য দেবতাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছি। আমাদের সকলের সেই একই পরমেশ্বর। কোরাণ বা বাইবেল্, বা জেন্দ্ আভেস্তা, বা ট্যালমাড্ বা গীতা, সমস্ত শাস্ত্রই সেই এক পরমেশ্বরের নির্দ্দেশ করিয়াছে। সেই পরমেশ্বর সত্য এবং প্রেমের আধার। প্রাণের এই বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান ব্যতীত আমার জীবন-ধারণের অপর কোন ইষ্ট নাই। আমি ইংরাজ বা অপর কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারি না। ইংরাজ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে—বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে যে প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে—তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা

বা লেখনীর সাহায্যে অনেক কথা প্রচার করিয়াছি। জীবিত থাকিলে ঐরূপ প্রতিবাদ করিতে আমি বিরত হইব না। কিন্তু আমার এই প্রতিবাদ ইংরাজের প্রতিষ্ঠান বা শাসন-পদ্ধতির প্রতিবাদ। উহা দ্বারা আমি ব্যক্তিগতভাবে ইংরাজকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তৎপ্রতি অপ্রীতি, ঘৃণা বা শত্রুভাব পোষণ করিতেছি, কাহারও এইরূপ ভ্রম যেন না হয়। নিজেকে আমি যে প্রকার ভালবাসি, তাহাকেও সেইরূপ প্রীতির চক্ষে আমাকে দেখিতে হইবে, ইহাই আমার প্রতি আমার ধর্ম্মের অনুশাসন। এই ঘোর সঙ্কটকালে যদি আমি আমার এই প্রাণের বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে পশ্চাৎপদ হইতাম, তাহা হইলে বস্তুতঃ আমার পক্ষে পরমেশ্বরকেই অস্বীকার করা হইত।

"আর পার্শীদিগের সম্বন্ধে আমার অধিক কি বলিবার আছে? পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইহাদিগের বিষয় যাহা আমি বলিয়াছি তাহার প্রত্যেক কথাই আমার অন্তরের কথা। প্রাণ দিয়াও হিন্দু-মুসলমানদিগকে পার্শীদিগের প্রাণ রক্ষা ও ইজ্জৎ রক্ষা করিতে হইবে। ইহা যদি না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহারা স্বাধীনতা লাভের অযোগ্য। অল্প পূর্ব্বেই পার্শীদিগের বদান্যতা ও সহৃদয়তার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। আর মুসলমানেরা ত বিশেষভাবে পার্শীদের নিকট ঋণী; কারণ মুসলমানগণ নিজেরা খিলাফৎ ভাণ্ডারে যে পরিমাণ অর্থদান করিয়াছে, সংখ্যার অনুপাতে পার্শীরা তদপেক্ষা অধিক দান করিয়াছে। ১৭ই তারিখে আমি যখন রাজপথ দিয়া যাইতেছিলাম তখন পার্শী স্ত্রী-

পুরুষদিগের যে করুণ দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইয়াছিল তাহা আমার অন্তঃস্তল ভেদ করিয়াছে। এখন যদি হিন্দু-মুসলমানগণ তাহাদের কৃতাপরাধের জন্য পার্শীদিগের নিকট অকপটে পূর্ণ অনুতাপ জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে কি করিয়া আমি তাহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইব? তাহার পর, দেশীয় খ্রীষ্টান্‌দিগের কথা। আমাদিগের ভাই-ভগিনীর ন্যায় তাহাদিগকে রক্ষা করিতে আমরা বাধ্য। তাহা না করিয়া তাহাদিগের প্রতি আমরা নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি; সেই অপরাধের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত-হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রায়শ্চিত্ত যদি না হয় তাহা হইলে এণ্ড্রুজ্ যখন পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগমন করিবে, তখন কিরূপে আমি তাহাকে মুখ দেখাইব? আত্মরক্ষা অথবা প্রতিশোধ-কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পার্শী বা দেশীয় খ্রীষ্টান্‌গণ আমাদিগের কাহারও কাহারও প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে তাহা এস্থলে গণনার বিষয়ই হইতে পারে না।

"এখন আপনারা স্পষ্টই বুঝিবেন যে আমার যতদূর সাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রী-পুরুষদিগের ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা আমাকে করিতেই হইবে। যে অরাজক শক্তির কবলে পড়িয়া ইহারা উৎপীড়িত হইয়াছে তাহার আবির্ভাবের জন্য আমিই প্রধানতঃ দায়ী। পার্শী ও খ্রীষ্টান্ স্ত্রী-পুরুষদিগের প্রতি কৃতাপরাধ স্থালনের জন্য আমি প্রত্যেক হিন্দু ও প্রত্যেক মুসলমানকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আহ্বান করিতেছি। কিন্তু আমার ন্যায় কেহ উপবাস-ব্রত গ্রহণ করেন, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। কারণ

উপবাস তখনই সার্থক হইতে পারে যখন মানুষ প্রার্থনা দ্বারা উহার প্রেরণা লাভ করে এবং আত্মার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করিয়া উহা অনুষ্ঠান করে। অতএব প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমানের নিকট আমার এই অনুরোধ যে তিনি নিজ গৃহে যাইয়া ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, এবং উৎপীড়িত সম্প্রদায় সকলকে নিতান্ত আত্মীয় বোধে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হউন।

"সহকর্ম্মীদিগের প্রতি আমার এই অনুরোধ যে তাহারা যেন কেহই আমার প্রতি সহানুভূতি-সূচক বৃথা বাক্যব্যয় না করে। আমার কোন প্রকার সহানুভূতির প্রয়োজন নাই এবং সহানুভূতির উপযুক্ত পাত্রও আমি নহি। তবে তাহা-দিগের প্রতি আমার একটি বিশেষ আহ্বান আছে। সহরের মধ্যে শান্তিভঙ্গকারী যে সমস্ত দল আছে, তাহাদিগের উপর কিরূপে পুনরায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারা যায়, তাহার জন্যই তাহারা অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে থাকুক। সত্য সত্যই আমাদিগের এই সংগ্রাম এক ভীষণ সংগ্রাম। ইহাতে কোন প্রকার চালাকির স্থান নাই। যদ্যপি আমরা ইতিমধ্যে আমাদের কৃত্রিমতা বা ভিতরকার ময়লা পরিষ্কার করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে এই সংগ্রামে আর অগ্রসর হওয়া আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

"মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি আমার একটি কথা বিশেষ ভাবে বলিবার আছে। খিলাফৎ একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান—এই বিশ্বাসেই

আমি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। হিন্দু-মুসলমানদিগের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের জন্য আমি বিধিমত চেষ্টা করিয়াছি। তাহার প্রথম হেতু এই যে আমি বুঝিয়াছি যে, সেই ঐক্য-স্থাপনের উপরই ভারতের স্বাধীন জীবন নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয় হেতু এই যে বস্তুতঃই যদি হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পর পরস্পরকে স্বভাবগত শত্রুরূপ জ্ঞান করে, তাহা হইলে তাহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। আলিভ্রাতৃদ্বয় সাচ্চা ও ধর্ম্মভীরু পুরুষ, এই বিশ্বাসে আমি তাহা-দের হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিতে পারিয়াছি। এই দুই দিনের বিরাট্ হত্যাকাণ্ডে মুসলমানগণই অগ্রণী ছিল, ইহা আমি অবগত হইয়াছি। ইহাতে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে। অতএব মুসলমান-কর্ম্মীদিগকে বিশেষভাবে আমি এই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা প্রত্যেকে আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন, স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহাও হৃদয়ঙ্গম করুন, এবং এই হত্যাকাণ্ডের শান্তিবিধানে বদ্ধপরিকর হউন।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি আমাদিগের প্রত্যেককেই এইরূপ বুদ্ধি ও সাহস প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন যে তাহার বলে শত বাধা সত্ত্বেও আমরা কর্ত্তব্য-পালনে পশ্চাৎপদ হইব না ; ইতি—

আপনাদিগের সেবক

১৯শে নভেম্বর, ১৯২১ এম্, কে, গান্ধী”

এই নিবেদন-পত্র ইংরাজী, গুজরাটি, মারাঠী এবং উর্দ্দু, এই চারি ভাষায় মুদ্রিত হইয়া ১৯শে নভেম্বর তারিখ, অর্থাৎ দাঙ্গার তৃতীয় দিবসে বম্বে নগরীর সর্ব্বত্র অজস্র বিতরিত হইতে লাগিল। কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার আরম্ভ হইলেও, নদীতে বহুক্ষণ ভাটার জোর থাকে; সেইরূপ মহাত্মাজী কর্ত্তৃক শান্তির ভেরীবাদন হইলেও তাহার প্রভাব জনতা মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করিতে কিছু সময় লাগিল। এদিকে বেলা ১২টার সময় মহাত্মাজীর আবাসস্থলের মাত্র দশ মিনিট পথ দূর হইতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একজন স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে স্বহস্ত-লিখিত এই সংবাদ পাঠাইলেন—"Please send a surgeon immediately, men dead, dying and wounded lying on the road,"—অর্থাৎ, অনুগ্রহ করিয়া একজন অস্ত্র-চিকিৎসক অবিলম্বে পাঠাইয়া দিবেন। এখানে রাস্তার উপর বহু হত, আহত এবং মুমূর্ষু ব্যক্তি পড়িয়া আছে। সকল দলই তুল্যরূপে উত্তেজিত হইয়াছে। কত লোক যে জখম্ এবং খুন হইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা করিবার কোন উপায়ই রহিল না। মিনিটে মিনিটে সহরের চারিদিক্ হইতে টেলিফোনে সংবাদ আসিতে লাগিল যে, দাঙ্গা-ফেসাদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি টেলিফোন্ যন্ত্র কাণে দিয়া বসিয়া রহিল। এদিকে আমাদিগের স্থান হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাঠাইবার পথ বন্ধ। কারণ, কিছুতেই হেড আপিস 'connection' (অর্থাৎ, তার যোগ করিয়া)

দিতে ছিল না। মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেবের সঙ্গী, আনওয়ার একবার বাহিরে গিয়া দেখিয়া আসিল যে দুই জন খদ্দর-পরিহিত যুবক মৃতাবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে। সিপাহীরা গুলি করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে; তাহাদিগের তাজা রক্তে মাটি রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আনওয়ারের মাথায় টুপি ছিল না, সেই জন্য কেহ তাহাকে উৎপীড়ন করে নাই। এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া আসিয়া আন্ওয়ার বিষণ্ণ চিত্তে ঘরের এক কোণে বসিয়া রহিল। ইহার পর সংবাদ পাওয়া গেল যে বহু সহস্র মাওয়ালী গুণ্ডা নিকটবর্ত্তী এক পার্শী মহল্লা আক্রমণ করিয়া কোন কোন বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র মহাত্মাজী খিলাফৎ-কমিটির অন্যতম সেক্রেটারী ক্ষেত্রি সাহেবকে দাঙ্গাস্থলে পাঠাইয়া দিলেন। বম্বের মুসলমান সমাজে ক্ষেত্রি সাহেবের অপ্রতিহত প্রভাব। দাঙ্গার প্রথম দুই দিন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়া ছিলেন, নচেৎ দাঙ্গা এত বৃদ্ধি পাইত না। খিলাফৎ-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছোটানী মিঞাও ঐ সময় বম্বেতে উপস্থিত ছিলেন না। যাহা হউক্, ক্ষেত্রি সাহেব যাইয়া মাওয়ালীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং তাহাদিগের দলপতিকে মহাত্মাজীর নিকট লইয়া আসিলেন। সেই ব্যক্তি আসিয়াই "হুজুর, আমাদের দেহে প্রাণ থাকিতে আপনার দেহে কেহ কি হাত দিতে পারে?"—এই বলিয়া ক্রোধে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। পরে তাহার নিকট শুনিলাম যে পার্শীরা মহাত্মাজীকে প্রহার

করিয়াছে, এই গুজব সহরে রাষ্ট্র হইয়াছিল এবং তাহারই প্রতিশোধ-কামনায় ইহারা পার্শী মহল্লা আক্রমণ করিয়াছিল। মহাত্মাজী প্রথমে উহার কথার কোন উত্তর করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইলে তিনি গম্ভীরভাবে তাহাকে বলিলেন,—"আপনার কথা শুনিয়া আমি তুষ্ট হইলাম না। আপনাদের এই পন্থা আমার পন্থা নহে। কত সময় কত সরকারি রেজিমেণ্টের সিপাহী আসিয়া আমার নিকট বিদ্রোহ করিবার হুকুম চাহিয়াছে; কিন্তু আমি হুকুম দেই নাই। কেবল তাহা নহে, তাহাদের পদ্ধতিকে আমি নিন্দা করিয়াছি। এইরূপ খুন-খারাপির কাজে আপনারা আমার সহানুভূতি কখনই পাইবেন না।" এই বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া অন্য কাজে মন দিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

দেহত্যাগের সঙ্কল্প

দেবদাসকে মহাত্মাজী দুই দিন পূর্ব্বে সুরাতে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু আজ (১৯শে নভেম্বর) তাহাকে তার করিয়া পুনরায় বম্বে লইয়া আসিলেন। দেবদাস আসিলে সকলের নিকট মহাত্মাজী বলিতে লাগিলেন যে ইহার পর কোথাও নিকটে দাঙ্গা লাগিলে তিনি দেবদাসকে বলিস্বরূপ পাঠাইবেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহাকে সুরাৎ হইতে বম্বেতে আনা হইয়াছে।

একে উপবাস চলিতেছে, তাহার উপর তিনি কি যে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। ক্রমশঃই শরীর কঙ্কালসার হইতে লাগিল, কিন্তু দাঙ্গা নিবারণের জন্য পরামর্শ করিতে বহুলোক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিত, এবং তিনিও বিপুল উৎসাহে তাহাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে ব্যস্ত রহিলেন। এক এক সময় আমার মনে হইতে লাগিল যেন আহার বন্ধ করিয়া তাঁহার শরীরের তেজ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তিনিও বলিতে লাগিলেন,—"আহার না করিয়া বেশ আছি, অন্তরে এক অখণ্ড শান্তি অনুভব করিতেছি। আহারে, শরীরে জড়তা ও নিদ্রা আসে। এখন মলমূত্র-ত্যাগের হাঙ্গামাও নাই, নিদ্রার হাঙ্গামাও নাই,

দিবারাত্রি একটানা নিজের মনে নিজে বেশ আছি।" শুশ্রূষার জন্য আমি সর্ব্বদা যথাসম্ভব নিকটেই থাকিতাম, কিন্তু তিনি শুশ্রূষার বিশেষ অপেক্ষা করিতেন না। ঘরের বাহিরে কখনও তাঁহাকে যাইতে হইলে তিনি যেরূপ টলিতে টলিতে চলিতেন তাহা দেখিয়া ভয় হইত। কিন্তু তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে ভরসা হইত না। তিনিও কোনরূপ সাহায্য চাহিতেন না। তবে পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই দেখিয়াছি যে কখন কখন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, তাহাও অপর কাহার প্রতি নহে। যাহারা সর্ব্বদা নিকটে থাকিত, তাহাদের মধ্যে কেহ কোনরূপ অসংলগ্ন কথা কহিলে কিম্বা মূর্খের ন্যায় কোন কার্য্য করিলে, তিনি দুই একবার একটু ধমক দিতেন। আর একবার দেখিলাম একজন পার্শী ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া লম্বা চৌড়া এক বক্তৃতার পর ইউরেসিয়ান্‌দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, উহাদের জন্মের ঠিক্ নাই, উহাদেরই সমস্ত দোষ, ইত্যাদি। তখন মহাত্মাজী আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন —"এই তোমাদের স্বরাজ ; এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া তোমরা স্বরাজ লাভ করিবে? আজ তুমি বলিবে ইউরেসিয়ান্‌দিগের জন্মের ঠিক্ নাই ; কাল ইউরেসিয়ান্‌গণ বলিতে থাকিবে, পার্শীদের জন্মের ঠিক নাই। এই পচা দুর্গন্ধময় স্বরাজের মূর্ত্তি আর দেখাইও না।" সেই ব্যক্তি তখন লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। তাহার বিশ্বাস ছিল যে ইউরেসিয়ান্-

দিগের উপর দোষারোপ করিলে মহাত্মাজীর দুঃখ ও আক্ষেপের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু মহাত্মাজী যে অপরের কুৎসা আদৌ সহ্য করিতে পারেন না, তাহা সেই ব্যক্তি জানিতেন না।

আজ (১৯শে নভেম্বর) মধ্যে মধ্যে কথা-প্রসঙ্গে মহাত্মাজী দেহত্যাগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, এবং বেলা ৩ টার সময় আমাকে নিকটে বসাইয়া হিন্দীতে এই কথাগুলি বলিলেন,—"আমার দেহ আর কয় দিন জীবিত থাকিবে তাহা বলিতে পারি না। এই দাঙ্গার অবসান হইলেই যে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইবে তাহা নহে। গভর্ণমেণ্টের সহায়তা প্রার্থনা করিলে গোলাগুলির সাহায্য দ্বারা তাহারা দুই ঘণ্টা কালেই এই দাঙ্গার শান্তি করিয়া দিতে পারে। দুই পক্ষ লড়াই করিতে করিতে যখন অবসন্ন হইয়া পড়িবে তখনও এক প্রকার শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। সেইরূপ শান্তি আমি চাহি না। আমার চিত্তে শান্তির যে ছবি আছে তাহা অন্যরূপ এবং তাহা যতক্ষণ ফুটিয়া না উঠিবে ততক্ষণ আমি আহার গ্রহণ করিব না। লোকে যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচার বুদ্ধির সাহায্যে এবং হৃদয় হইতে পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাবে শান্তি বরণ করিয়া লইবে তখনই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু এই আদর্শানুরূপ শান্তিস্থাপন বর্ত্তমান অবস্থায় দুরূহ। সেইজন্য আমার শরীরের কি হয় বলা যায় না।"

তাহার পর বলিলেন,—"আগামী সপ্তাহের 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'

আমি ভার্লরূপই চালাইতে পারিব। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বহস্তে লিখিবার শক্তি আমার আর থাকিবে না। তখনও তোমাকে "dictate" করিয়া (মুখে বলিয়া) কিছু "matter" (লেখা) পাঠাইতে পারিব। তুমি সতীশ বাবুকে লেখ যে তিনি যদি দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য কিছু লিখিয়া পাঠাইতে পারেন তাহা হইলে ভাল হয়। তাহার পর হয় কাশী হইতে, না হয় আশ্রমে আসিয়া, যদি তিনি 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'র ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি সুখী এবং নিশ্চিন্ত হইব। আমার বিশ্বাস, তিনি এই আন্দোলনের মূল সত্য সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় সপ্তাহের পর বোধ হয় আমার আর সংজ্ঞা থাকিবে না।"

ইহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি নিজেই তাঁহাকে লিখিব কি?" আমি উত্তর করিলাম—"না, আমি লিখিলেই চলিবে।"

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

দাঙ্গার শান্তি

বম্বের দাঙ্গার জন্য মহাত্মাজী দেহত্যাগে এক প্রকার কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে উপবাস আরম্ভ করিয়াছেন,—ইহা যখন তাঁহার সহকর্ম্মিগণের হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন তাহাদিগের অন্তরের অবস্থা আর কি বর্ণনা করিব? শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আজাদ সোবানী, শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল বেঙ্কার, পার্শী-নেতা শ্রীযুক্ত ভরোচা প্রভৃতি সকলেই তখন প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া যেখানে দাঙ্গা, যেখানে যুদ্ধসজ্জা, যেখানে হত্যাকাণ্ডের খবর পাইলেন, সেই সেই স্থানে যাইয়া তন্মধ্যে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক শান্তি-বিধানে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহাদের সকলকেই এই ব্যাপারে কিছু-না-কিছু প্রহার লাভ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। জীবন যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি যেরূপে হউক্ দাঙ্গার শান্তি বিধান করিয়া মহাত্মাজীর প্রাণরক্ষা করিতে হইবে, ইহাই তাহাদিগের পণ হইল। একবার মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব পার্শীদিগের দ্বারা লগুড়াঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাসায় উপস্থিত হইলেন। পৌঁছিয়াই শুনিলেন অপর এক স্থানে কলের মজুরেরা দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তখনই

তিনি তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য দৌড়িলেন। মৌলানা সাহেবের বিদ্যাবত্তার অন্ত নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এইরূপ নির্ভীকতা ও পরিশ্রমসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা ধারণা করিতে পারি নাই। বাস্তবিক, বিপদের অবস্থায় মানুষের কার্য্য দেখিয়া তাহার মহত্ত্ব এবং অন্তর্নিহিত শক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য সময় সেইরূপ কিছুতেই হয় না।

শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল সম্বন্ধে একবার এই দুঃসংবাদ আসিল যে একদল সশস্ত্র পার্শী তাঁহাকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়াছে এবং বোধ হয় তাঁহার প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই। মহাত্মাজী ইহা শুনিয়াও বিচলিত হইলেন না। আমরা দুর্ভাবনার তাড়নায় প্রতি সেকেণ্ড, প্রতি মিনিট গণিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি ভগবদিচ্ছায় শঙ্করলাল সুস্থ দেহে, সহাস্যবদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পার্শীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সত্য; শঙ্করলাল তখন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া, মৃত্যু অবধারিত জানিয়া চীৎকার করিতে করিতে ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় পাইয়াও পার্শীরা তাঁহার শরীরে কিছুমাত্র আঘাত করিল না এবং অবশেষে তাঁহাকে অব্যাহতি দিল। আজ এই দাঙ্গার ফলে শঙ্করলালের দুঃখের ও ক্ষোভের অবধি নাই। তিনিই মহাত্মাজীকে তারের উপর তার করিয়া এই সময় বম্বেতে উপস্থিত করিয়াছিলেন, নচেৎ মহাত্মাজী কখনই আসিতেন না। এখন মহাত্মাজী যদ্যপি প্রায়োপবেশনে প্রাণ

ত্যাগ করেন, তাহা হইলে শঙ্করলালই বা কি করিয়া জীবন ধারণ করিতে স্বীকৃত হইবেন? একবার দেখিলাম শঙ্করলাল মহাত্মাজীকে একাকী পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে বলিতেছেন,—"দোহাই তোমার! এত নিষ্ঠুর হইও না; আমরাও প্রাণপণ করিয়া দাঙ্গা শান্তির চেষ্টা করিতেছি; দোহাই, তুমি আহার গ্রহণ কর।" মহাত্মাজী মুখে কোন উত্তর না করিয়া, কেবল মাথা নাড়িয়া কঠোর ভাবে তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহাশয়ারও দুঃসাহসের অন্ত নাই। এক এক স্থানের দাঙ্গার মধ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাত পা নাড়িয়া তিনি তাঁহার বীরত্বের কাহিনী মহাত্মাজীর নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে কে কিরূপ কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছে তাহাও তিনি অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অভিনয় করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি মহাত্মাজীর এত কষ্ট এবং উদ্বেগের মধ্যেও তাঁহাকে সময়ে সময়ে বেশ একটু হাসাইয়া যাইতে লাগিলেন।

তাহার পর ভরোচা মহাশয়ের কথা। তাঁহার নম্রতা, দীনতা ও কোমলতার তুলনা নাই। তীরবেগে অবিশ্রান্ত ভাবে মোটার চালাইয়া তিনি সহরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং এক একবার আসিয়া মহাত্মাজীকে সংবাদ দিতে লাগিলেন— "ভিণ্ডিবাজার শান্ত", "পয়ধুনি শান্ত", "ধোবিতলাও শান্ত", "মদনপুরা শান্ত" ইত্যাদি। তাহার পর যুক্তকরে "আর্ হুকুম",

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় হুকুমের প্রতীক্ষা করিতেন। মহাত্মাজী ঈষৎ হাসিয়া ইঙ্গিতে বলিয়া দিতেন যে তাঁহার কোন "হুকুম" নাই। তখন ভরোচা মহাশয় রাজদরবার হইতে বিদায় লইবার প্রথামত কত সম্ভ্রমের সহিত, কত সন্তর্পণে পশ্চাদ্দিকে পদক্ষেপ ও কুর্নিশ করিতে করিতে পুনরায় সহরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে ধাবিত হইতেন।

ইতিমধ্যে মহাত্মাজীর যে নিবেদন-পত্র সহরের সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছিল, দাঙ্গার চতুর্থ দিবসে (২০শে নভেম্বর) জনতার উপর তাহার প্রভাবের লক্ষণ দেখা দিল। কারণ মহাত্মাজী উপবাসী আছেন এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়াতে সকাল হইতেই তাঁহার আবাসস্থলের সম্মুখস্থ পথে দলে দলে লোক আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। তাহাদের সকলের মুখেই এক প্রার্থনা, "মহাত্মাজী উপবাস ভঙ্গ করুন।"

ঐ নিবেদন-পত্রের ফলে সেই দিন প্রাতে মহাত্মাজীর কামরায় পার্শী, মুসলমান এবং হিন্দু, এই তিন সম্প্রদায়ের বহু প্রতিনিধি মিলিত হইয়া এক যুক্ত-সভা করিলেন। কি পদ্ধতি অবলম্বনে সহরে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, ইহাই সভার বিচার্য্য বিষয়। বহু বাদ-বিতণ্ডা ও তর্কের পর মহাত্মাজী এইরূপ স্থির করিয়া দিলেন যে, যেহেতু পার্শীরা সংখ্যায় অল্প, এবং সম্প্রদায় হিসাবেও দুর্ব্বল, তখন তাহারা যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিবে, হিন্দু-মুসলমানগণ তাহাই অবিচারে গ্রহণ করিবে। এইরূপে তিনি পার্শীদিগের উপর সমস্ত বিষয়ের বিবেচনার ভার অর্পণ করিলেন।

হিন্দুদিগের ইহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না; কিন্তু মুসলমান প্রতিনিধিগণ মহাত্মাজীর এইরূপ নিষ্পত্তি স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী মুসলমানদিগকে এই দাঙ্গার জন্য প্রধানভাবে দায়ী করিয়াছেন, এই কারণ তাহাদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল। যাহা হউক্, অবশেষে সকলেই মহাত্মাজীর সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইলেন।

বৈকালে পার্শী, হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান্ সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ একযোগে দুইখানা প্রকাণ্ড মালবাহী মোটার লরিতে বাহির হইয়া সহরের সর্ব্বত্র শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। পার্শীদিগের উপর সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার ভার প্রদান করিয়া মহাত্মাজী তাহাদিগের অন্তরে যাহা কিছু মলিনতা ও প্রতিহিংসার ভাব ছিল তাহা দূর করিতে সমর্থ হইলেন। এক দিন পূর্ব্বে যাহারা পরস্পরকে দেখিবামাত্র পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে, তাহাদিগেরই প্রতিনিধিরা আজ একযোগে শান্তির নিশান হস্তে সহর পরিভ্রমণে নিযুক্ত— এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া সহরবাসীর হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইল এবং মহাত্মাজীর জয়-জয়কারের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। বাস্তবিক, এইরূপ যাদুবিদ্যা আর কে দেখাইতে পারিত? নিজের স্কন্ধে দাঙ্গার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া, এবং সেই রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মদেহ বলিদানের সঙ্কল্প করিয়া মহাত্মাজী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সমষ্টীভূত বিষের জ্বালা একেবারে নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন।

সহরের সর্ব্বত্র সাধারণ্যে শান্তির বার্ত্তা আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছে, এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে নেতৃবর্গ তাঁহাদের সেই মোটার লরিতেই মহাত্মাজীর বাসভবনের নিকট সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের হর্ষধ্বনি এবং লরির গুম্ গুম্ শব্দ রাজপথে বিষম কোলাহলের সৃষ্টি করিল। মহাত্মাজী মনে করিলেন, বোধ হয় পার্শী যুবকগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। ইহাতে তিনি আনন্দে শরীর দোলাইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সেই স্বর্গীয় হাসি হাসিয়া উৎফুল্লভাবে বলিতে লাগিলেন—"বেশ হ'য়েছে, বেশ হ'য়েছে, পার্শী যুবকেরা বলিবে, দেও, গাঁধীর মাথা দেও; আমি তখনই মাথা বাহির করিয়া দিব।" মহাত্মাজীর আত্ম-বলিদানের এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া আমরা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু মহাত্মাজীর হৃদয়ে যে বিষম জ্বালা তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে তাহা কে বুঝিবে? বিপক্ষের শত্রুভাব নষ্ট করিতে হইলে, তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইতে হইলে, তাহার হস্তে অকাতরে সকল নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে, এবং আবশ্যক হইলে তাহার নিকট আত্মবলি দিতে হইবে, এই মহান্ সত্যের প্রেরণায় মহাত্মাজী জগজ্জয়ী। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি এই বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। পার্শী যুবকেরা আসিয়া তাঁহার মাথা ফাটাইয়া তাহাদের শত্রুতার নিবৃত্তি করিবে, ইহাতেই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে ইহাই মহাত্মাজীর পরম আনন্দের কারণ। আমি দৌড়াইয়া সম্মুখের বারান্দায় যাইয়া দেখি বিপদের পরিবর্ত্তে

শ্রীভগবান্ তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন এবং তাহাই সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সোৎসাহে বহন করিয়া মহাত্মাজীর নিকট আসিতেছেন।

নেতৃবর্গের এইরূপ সহর-পরিক্রমার পর যত কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা গোলাগুলি-বর্ষণ চলিতেছিল, তাহা সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল। খিলাফৎ-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছোটানী মিঞা সাহেব এই সময় বম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আজ উপবাসের চতুর্থ দিন শুনিয়া তিনি মহাত্মাজীকে বলিতে লাগিলেন,—"আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে দাঙ্গা থামাইয়া দিতেছি, সেজন্য ভাবনা কি? তুমি খাও, কাল সকালে যদি না খাও তবে আমি আসিয়া জোর করিয়া তোমার মুখে খাবার গুঁজিয়া দিব।" ছোটানী মিঞা সাহেবের ভালবাসার আবদার দেখিয়া মহাত্মাজী কেবল হাসিতে লাগিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

সন্ধ্যার পর পুনরায় দুই স্থানে দাঙ্গার উপক্রম হইয়াছিল। এক স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকারীদিগের উপর সরকারি সিপাহীরা গুলি চালাইবার জন্য বন্দুকে গুলি ভরিয়া শেষ হুকুম অপেক্ষা করিতেছিল। ঠিক্ সেই সময় শঙ্করলালজী প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইয়া সিপাহীদিগের কর্ত্তা ইংরাজ অফিসারটিকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতে সম্মত করিলেন এবং সেই সামান্য সময় মধ্যে জনতাকেও দক্ষতার সহিত ঐ স্থান হইতে বিদায় দিতে সমর্থ হইলেন। অপর স্থানে

শান্তির বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র দাঙ্গাকারীরা লাঠি-সোঁটা সমস্ত ত্যাগ করিল। শঙ্করলালজী যুদ্ধজয়ী বীরের ন্যায় মোটার বোঝাই করিয়া সেই সমস্ত লাঠি লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শান্তি-স্থাপনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ উহা মহাত্মাজীর ঘরেই স্তূপাকারে রাখিয়া দিলেন। রাত্রি ৯ ঘটিকায় একজন পার্শী ভদ্রলোক আসিয়া সংবাদ দিলেন যে তাঁহাদের মহল্লায় অনেক কলের মজুর প্রবেশ করিয়াছে, এবং শীঘ্রই অত্যাচার আরম্ভ হইবে। ইহা শ্রবণ মাত্র মৌলানা আজাদ সোবানী সাহেব, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও ওমার সোবানী সাহেব সেই স্থানে চলিয়া গেলেন, এবং উহাদিগকে শান্ত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি ১১টার সময় অপর এক জন পার্শী আসিয়া ভলাণ্টিয়ারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ১৫।২০ জন ভলাণ্টিয়ার দুই মোটার বোঝাই হইয়া তৎক্ষণাৎ সাহায্যার্থ চলিয়া গেল। সে স্থান হইতে কোনও হাঙ্গামার সংবাদ আর আসিল না। পরদিবস (২১শে নভেম্বর) প্রাতে ৬টার সময় একজন স্বেচ্ছাসেবক সহরের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া উপস্থিত হইল এবং সংবাদ দিল যে পূর্ব্বরাত্রি শান্তিতেই কাটিয়া গিয়াছে। কোথায়ও কোন গোলমাল হয় নাই এবং সকল পক্ষই সন্ধি মান্য করিয়া লইয়াছে; কেবল মারাঠাদিগের মধ্যে তখনও উত্তেজনা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই; তাহারা শান্ত হইলেই আজ আর কোন গোলযোগের আশঙ্কা নাই। পার্শীদিগের বিরুদ্ধেই এই দাঙ্গার সূত্রপাত; সেইজন্য তাহাদিগের হৃদয়ে তীব্র প্রতিহিংসা জাগ্রত হইলেও,

মহাত্মাজীর ক্ষমা, ধৈর্য্য, সহৃদয়তা ও সহানুভূতির প্রভাবে তাহাদের সেই উগ্র প্রতিহিংসার বিষ একেবারে নিস্তেজ হইয়া গেল। গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট হিসাবে এই দাঙ্গার ফলে ৫৮ জন নিহত এবং ৩৮১ জন আহত হইয়াছিল; তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ৫৩ জন হত ২৯৮ জন আহত হইয়াছিল। ঐ হিসাব অনুসারে ১৩০ স্থানে দাঙ্গা হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়; এবং মদের দোকান ৪টি অগ্নিসাৎ এবং ১৩৭ টি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, বহু ট্রাম ও মোটার গাড়ি নষ্ট হইয়াছিল।
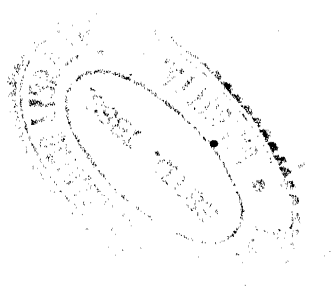
ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

উপবাস ভঙ্গ

কখন কখন দেখা যায় যে জ্বরের প্রকোপে রোগী প্রলাপের অবস্থায় অজ্ঞানতঃ নানা প্রকার অভিনয় করে। সেইরূপ সমষ্টি-ভাবে জনমণ্ডলীর আকস্মিক পীড়া জন্মিলে সমগ্র লোক যুগপৎ কি প্রকার অজ্ঞানতার অভিনয় করিতে পারে, তাহা এইবার বম্বেতে প্রত্যক্ষ করিলাম। মহাত্মাজী যেরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্য সহকারে সেই মর্ম্মান্তিক রোগের শান্তি করিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার সুচিকিৎসার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এক বৃদ্ধা পার্শী মাতা, পুত্রের দোকান ও যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে, এই কথা বলিতে আসিয়া দুই হস্তে মহাত্মাজীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপর একটি পার্শী যুবক অর্দ্ধ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দুই সঙ্গীর স্কন্ধে ভর করিয়া মহাত্মাজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া যোড়হস্ত হইয়া কম্পিত-কলেবরে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল। সেই যুবক দুই তিন দিন উপর্য্যুপরি প্রাতে ঐ প্রকার ভাবের অবস্থায় তাহার হৃদয়ের ভক্তি জ্ঞাপন করিয়া গেল। মহাত্মাজী এই যুবকের প্রতি লক্ষ্যও করিলেন না। তিনি ঐরূপ ভাবুকতার পক্ষপাতী নহেন।

২৩শে নভেম্বর সুরাতে 'ওয়ার্কিং কমিটি'র এক অধিবেশন হইবে, পূর্ব্ব হইতে এইরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু এই কয় দিবসের উপবাসে মহাত্মাজীর শরীর এরূপ ক্ষীণ হইয়াছে যে তাঁহার পক্ষে এখন বম্বে ত্যাগ অসম্ভব। তদ্ব্যতীত, বম্বের অবস্থার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য হয় কিনা, তাহাও উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পরীক্ষা করা দরকার। সেইজন্য তিনি ২০শে নভেম্বর রবিবার রাত্রিতে সুরাতের শ্রীযুক্ত দয়ালজীভাই-এর মারফতে 'ওয়ার্কিং কমিটি'র সভ্যাদিগের প্রতি এক অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তাঁহাদিগকে বম্বে আসিতে আমন্ত্রণ করা হইল। শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মতিলালজী, দেশবন্ধু দাশ প্রভৃতি নেতৃবর্গের উপযোগী বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবার ভার শ্রীযুক্ত শঙ্করলালের উপর পড়িল। তাহার পর রাত্রি ৯টার সময় তিনি আমাকে ডাকিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিতে বলিলেন। আর বলিলেন,—"কাল মৌনবার, নতুবা তোমাকে প্রবন্ধ "dictate" করিতে (মুখে বলিয়া দিতে) পারিতাম; শরীর বড় দুর্ব্বল, বসিয়া লিখিতে একটু ক্লেশ বোধ হইবে। ভোর বেলা উঠিয়া লিখিবার জিনিস-পত্র গুছাইয়া রাখিও।" এই কথাগুলি বলিয়াই মহাত্মাজী তাঁহার সাপ্তাহিক মৌনব্রত আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরীর নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া রাত্রিতে আমি তাঁহার নিকটে পড়িয়া রহিলাম এবং ৪টার সময় নিদ্রাত্যাগ করিয়া তাঁহার বসিবার স্থান ও লিখিবার সরঞ্জাম ঠিক্ করিয়া রাখিলাম। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে পাঁচটা বাজিয়া গেল;

তখন হইতে বেলা ৮টা অবধি তিনি বসিয়া বসিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন।

২১শে নভেম্বর (সোমবার) সহরের সর্ব্বত্র পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইল। কলের মজুরেরা তাহাদের নিজ নিজ কাজে চলিয়া গেল; পুনরায় নিয়মিতরূপে ট্রাম, গাড়ী, মোটর প্রভৃতির চলাচল আরম্ভ হইল। সোমবারে সমগ্র সহর স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিল দেখিয়া সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া উপবাস ভঙ্গের জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ছোটানী মিঞা সাহেবের প্রণয় ভর্ৎসনার অন্ত নাই; তিনি কয়েকবার আসিয়া মহাত্মাজীকে ভয় দেখাইয়া গেলেন; বলিলেন যে বলপ্রয়োগ করিতে তিনি আর অধিক বিলম্ব করিবেন না। সন্ধ্যার সময় কয়েকজন পার্শী ভদ্রলোক এবং সন্ধ্যার পর দুইজন সহৃদয় ইংরাজ আসিলেন। সকলেই তাঁহাকে উপবাস ভঙ্গের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এবং এই অরাজকতারূপ বিশাল দাবাগ্নি যেরূপ অল্পায়াসে কেবল স্বীয় সরলতা, সততা ও সহৃদয়তার গুণে তিনি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইলেন, তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে পর দিবস প্রাতে, অর্থাৎ, দাঙ্গা আরম্ভ হইবার ষষ্ঠ দিনে, মহাত্মাজীর সহিত একত্রিত হইয়া হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান্, সহযোগী, অসহযোগী, সকল সম্প্রদায় ও সকল মতাবলম্বী নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণ সমবেত ভাবে এক প্রীতিভোজে যোগদান

করিবেন। মহাত্মাজীর পক্ষে এই সর্ত্ত হইল যে সমবেত নেতৃবর্গ যদি সমষ্টীভূত ভাবে সহরের শান্তিরক্ষার জন্য দায়িত্ব স্বীকার করেন, তবেই তিনি উপবাস ভঙ্গ করিবেন।

আজ তাঁহার উপবাসের পঞ্চম দিন; আমি মনে করিয়াছিলাম আজ আর তিনি বিশেষ কিছু কাজ করিতে পারিবেন না। কিন্তু দেখিলাম অপরাপর দিনের ন্যায় তিনি প্রাতে ঠিক সাড়ে চারিটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া লেখার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রাতঃকালে তাঁহাকে আহার গ্রহণ করিতে হইবে এই ভাবনাতে তিনি মধ্যে একবার বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ ছিলাম, শান্তিতে ছিলাম, আহার গ্রহণ করিলেই চারিদিকের দুঃখ-দুর্দ্দশার দৃশ্য দেখিয়া দুঃখের ধান্দায় পড়িতে হইবে।"

মহাত্মাজীর বাসভবনের নিকট "চৌপাটীর" চৌমাথার একটী বাড়ীতে প্রাতে সাড়ে আট ঘটিকার সময় সেই প্রীতিভোজ সভা বসিল। সহযোগী, অসহযোগী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান্, পার্শী সকলেই এই সভাতে যোগদান করিলেন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে সভায় দণ্ডায়মান হইয়া, দাঙ্গার অবসানে তাঁহাদিগেরও উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার অবসান হইল, এই মর্ম্মে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী সকলের পশ্চাৎ গুজরাতিতে তাঁহার এক লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন এবং সকলের আগ্রহাতিশয়ে কয়েকটি আঙ্গুর ও একটি মাত্র কমলালেবু গ্রহণ করিয়া পারণ করিলেন। এই ব্রতভঙ্গ উপলক্ষে তিনি স্বীয় মনোভাব সমবেত নেতৃবৃন্দের

সমক্ষে অভিভাষণাকারে যেরূপ প্রকাশ করিলেন, তাহা তিনি প্রথম ইংরাজীতে রচনা করিয়াছিলেন এবং পরে নিজেই তাহার গুজরাতি অনুবাদ করিলেন। তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ ভাষণ সুপরিচিত হইলেও, যেরূপ ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেরণায় লিখিত হইয়াছিল, তাহার সাহায্যে উহা পঠিত হইলে অধিক হৃদয়গ্রাহী হইবে বিবেচনায় এই স্থলে উহা উদ্ধৃত হইল।

"Friends,

It delights my heart to see Hindus, Musalmans, Parsis and Christians met together in this little assembly. I hope that our frugal fruit-repast of this morning will be a sign of our permanent friendship. Though a born optimist, I am not in the habit of building castles in the air. This meeting, therefore, cannot deceive me. We shall be able to realise the hope of permanent friendship between all communities, only if we, who have assembled together, incessantly strive to build it up. I am breaking my fast upon the strength of your assurances. I have not been unmindful of the affection with which innumerable friends have surrounded

me during these four days. I shall ever remain grateful to them. Being drawn by them, I am plunging into this stormy ocean out of the heaven of peace in which I have been during these few days. I assure you that inspite of the tales of misery that have been poured into my ears, I have enjoyed peace because of a hungry stomach. I know that I cannot enjoy it after breaking the fast. I am too human not to be touched by the sorrows of others, and when I find no remedy for alleviating them, my human nature so agitates me that I pine to embrace death like a long-lost dear friend. Therefore, I warn all the friends here that if real peace is not established in Bombay, and if disturbances break out again, and if as a result they find me driven to a still severer ordeal, they must not be surprised or troubled. If they have any doubt about peace having been established, if each community has still bitterness of feeling and suspicion and if we are all not prepared to forget and forgive past wrongs,

I would much rather that they did not press me to break the fast. Such a restraint I would regard as a test of true friendship.

"I venture to saddle special responsibility upon Hindus and Musalmans. The majority of them are non-co-operators. Non-violence is the creed they have accepted for the time being. They have the strength of numbers. They can stand in spite of the opposition of the smaller communities, without Government aid. If, therefore, they will remain friendly and charitable towards the smaller communities, all will be well. I will beseech the Parsis, the Christians, and the Jews to bear in mind the new awakening in India. They will see many-coloured waters in the ocean of Hindu or Musalman humanity. They will see dirty waters on the shore. I would ask them to bear with their Hindu or Musalman neighbours who may misbehave with them and immediately report to the Hindu and Musalman leaders through their own leaders, with a view to getting justice. Indeed I am

hoping that as a result of the unfortunate discord a mahajan will come into being for the disposal of all inter-racial disputes.

"The value of this assembly, in my opinion, consists in the fact that worshippers of the same one God, we are enabled to partake of this harmless repast together, inspite of our differences of opinion. We have not assembled with the object today of reducing such differences. Certainly not of surrendering a single principle we may hold dear, but we have met in order to demonstrate that we can remain true to our principles and yet also remain free from ill-will towards one another."

"May God bless our effort."

অনুবাদ ঃ—বন্ধুগণ! এই ক্ষুদ্র সভাতে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান্ সকলেই সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমার হৃদয় উৎফুল্ল। আমাদিগের এই প্রাতঃকালীন সামান্য ফল-ভোজ আমাদিগের ভবিষ্যৎ স্থায়ী বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ, ইহাই আমি আশা করিতেছি। সকল ঘটনার মধ্য দিয়াই আমি শুভ ফলের আশা করিয়া থাকি, ইহাই আমার প্রকৃতি; কিন্তু ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে আকাশ-কুসুম কল্পনা করা আমার অভ্যাস।

অতএব মাত্র এই সভার উপর আমি নির্ভর করিতে পারিতেছি না। আমরা এই সভায় যাঁহারা সম্মিলিত হইয়াছি, যদি সকলে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাববৃদ্ধির জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে থাকি, তবেই বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে স্থায়ীভাবে পরস্পরের প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে। আপনাদের বাক্যে প্রত্যয় স্থাপন করিয়া আমি আজ উপবাস ভঙ্গ করিতেছি। এই চারি দিন যাবৎ যে সকল অগণিত বন্ধু আমাকে প্রীতির বেষ্টনে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সেই ভালবাসার প্রতি আমি উদাসীন নহি। চিরকাল আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। এই কয়দিন উপবাসের মধ্যে আমি যে শান্তির নিভৃত কন্দরে বাস করিতেছিলাম, তাঁহাদেরই আকর্ষণে তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমি এই বাত্যাহত সমুদ্রমধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আপনারা আমার এই কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন যে যদিচ এই কয়দিন অবিশ্রান্তভাবে আমাকে কেবলই দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করিতে হইয়াছে, তথাপি উপবাসী ছিলাম বলিয়া আমি সর্ব্বদাই শান্তি উপভোগ করিতে পারিয়াছি। ইহা সুনিশ্চিত যে এই উপবাস ভঙ্গের পর আমি সেই শান্তি ভোগ করিতে পারিব না। আমার মানব প্রকৃতি এতদূর প্রবল যে অপরের দুঃখ দেখিলে আমি আর স্থির থাকিতে পারি না; আর যখন সেই দুঃখ উপশমের জন্য কোন প্রকার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ হই, তখন আমি আমার সেই প্রকৃতির তাড়নায় এরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকি

যে তখন আমি বহুকাল নিরুদ্দেশের পর প্রাপ্ত, পুরাতন প্রিয় বন্ধুজ্ঞানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আকুল হইয়া পড়ি। সেইজন্য আমি উপস্থিত বন্ধু সকলকে পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিতেছি যে যদি প্রকৃতপক্ষে এখনও বম্বে নগরীতে শান্তি স্থাপিত না হইয়া থাকে ও পুনরায় যদি দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে যত্তপি আমাকে ইহা অপেক্ষাও কঠোর ব্রত ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যেন বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ না হ'ন। শান্তি স্থাপন বিষয়ে এখনও যদি তাঁহাদিগের কোনরূপ সংশয়বোধ থাকে, অথবা এখনও যদি কোন সম্প্রদায় অপর কাহারও প্রতি হৃদয়ে গরল বা সন্দেহ পোষণ করিতে থাকেন, এবং আমরা সকলে যদি অতীত অত্যাচারের ঘটনাসমূহ বিস্মৃত বা তাহা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত না হই, তাহা হইলে উপবাস-ভঙ্গের নিমিত্ত অনুরোধ হইতে বিরত থাকিলেই আমার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে। এইরূপ আত্মসংযম আমি প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় বলিয়া মনে করি।

হিন্দু এবং মুসলমানদিগের উপরই আমি এক বিশেষ দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিতে উৎসাহী হইয়াছি। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই অসহযোগী এবং যতদিন তাঁহারা অসহযোগী থাকিবেন ততদিন তাঁহারা অহিংসামন্ত্রের উপাসক, ইহাই তাঁহাদিগের অঙ্গীকার। সংখ্যায় তাঁহারা বলবান্। অপর ক্ষুদ্র সম্প্রদায়বর্গের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ।

অতএব তাঁহারা যদ্যপি সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়মণ্ডলীর প্রতি আত্মীয়তা ও উদারতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে কোন গোলযোগেরই সম্ভাবনা থাকে না। পার্শী, খ্রীষ্টান্ ও ইহুদী-দিগের প্রতিও আমার এই বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে ভারতে এক নবজাগরণের যুগ আসিয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগকে আরও বলি যে হিন্দু-মুসলমান জনসমুদ্রে তাঁহারা নানা বর্ণের জল দেখিতে পাইবেন; ঐ সমুদ্রের উপকূলে তাঁহারা ময়লা জল দেখিবেন। তাঁহাদের প্রতি আমার এই অনুরোধ যে যদি কোন হিন্দু বা মুসলমান প্রতিবেশী তাঁহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া তাঁহারা যেন প্রতিকারের জন্য তৎক্ষণাৎ সেই ঘটনা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জননায়কদিগের সাহায্যে প্রতিপক্ষের নেতৃবর্গকে অবগত করেন। বাস্তবিক, আমার এইরূপই ভরসা হইতেছে যে, এই শোচনীয় বিরোধের অবান্তর ফলস্বরূপ ভিন্ন জাতি ভারত-বাসীর সহিত ভিন্ন জাতি ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রকার বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি "মহাজন" বা পঞ্চায়েতি সভার সৃষ্টি হইবে।

এক পরমেশ্বরের উপাসক আমরা, বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী হইলেও যে এই নির্দ্দোষ প্রীতি-ভোজে যোগদানে কৃতকার্য্য হইয়াছি, আমার বিবেচনায় ইহাই এই সম্মেলনের সার্থকতা। এই কথা বলা একেবারেই অনাবশ্যক যে, যে সমস্ত ধর্ম্মমত আমাদিগের হৃদয়ের বস্তু, তাহার একটিও আমরা বর্জ্জন করিতে এখানে আসি নাই। এমন কি, আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে

ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সমস্ত মত-বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহার সংখ্যা ন্যূন করিবার উদ্দেশ্যেও আমরা আজ এস্থলে সমবেত হই নাই। আমরা স্বীয় স্বীয় আদর্শের প্রতি পূর্ণভাবে নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াও পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারি, এই সাক্ষ্য দিবার জন্য আমরা সকলে এই প্রীতিভোজে যোগদান করিতে আসিয়াছি।

'আমাদের এই প্রযত্ন শ্রীভগবান্ জয়যুক্ত করুন।'

এ স্থলে বিশেষ ভাবে একটি কথা উল্লেখ করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রীতিভোজের সভাতে সহযোগী, অসহযোগী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান্, পার্শী সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ যোগদান ও মহাত্মাজীর প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতঃ সভার মহিমা ও শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ই উদ্যোগী হইয়া শান্তিস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং সকলেরই সাহায্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহাই সত্য কথা। কেবল অসহযোগীদিগের চেষ্টাতে এ শান্তিস্থাপন সংঘটিত হয় নাই। এ বিষয়ে মহাত্মাজীর সাক্ষ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"The credit for restoration of peace is not claimed for non-co-operators alone. I claim it for both non-co-operators and co-operators, for Hindus, Musalmans, Parsis, and Christians, including Englishmen. If all the peaceful citizens had

not joined, order could not have been restored. I claim the credit in Mian Chhotani. On the 20th instant, but for Sir Pheroze Sethna who induced the military to stay their hand, a crowd would have been fired upon, whereas it was dispersed within five minutes by the efforts of Dr. Pavri and Mr. Shankerlal Banker. I can multiply instances of such dispersal on behalf of the citizens, irrespective of creed or party. Mrs. Sarojini Naidu was often asked by the military to help disperse the crowds. Indeed if co-operating and non-co-operating Parsis had not helped, it would have been impossible to restore peace. At the peace breakfast it was Mr. H. P. Modi who claimed the credit on behalf of the citizens. Mr. Natarajan gave unstinted praise to those who had brought about the much-desired peace. Mr. K. T. Paul and Mr. Douglas did no less."

[Vide "Young India", December 1, 1921]

অনুবাদ—এই যে শান্তি-স্থাপন হইয়া গেল, ইহার জন্য কেবল অসহযোগী কর্ম্মীরাই সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র ও

সম্মানার্হ,—অপর কেহ নহে ; একথা বলিলে অসত্য বলা হয়। সহযোগী ও অসহযোগী, হিন্দু ও মুসলমান, পার্শী ও খ্রীষ্টান্ (ব্যক্তিগতভাবে ইংরাজও তদন্তর্গত), সকলেই এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, এইরূপ দাবি সকল পক্ষের তরফেই আমি করিতেছি। যদ্যপি শান্তিপ্রিয় নাগরিক মাত্রেই এই শান্তিস্থাপন ব্যাপারে যোগদান না করিতেন, তাহা হইলে শান্তিময় উপায়ে সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তন কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। বম্বে নগরীর মুসলমান নেতা মিয়ান্ ছোটানী সাহেবের চেষ্টা বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল, ইহা আমি জানি। আবার ২০শে তারিখের এক ঘটনা স্মরণ করিয়া দেখি যে পার্শীপ্রধান সহযোগী স্যার ফেরোজ সেথ্না মহাশয় এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনিই এক গোরা সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে যাইয়া তাহাকে প্রবর্ত্তনা দিয়া কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজিত জনতার প্রতি গুলিবর্ষণ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। সেই সুযোগে ডাক্তার পাভ্‌রী ও শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল বেঙ্কারের চেষ্টার ফলে পাঁচ মিনিট মধ্যে সেই জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া অন্যত্র চলিয়া যায় এবং তাহাতেই বৃথা জনক্ষয় নিবারিত হইয়াছিল। নগরবাসী নেতৃবর্গের চেষ্টাতে অপর অনেক জনতাই যে দলভঙ্গ হইয়া শান্তভাবে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা বিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে উহা যে কোন সম্প্রদায় বা কোন রাজনৈতিক দলবিশেষের চেষ্টাতেই হইয়াছিল, তাহা নহে,—এ কথা বলা আবশ্যক। অনেক স্থলে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সাহায্যে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষগণ উত্তে-

মহাত্মা গান্ধীজীর সঙ্গে সাত মাস

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগ

—